শিক্ষার চারদিক

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

জন্মের প্রথম শুভক্ষণ থেকে শিশুর প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে ভাস্বর হয়ে ওঠে, কিভাবে তার মনের ক্রম-উন্মোচন হয় তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। শিক্ষাদ্বারা শিশুর জীবন ক্রমশ রূপে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হয়।

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি, কিভাবে শিক্ষার ধারা জীবনকে রসসিক্ত ক'রে তোলে, এ নিয়ে যুগে যুগে মনীষীদের শিক্ষা-বিচিন্তা সংস্কৃতি-লোকে নব নব সত্যের সন্ধান দিয়েছে। এ গ্রন্থে তাঁদের শিক্ষাদর্শনকে প্রথমেই স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থী শিক্ষা-জগতের কেন্দ্রবিন্দু ঃ শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের হোতা। শিক্ষার পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু কিভাবে তিনি শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন? এ গ্রন্থে তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর দেহ ও মন, বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশ, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সমস্যা—সমস্ত দিকেই গ্রন্থকার তাঁর বীক্ষণ-বর্তিকা তুলে ধরেছেন। ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যে এই নূতন যোজনা অনেক মৌলিক চিন্তার সন্ধান দেবে।

মূল্য সাত টাকা

শিক্ষার চারদিক



শিক্ষার চারদিক

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

এম. এ. (লণ্ডন), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)

Guidance in Education, Our Society and Education, আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী, শিক্ষা-প্রসঙ্গ, শিক্ষা ও শিক্ষানীতি, শিক্ষা-সমীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা

ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড

২৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৯৬৫

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED
LONDON BOMBAY CALCUTTA MADRAS MELBOURNE

THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED
TORONTO

ST MARTIN'S PRESS INC
NEW YORK

First Edition 1965

MADE IN INDIA
PRINTED BY B. MUKHERJI AT KALIKA PRESS PRIVATE LTD.
25, D. L. ROY STREET, CALCUTTA-6

শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিয় শিক্ষক বন্ধু, দেশের শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের হাতে এই শিক্ষা-নিবন্ধ তুলে দিলাম।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
"প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"
"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে"

ভূমিকা

শিক্ষার আঙ্গিনা আজ বিস্তীর্ণ। তাকে পরিক্রমা করা সহজ নয়। ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট পট-পরিবর্তনের পালা শুরু হ'য়েছে। তাই এই যুগ-সন্ধিক্ষণে শিক্ষার চারদিকে নতুন ক'রে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে।

বিচিত্র এই জীবন; সেই বৈচিত্র্যকে পরিপুষ্ট করে শিক্ষা। তাই জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি এবং কতখানি তা নির্ণয় করা দরকার। কিভাবে শিক্ষার ধারা জীবনকে রসসিক্ত ক'রে তুলেছে তাও লক্ষ্য করবার মতো। ভারতের মাটিতে বহু মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছে; তাঁদের শিক্ষা-বিচিন্তা সংস্কৃতি-লোকে নব নব সত্যের সন্ধান দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে তাই তাঁদের শিক্ষাদর্শনকে প্রথমেই স্থান দিয়েছি।

জন্মের প্রথম শুভক্ষণ থেকে শিশুর প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে, কিভাবে তার মনের ক্রম-উন্মোচন হয়, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে! শিশুর জীবনের খণ্ড-ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে একটি সুষ্ঠু সমগ্র রূপ দিতে গেলে চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নৈপুণ্য। শিক্ষার্থীকে জেনে, কিভাবে তাকে শেখালে তার জীবন ক্রমশ রূপে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তা বলা সহজ নয়। গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী শিক্ষা-জগতের কেন্দ্রবিন্দু; শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের হোতা। শিক্ষার পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। শিক্ষাতরণীর কর্ণধার প্রধান শিক্ষক; তাঁর কাজ হ'ল বন্ধু ও নির্দেশকের কাজ। শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে পারেন, কিভাবে তাঁর সুষ্ঠু নির্দেশ ও পরিচালনা শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে তার দেহ ও মন দুদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। তার স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে না পারলে শিক্ষার সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষাকে সার্থক ক'রে

তুলতে হ'লে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে পরিচিতির বিশেষ মূল্য আছে। তাই গ্রন্থখানিতে এদিকেও আলোচনা বিস্তৃত হয়েছে।

শিক্ষার চারদিকেই সমস্যার প্লাবন। আর সেই সমস্যার দিক নির্ণয় না ক'রলে তার সমাধানও সম্ভবপর নয়। তাই পরিশেষে শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

'শিক্ষার চারদিক' গ্রন্থখানিতে ভারতীয় শিক্ষার নানাদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-সংস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রেছি তার কিছুটা এই গ্রন্থে তুলে ধরবার চেষ্টা ক'রেছি মাত্র। কেবল শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র ক'রেই যে এ গ্রন্থের পরিকল্পনা তা নয়, দেশের শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের মনে শিক্ষা-চিন্তার সন্ধান দেওয়াও এর ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে সার্থক হ'য়েছি—একথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। তবে ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যে এই নূতন যোজনা যদি কিছু মৌলিক চিন্তার সন্ধান দেয়, তাহলে আমার এই প্রয়াসকে সার্থক ব'লে মনে করব।

ম্যাঞ্চেষ্টার শিক্ষা-সংস্থা
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
২৫।৩।৬৫

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

শিক্ষা-বিচিন্তা

পর্যায় ১—শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা

এক : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

দুই : বিদ্যালয় ও শিক্ষা-পরিবেশ

পর্যায় ৪—সমস্যা

শিক্ষা-বিচিন্তা

শিক্ষা-বিচিন্তা

জীবন ও শিক্ষা

আপন সত্তার অনুভূতি হ'ল জীবন। যে সৃষ্টির ধারা অনন্তকাল ধ'রে বয়ে আসছে তাকে সীমায়িত করে জীবনের গণ্ডী। সত্যই বিচিত্র এই জীবন, আরও বিচিত্র তার প্রকাশ। এই ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিধারার এক অখণ্ড সম্পর্ক আছে। মরণ এই জীবনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। জীবন-মরণের এই লীলা আজও রহস্যময় হয়ে আছে ; কিন্তু তারি মাঝখানে দুদিনের এই যে প্রকাশ, মাটির পৃথিবীতে এই যে ক্ষণিকের পদসঞ্চার, তার মূল্যও কম নয়।

মানুষ পৃথিবীতে আসে,—প্রতি মুহূর্তে তার মন-প্রাণ-দেহ ভ'রে ওঠে; নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা যোগায় চারদিকের পরিবেশ, আর তাকে ঘিরেই শুরু হয় জীবনের পথ-পরিক্রমা। চলার পথে যে পাথেয় সে আহরণ করে তা শিক্ষারই উপাদান—কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও আশার আলো, কখনও বা নৈরাশ্যের আঁধার। ধরণীর আঙ্গিনায় নিত্য নতুন তার আনাগোনা আমাদের হৃদয়-বীণায় কত মূর্ছনাই না তুলে যায়! কিন্তু সবই যে একটি লীলা ; আমাদের জীবনের মাঝে সেই লীলারই অনন্ত প্রকাশ। যখন দুঃখসুখের দোলায় দুলতে দুলতে নিজেকে ভুলে যাই তখন জীবনের সার্থকতা যায় হারিয়ে।

প্রতিটি জীবনে অনুভূতির যে ফল্গুধারা বইতে থাকে তা মানুষকে আত্মপরিচয়ে সহায়তা করে। এই অনুভূতি আসে অন্তর থেকে, অন্তরের উপলব্ধি থেকে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রথমে যাত্রাপথের সঞ্চয় হয়, তারপর ক্রমে ক্রমে তার বিবর্তন ঘটে। জন্মমুহূর্তে আমরা যে সংস্কার নিয়ে জন্মাই, যে চিত্তবৃত্তি আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে, একে একে তার উন্মেষ হয়।

এই আত্ম-উন্মোচন জীবনের ধর্ম। ফুলের ধর্ম তার প্রকাশে। একে একে পাপড়ি-পাতার বন্ধন টুটে যায়, ফুটে ওঠে সে তার রূপের নৈবেদ্য নিয়ে, তার সৌরভ নিয়ে। তেমনি মানুষ আজীবন এই প্রকাশের সাধনা ক'রে

যায়। যতই সে বিরহ-বিচ্ছেদে দুঃখ-সংঘাতে পিষ্ট হতে থাকে, ততই তার ব্যক্তিত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বস্রষ্টার আয়োজনে সে যেন একখণ্ড চন্দন কাঠ। এই ব্যক্তিত্বই হ'ল মানুষের প্রকৃত পরিচয়। প্রদীপের পরিচয় তার শিখায়, মানুষের পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে। তাই তো সব কীর্তি ও কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিত্বই সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে।

যতদিন বাঁচব ততদিন আমাদের চলতে হবে। কারণ এ যে চঞ্চলের রাজ্য। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। তবে চলার একটা ছন্দ আছে, আর সেই ছন্দ এনে দেয় মানুষের শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা নিবিড় যোগ আছে। জীবন থেকেই প্রতিনিয়ত আমরা রস আহরণ করি। তাই জীবন থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। মাটি থেকে যেমন লতার জন্ম, তেমনি জীবন থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জন্ম। আজ শিক্ষা ও জীবন এই দুইএর মধ্যে ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আমাদের চেতনলোকে দুইএর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলন ঘটেছে। তাই শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যে রেখা টানা হয়েছিল তা ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ যেন দিগন্তরেখার মতো। মাটি আকাশ যেখানে মিলেছে, তা কোনোদিন বাস্তব হতে পারে না। তাই সেখানে অজানার কানাকানি থাকবেই। জীবনে এই অজানাকে জানবার যে উন্মাদনা তা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জানা থেকে অজানায় নিয়ত যে পদক্ষেপ ঘটছে তারই ফলে আমাদের অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ হচ্ছে। বিবর্তন তাই জীবনের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই যে ক্রম-পরিণতি একেই আমরা শিক্ষা বলতে পারি। জীবন জুড়ে শিক্ষার বিস্তার।

আগেই বলেছি, জীবন বলতে বোঝায় প্রাণের প্রকাশ, স্বাভাবিক প্রাণধর্মের পরিচয়।

আমাদের চাওয়া-পাওয়া ও আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে মানব জীবনের যে ক্রমপরিণতি ঘটতে থাকে, তাকে বুঝতে হলে চাই শিক্ষা। নিজেকে বুঝবার চেষ্টা, প্রকাশ করবার প্রয়াস ও বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার শক্তি যে শিক্ষারই পরিণতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্ধকার থেকে আলোকের পথে অভিযান করতে হলে চাই এমন কিছু পাথেয় যাকে নিয়ে মানুষ পাবে আত্মশক্তি ও আনন্দ। শিক্ষাই তার সন্ধান

দেয়। আমাদের অন্তরে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, শিক্ষাই তার অবগুণ্ঠন খুলে দেয়।

শিক্ষা জীবনের ধ্রুবতারার মতো। আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে কোনো ভুলত্রুটি ঘটলে শিক্ষা পথের নির্দেশ দেয়, দেয় সত্যের নিশানা।

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার বন্ধন যেমন অচ্ছেদ্য, সাহিত্যেরও তাই। প্রতি-দিনের আনন্দ-বেদনা, জানাশোনার রাজ্য থেকে যে বিচিত্র অনুভূতি আমরা আহরণ করি তা হ'ল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। তবে সাহিত্য সেই অনুভূতি-সম্পদকে নিয়ে তাকে সকলের ক'রে তোলে। সেখানে স্থান, কাল ও পাত্রের গণ্ডি মুছে যায়। জীবনের যে সব ছোটখাট ঘটনা আমরা পেছনে ফেলে চলে আসি তাদের ঘিরেও স্থায়ী সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। তা নির্ভর করে রূপায়ণের ওপর। সৃষ্টি সার্থক হতে গেলে তার মধ্যে থাকা চাই অনন্তের সুর। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছেন, "প্রকৃতির মা যেমন করিয়া কাঁদে, সাহিত্যের মা তেমন করিয়া কাঁদে না।"

সত্যই, বাস্তব ছবিকে যথাযথ রূপ দিলেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না, সেখানে চাই শিল্পনৈপুণ্য। একজনের দুঃখ-সুখকে সকলের ক'রে তুলতে হলে তাকে আরও তীব্র ক'রে তুলতে হবে, তবেই সে ব্যক্তির গণ্ডীকে পেরিয়ে সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলবে। কিন্তু এ কথা বললে ভুল হবে যে, যে সাহিত্য বাস্তবধর্মী, তা সাহিত্য নয়। জীবনে যে বিচিত্র রসের ধারা বইছে তাকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করাই সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিখিল সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ বিরাজ করছে, শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও যে করুণ স্পর্শ রয়েছে, সে সব ফুটিয়ে তোলাও সাহিত্যিকের দায়িত্ব।

যা কিছু করুণ, যা কিছু বেদনাবিধুর, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে হৃদয়ের মাধুর্য। আর এই দুঃখ-বেদনার অন্তরালেই শিক্ষার উপাদান নিহিত। যা কিছু আমাদের জীবনে আসে, তাকে আমরা হাত পেতে নিতে পারি কই? কবিচিত্ত হয়তো কখনো কখনো আঘাত পাবার কামনায় বিভোর হয়ে ওঠে। জীবনে আঘাতের যে চরম মূল্য আছে, পরম সার্থকতা আছে, তা উপলব্ধি করা সহজ নয়। সেখানে চাই সাধনা। আর প্রকৃত সাহিত্য সে সাধনার প্রস্তুতি এনে দেয় ও শিক্ষার সঙ্গে অলক্ষ্যে মিলন-সেতু রচনা করে। জীবনের সব কোলাহল-কলরবের মধ্যেও একটা সুর-সঙ্গতি সৃষ্টি করে

এই সাহিত্য। তাই বিরহ-মিলনের স্তরকে অতিক্রম ক'রে এর অভিযান। কামনা-বাসনা, দুঃখ-সুখ এর উপজীব্য হলেও তা থেকে মুক্তির ইঙ্গিত বহন ক'রে নিয়ে আসাই সাহিত্যের কাজ। যতদিন শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কামনা বিলুপ্ত হয়নি, ততদিন তাদের মিলন ঘটেনি। সত্যিকারের প্রেম যেদিন দুটি হৃদয়কে ঘিরে শতদলের মতো ফুটে উঠেছিল, সেদিনই অমর কবি কালিদাস তাঁদের মিলন ঘটিয়েছেন, আর সে মিলনের উপলক্ষ্য হ'ল তাঁদেরই সন্তান। এখানেও দেখি জীবনের এক পরম সত্য উঁকি দিয়েছে। এই সত্যকে আবিষ্কার করাই আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষা ও সাহিত্য এই আবিষ্কারের প্রধান অবলম্বন।

আজ অনেকে ব'লে থাকেন যে এটা সাহিত্যের যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ। একথার মধ্যে কতটুকু যুক্তি আছে জানি না। তবে মনে হয় যে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব কিছুরই সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে। জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলবার জন্য মানুষ এমনি এক একটি পাথেয় অবলম্বন করেছে।

ধর্ম বলতে আমরা বুঝি প্রাণ-ধর্ম। মানুষকে যা ধারণ ক'রে রাখে, যা তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, তার সঙ্গে গোঁড়ামির কোনো সম্পর্ক নেই। অনুষ্ঠানের বাহুল্য সেখানে অপরিহার্য নয়। তাই সত্যিকারের যা ধর্ম তা হ'ল মানব-ধর্ম, সেখানে মানুষকে অস্বীকারের কোনো চেষ্টাই নেই। সেখানে মানুষই সকলের ওপরে স্থান পায়।

এর কতখানি মূল্য আমরা দিতে পেরেছি জানি না। তা যদি পারতাম তবে মানুষের জীবনে এতো সংঘাত কেন? এর জন্য অনেকেই বিজ্ঞানকে দায়ী করেন। বিজ্ঞানই নাকি হৃদয়ের অনুভূতির সম্পদকে তিলে তিলে হরণ ক'রে নিচ্ছে, মানুষকে যান্ত্রিক ক'রে তুলছে। কিন্তু একথা কি সত্যি? প্রকৃতির যে রহস্য আমাদের অগোচরে ছিল, বিজ্ঞান তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে; প্রকৃতির যে সম্পদ আমরা এতদিন কাজে লাগাতে পারিনি, তাকে কাজে লাগাতে সহায়তা করেছে। নতুন কিছুর সে জন্ম দেয়নি, সৃষ্টির মধ্যে যা ছিল তাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে মাত্র। বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টিকে সূক্ষ্ম করেছে, আবার ব্যাপকও করেছে। সৃষ্টির মধ্যে যে অনন্ত তথ্য লুকিয়ে আছে তা যখন আমাদের কাছাকাছি এনে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে বিজ্ঞান, তখন বলতে হবে যে সে আমাদের আত্মবিস্মৃত করেনি।

সৃষ্টি-সমুদ্র মন্থন করতে করতে সৃষ্টিকর্তার দিকেও আমাদের দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। আর ধর্মেরও লক্ষ্য তাই। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ভগবান লুকিয়ে আছেন, বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে লীলাময় বিরাজ করছেন, তাঁর সন্ধান দেওয়া দর্শনের কাজ। দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে ধর্মের বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠলেও ধর্মের সঙ্গে লৌকিকতার কিছু সম্পর্ক আছে। এক এক ধর্মে এক একটি জীবনদর্শন ও নীতি মূর্ত হয়ে ওঠে। কাজেই দেখা যায় যে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ থাকেই তবে তা আপাতদৃষ্ট। প্রত্যেকের লক্ষ্য হ'ল জীবনের গরিমা বৃদ্ধি করা। যে ধর্ম সকলেই মেনে চলছে, গ্রহতারা থেকে শুরু ক'রে তরুলতা পর্যন্ত—যে প্রাণধর্মের তাগিদ নিরন্তর বয়ে চলেছে, তাকে তো মানতেই হবে। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সৃষ্টির বিপর্যয় আসতে বাধ্য। তাই দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সাহিত্য এই প্রকৃত ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কথাটির সঙ্গে একটি বিশেষ অর্থ জড়িয়ে আছে। ইংরাজিতে এর প্রতিশব্দ হ'ল 'কালচার'।

সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের যেমন যোগ আছে তেমনি আছে শিক্ষার। বহুদিনের সাধনার ফল হ'ল সংস্কৃতি। যে কোনো প্রাচীন সমাজে এক একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠে। জীবনায়নের সামগ্রিক পরিচয়ই হ'ল তার সংস্কৃতি। একটি সমাজগোষ্ঠীর সাহিত্য, নীতি, আদর্শ, লোকাচার, শিল্প ও সাধনা সবকিছুকেই নিয়ে সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠে। তাই প্রতিটি সংস্কৃতির পেছনে একটি ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আর এই কারণে সংস্কৃতির সঙ্গে ঐতিহ্যের এক নিবিড় সম্পর্ক। উপনিষদে বলা হয়েছে—'চরৈবেতি' অর্থাৎ কেবল এগিয়ে যাও। এই এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। সেখানেই সাধনার সার্থকতা। যে কোনো কাজকে ভালবেসে মানুষ যদি তার পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে যায় তাহলে তা থেকে জন্ম নেয় একটা কালচার। তাই কালচারকে কেবল সংকীর্ণ অর্থে দেখা ভুল হবে। ইহলোক নিয়ে যে সাধনা তা হ'ল সংস্কৃতি ; অনন্তলোক নিয়ে যে সাধনা তা

হ'ল ধর্ম। সংস্কৃতির নানা দিক আছে। সমাজের ভিত্তিতে মানুষের আচার, মনন, ধ্যান-ধারণা জন্ম দেয় সংস্কৃতিকে, তার সৌরভ দেশকালের গণ্ডিকে পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তার পরিচয় মেলে সাহিত্যে, চিন্তায়, সমাজে ও শিক্ষা-ব্যবস্থায়। শিক্ষা সংস্কৃতির একটি মাধ্যম মাত্র। সেখানে মনের প্রস্তুতি আছে, বোধের তপস্যা আছে, কিন্তু চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ নেই,—যে বিকাশ মানুষকে মহীয়ান ক'রে তুলবে, অমৃতের পুত্র ক'রে তুলবে।

ভারতের মাটিতে সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কত জাতি কত দেশ থেকে নতুন নতুন চিন্তার স্রোত বহন ক'রে নিয়ে এসেছে, আর সেইসব স্রোতের সঙ্গম ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে। এর ফলে নিজস্ব একটি সংস্কৃতির ধারা গ'ড়ে উঠেছে ভারতের বুকে। তার মধ্যে সব চিন্তা, সব জীবনদর্শন একাকার হয়ে গেছে। কারও কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। বহুর মধ্যে একত্বের এই যে সাধনা, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যে সমন্বয় ঘটেছে তা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও ব্যাপক ও উদার ক'রে তুলেছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, মুসলিম ও বিদেশীয় সভ্যতার আলো এসে পড়েছে ভারতবর্ষের সাধনার বেদীতে, আর সেই আলো হীরকের দ্যুতির মতো এখনো অম্লান হয়ে আছে।

যুগে যুগে ভারতীয় সাধকের দল তাদের মৈত্রী ও সমন্বয়ের বিরাট সাধনা নিয়ে নির্ভয়ে বীরের মতো অগ্রসর হয়েছেন। বাইরের বাধা, ঘরের বিরোধ মধ্যে মধ্যে তাঁদের পথরোধ করলেও কিছুতেই তাঁদের এই সাধনার অগ্রগতিকে চিরকালের মতো রুদ্ধ করতে পারেনি।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সাধনার মূলকথা হ'ল স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। এটাই হ'ল সত্যদর্শন আর ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য। মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাকে অনেক সময় আত্মবিস্মৃত করেছে, কিন্তু আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে অন্তর্লোকে।

যারা সংসারের খরস্রোতে জীবনমৃত্যুর অন্তহীন আবর্তের মধ্যে ভেসে চলেছে, তাদের মধ্যে দু-একজন সেই পথ থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য পথের দিকে তাকান, চেষ্টা করেন অমৃতের সন্ধান পেতে। এই যে মৃত্যুর পথ থেকে অমৃতের পথে প্রত্যাবর্তন, এখানেই লুকিয়ে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। উপনিষদের মধ্যেও এই একই সুরের প্রতিধ্বনি। এরপর তান্ত্রিক

সাধনা, বেদবাহ্য আচার ও এমনি আরও কত ভাবাদর্শের আনাগোনা ঘটেছে, কত আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষায়ও তার প্রতিধ্বনি। তাই দেখা যায়, এক এক যুগে এক এক শিক্ষাদর্শন উঁকি দিয়েছে। কখনো চরিত্র-গঠন, কখনো জীবনানুশীলন, কখনো বা যান্ত্রিক শিক্ষা ও বাস্তব বিদ্যার প্রাধান্য। যুগের আদর্শ ও চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষা তার ধারা বজায় রেখে চলেছে।

অবশ্য এই সব শিক্ষাদর্শনের যাঁরা জন্ম দিয়েছেন তাঁদের প্রভাব দেশ-কালের গণ্ডিকে পেরিয়ে সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছে। সেই সব মনীষী সত্যই স্মরণীয়।

শিক্ষার প্রগতি

চলাচলের পথে স্থির থাকবার নিয়ম নেই, আর শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রুশো থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে কেন্দ্রবিন্দু ব'লে মনে করেছিলেন। এটা শিক্ষায় প্রগতির একটা লক্ষণ। তেমনি শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও একটি আধুনিক ভাবধারার সূচনা করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক প্রগতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে,—যেমন শিক্ষায় আনন্দ, স্বাধীনতা ও সুখ। চিরদিনই একথা স্বীকৃত হয়েছে যে সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ বিরাজ করছে তার সন্ধান দেওয়া শিক্ষারই কাজ। এর জন্যে চাই মনের প্রস্তুতি, চাই বন্ধনমুক্তি। সংস্কারের বাঁধনে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে, কোনোদিনই এই আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় না। নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, সবার সঙ্গে দুঃখ-সুখের অংশ নিতে হবে। এই হ'ল গণতন্ত্রের মূলনীতি। প্রগতির বীজ এই নীতির মধ্যে লুকিয়ে আছে। আজ শিক্ষাকে সমাজ-সংস্কারের অন্যতম সহায়ক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে মূর্ত ক'রে তুলতে হলে চাই বিদ্যালয়-জীবনে সমাজের প্রতিফলন। বিদ্যালয়কে আজ এগিয়ে আসতে হবে সমাজের দিকে। তেমনি সমাজের যা কিছু উপাদান তা আহরণ করতে হবে শিক্ষাকে। তবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতি আসবে।

ভারতে শিক্ষার ক্রমবিকাশ

একটা দেশের ও জাতির সংস্কৃতির ধারাকে বুঝতে হলে তার শিক্ষা-বিবর্তনকে জানা দরকার। আজকের দিনে শিক্ষার যে নবরূপায়ণ ঘটেছে, তার পেছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। যুগে যুগে দেশের রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছে, আর তার ছায়া পড়েছে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর। ভারতের ঐতিহ্য বহুদিনের, তাই যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে আজ আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোমুখী হয়েছি তাকে বুঝতে হলে চাই অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্যানুসন্ধান।

প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকে আমরা তপোবনের শিক্ষা ব'লে জানি। আধ্যাত্মিক উন্নতিই ছিল এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। জীবনে যা শাশ্বত সত্য তা আবিষ্কার করবার সংকল্প নিয়ে যে অভিযান শুরু হয়েছিল, সেদিনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। বিশেষ কোনো পাঠ্যসূচী বা সময়-তালিকা না থাকলেও গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যপালন আর আশ্রম-জীবনের অনুসরণই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আশ্রমের কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার একটি লক্ষ্য ছিল। গুরুর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই ছিল শিক্ষার্থীর পাথেয়; অধ্যয়ন ছিল তপস্যা। আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা আনবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। আচার্যের কাজই ছিল তাই। নানাভাবে শিক্ষার্থীকে জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিষ্যের জন্যে গুরু দৈনিক কার্যধারা প্রবর্তন করতেন। কখনো উদ্যান-রচনা, কখনো গো-পালন, এমনি নানাকাজের মাধ্যমে তাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আয়োজন করা হ'ত। জীবন-পরীক্ষায় প্রস্তুতি এমনিভাবে সম্ভব হয়ে উঠত। তাই ধ্যান-ধারণা, বোধ ও জ্ঞানের তপস্যা যেমন শিক্ষার অঙ্গ ছিল, তেমনি বৃত্তিশিক্ষার দিকেও সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। মোট কথা, একটা মানুষকে গ'ড়ে তুলতে হলে তার যেসব বৃত্তির উন্মেষ প্রয়োজন, তপোবনের শিক্ষা তার কোনোদিকেই উদাসীন ছিল না।

শিক্ষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হ'ল বৌদ্ধযুগে। ব্রাহ্মণ্য

শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযোগ দেখা দিল,—তা হ'ল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র ক'রে। বৌদ্ধশিক্ষার যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ। তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে বৌদ্ধশিক্ষা প্রবর্তিত হ'ল। কেবল বুদ্ধির অনুশীলন ও নীতিগত কঠোর অনুশাসন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না। তাই বৌদ্ধশিক্ষায় হৃদয়বৃত্তিকে মূল্য দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। রসবোধের এবং কমনীয় চিত্তবৃত্তির যাতে উন্মেষ ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রেখে বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছিল। তাই তার মধ্যে যে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তা ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা-ব্যবস্থায় ছিল না।

মানুষের প্রকৃত মূল্য দিতে হলে মানুষের হাতে গড়া ব্যবধান ভেঙে পড়বেই। তাই জাতিগত সংকীর্ণ ব্যবধানের প্রাচীর একে একে ধ্বসে পড়ল। এ ছিল বৌদ্ধশিক্ষার সংকল্প। এই সংকল্প নিয়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। একে একে শিক্ষার আয়োজনগুলি নির্দিষ্ট হতে থাকে। শিক্ষাপদ্ধতির কিছু কিছু প্রবর্তন বৌদ্ধশিক্ষায় দেখা যায়। যুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যা ও এমনি আরও প্রযুক্তি-বিদ্যার উদ্ভাবন বৌদ্ধশিক্ষায় লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার ব্যাপকতা ও বিস্তার আনবার জন্যে বৌদ্ধশিক্ষার বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল। তাই গতানুগতিক শিক্ষা ছাড়াও গণশিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা বৌদ্ধশিক্ষায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যশিক্ষায় নিষ্ঠা, আচার ও সংকীর্ণ জ্ঞানানুশীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই।

ভারতের বুকে সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা প্রবাহিত হয়েছে। একে একে কত ধর্মের ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে আর সেই অনুযায়ী শিক্ষারও প্রবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তনের মাঝে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের হাতে হিন্দু সংস্কৃতির চরম নিপীড়ন ঘটেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আকবর-প্রমুখ মুঘল সম্রাটদের জন্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তনও এসেছে। আকবরের মধ্যে তথাকথিত শিক্ষা না থাকলেও তিনি অনুভব করতেন যে জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজন।

তাই তিনি প্রথমেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সাহিত্যের যাতে উন্নতি হয় সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতি ও সুবিচার যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি বার বার বলেছেন। পাঠ্যসূচীর বোঝাকে তিনি শিক্ষার প্রকৃত অন্তরায় ব'লে অভিহিত করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতির দিকেও তাঁর চিন্তা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করলে তা শিক্ষার্থীদের শেখার সময়কে কমিয়ে আনতে পারে অর্থাৎ অল্প সময়ে তারা আরও বেশি কিছু শিখতে পারে। কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয় যাতে অবশ্যপাঠ্য হয় তিনি সে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আকবর ছিলেন সারা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যমণি এবং মুঘল সাম্রাজ্যে একমাত্র তাঁরই উদার দৃষ্টির ফলে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নতি ঘটেছিল।

শিক্ষার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ

এর পরেই ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। প্রথমে ক্রীশ্চান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রাথমিক আয়োজন শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম কেরি, জন মার্শম্যান প্রমুখ বহু শিক্ষানুরাগী মিশনারী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এসেছিলেন। পরে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার ও আরও অনেকে এই শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮২০ সালের প্রথমেই একটি অনুসন্ধানী কমিশন বসে।

ভারতীয় শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করবার জন্যে এই কমিশন স্থানীয় প্রয়োজনের কথা বিশেষ ক'রে বিবেচনা করেন। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীই নাকি উপযোগী ছিল এবং যাতে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে সেদিকে ক্রমশ বেশি উৎসাহ দেখানো হ'ত। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে সরকারী চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ইংরাজী-জানা প্রার্থীদের দাবী অগ্রগণ্য হবে। এই ঘোষণা ইংরাজী শিক্ষার গতিকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। এ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব আলোচনা হয়েছিল তার

প্রত্যেকটিই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষার প্রসারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ নামে একটি নির্দেশনামা বার হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ীই শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হ'ল এবং পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ল।

শিক্ষাক্ষেত্রে উডের ডেসপ্যাচ একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে, কারণ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনার কাজে এই ডেসপ্যাচ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, দেশের অধিবাসীদের বড় একটা অংশ সত্যিকারের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত আছে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে এমন বাস্তব শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন, এবং তার জন্য সরকার অধিকতর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত আছেন।

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন-যাত্রার উপযোগী না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। ফলে ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ কয়েকটি ত্রুটি দেখা গেল। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার একরকম উঠে গেল, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্যে কোনো ব্যবস্থাই রইল না। কেবল পরীক্ষায় সাফল্য নিয়ে আসাই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হ'ল।

১৮৮২ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করবার জন্যে সরকার "হাণ্টার কমিশন" নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের মতে সরকারকে বিদ্যালয়ের পরিচালনার সমগ্র ভার গ্রহণ করতে হ'লে বহু অর্থের দরকার, সেজন্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; তবে স্থির হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। হাণ্টার কমিশন যে বিবরণী পেশ করেন আধুনিক শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তার

যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ কোনো শ্রেণী থেকে ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ কোনো প্রসার হয় নি। জনসাধারণের চেষ্টায় ও সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেল বটে, কিন্তু তাদের উৎকর্ষ-সাধনের দিকে উপেক্ষাই রয়ে গেল।

১৯০২ সালে উচ্চস্তরের পরীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেষে, ১৯০৪ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে স্থির হ'ল যে, বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন করবে এবং তার জন্যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হ'ল।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্

একদল লোক মনে করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রেখে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্ গঠনের সিদ্ধান্ত করা হ'ল।

মাধ্যমিক পর্ষদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল অনেকখানি। যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয় ও বিদ্যালয়ের পাঠের শেষে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া এই পর্ষদের একান্ত কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হ'ল। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উন্নতি, ব্যক্তিত্ব ও সামগ্রিক তথ্য যাতে লিপিবদ্ধ থাকে, সেদিকেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

স্যাড্‌লার কমিশন। ১৯১৭ সালে মাইকেল স্যাড্‌লারের অধিনায়কত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষাই শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্তর, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান করা একান্ত কর্তব্য।

এই কমিশন অনেকগুলি বিষয়ে সুপারিশ করেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রেখা টানতে হলে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর না টেনে মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই টানা উচিত।

(২) সরকারের মাধ্যমিক কলেজ নামে নতুন শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত। এই শিক্ষালয়গুলি পৃথকভাবে বিশেষ বিশেষ উচ্চবিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে পরিচালিত করা যেতে পারে।

(৩) মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র হবে।

(৪) উচ্চ এবং মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষার জন্যে একটি বোর্ড স্থাপন করতে হবে এবং এই বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ভার থাকবে।

স্যাড্‌লার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে যে সুপারিশ করেছিলেন তা খুবই ব্যাপক। সর্বপ্রথম এই কমিশনই মাধ্যমিক কলেজের শ্রেণীগুলির সঙ্গে উচ্চবিদ্যালয়ের একটি যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে বিশেষ তৎপর হন।

এর পরে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। জনসাধারণের উৎসাহে এবং ব্যক্তি ও সংস্থার অর্থসাহায্যে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার আরও কতকগুলি দিক আজও পর্যন্ত উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

হার্টগ্‌ কমিটি। ১৯১৯ সালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে হার্টগ কমিটি নিযুক্ত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এই কমিটি অনুসন্ধান ক'রে দেখেন যে আমাদের দেশে এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা অল্প বয়সেই কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এদের জন্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে এই কমিটি বিশেষ চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের সুপারিশ হ'ল—যে সব ছাত্র বৃত্তি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়েই পড়াশুনা শেষ করবে। পাঠ শেষ হবার পরেই তাদের জন্যে

শিল্প ও বাণিজ্য শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে কারিগরী ও শিল্পবিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে পারে। কমিটি আরও একটি বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি দেন, সেটি হ'ল শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে।

সাপ্রু কমিটি। ১৯৩৪ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার বেকার সমস্যার কারণ নির্ধারণ করবার জন্যে সাপ্রু কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির মতে সবকিছু অশান্তির মূলে আছে বেকার সমস্যা। তাই দেশে এমন শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া চাই যা ছাত্রদের একটি জীবিকা বা বৃত্তি অবলম্বনের পথে সহায়তা করবে। এটি ছিল সাপ্রু কমিটির মূল লক্ষ্য। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। ভাবী জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তাই কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করেন :—

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে; তার মধ্যে একটি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করবে।

(২) মাধ্যমিক কলেজ উঠিয়ে দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সময় এক বছর বাড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু হবে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করা যাবে।

এইভাবে সাধারণ-শিক্ষার উন্নয়নের দিকে যেমন দৃষ্টি পড়ল তেমনি বৃত্তিশিক্ষার দিকেও একটা চেতনার উন্মেষ হ'ল।

১৯৩৬-৩৭ সালে Abbot ও Wood নামে দুইজন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সংস্কার ও বিশেষ ক'রে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্যে সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র তাদের গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তি না পাওয়ায় এই বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বিশেষ ক'রে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে অনুরোধ করা হ'ল :—

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনো বৃত্তিমূলক শিক্ষা

দেওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তা হ'লে কি পরিমাণ ও কতটুকু শিক্ষা দেওয়া উচিত?

(২) বর্তমান কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিবিধান করা কতখানি সম্ভব? বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার জন্যে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? ইত্যাদি।

এঁদের রিপোর্টে সাধারণ বিদ্যালয়ের মতোই ভিন্ন প্রকারের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। সেই সুপারিশ অনুসারে পলিটেক্‌নিক নামে নতুন একপ্রকার কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়।

এর কিছুদিন পর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। বহুদিন শিক্ষার অগ্রগতি থম্‌কে রইল। তারপর এল ১৯৪৪ সাল, যখন যুদ্ধোত্তর কালের সমস্যা দেখা দিল। আর সেই সমস্যা মেটাবার জন্যে ভারত সরকারের নির্দেশে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক সমিতির পত্তন হ'ল।

সার্জেণ্ট কমিটি। এর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন John Sargent। এই কমিটি সমগ্র দেশের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে ক'টি সুপারিশ করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন, ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর শিক্ষার নানা পর্যায় থাকবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বেশির ভাগ শিক্ষা শেষ হবে ১৪ বছর বয়সে। অনেক সময় উত্তর-বুনিয়াদী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করার পর জীবনের প্রস্তুতি শুরু হবে। এই কমিটি আরও সুপারিশ করেছিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের ভিন্ন বিভাগের পাঠ্যসূচী প্রধানত সংস্কৃতিমূলক হলেও এর দ্বারা ছাত্রদের শিল্প, বাণিজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ১১ বছরের পর থেকে শুরু ক'রে ১৬ বছর পর্যন্ত চলবে।

মোট কথা, শিশুর জীবন ও বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এই রিপোর্টে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৮ সালে শিক্ষা সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তার ফলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে ও সকলেরি লক্ষ্য হয় একটি কমিশন গঠন করার দিকে। ১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে ; এই কমিশনের কাজ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা।

কমিশন মনে করেন যে, সরকার বা জনসাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নন। কমিশনের মতে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাই ছিল দুর্বলতম অংশ। তাই তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যে পরিকল্পনা এই কমিশনের পরবর্তী কমিশন (মুদালিয়ার কমিশন) গঠন করেছিলেন তার একটি খসড়া নীচে দেওয়া হ'ল—

শিক্ষার ধারা ও পর্যায়	শিক্ষাকাল	শিক্ষার্থীর বয়স
প্রাক্-প্রাথমিক ও নার্সারি শিক্ষা	২।৩ বছরের জন্য	৩।৪ বছর থেকে ৫।৭ বছর পর্যন্ত
প্রাথমিক শিক্ষা	৪।৫ বছর	৬।৭ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত
মাধ্যমিক শিক্ষা, সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়র মাধ্যমিক	৩ বছর	১২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা	৩।৪ বছর	১৪।১৫ থেকে ১৭।১৮ পর্যন্ত

সম্প্রতি ১২ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনে শিক্ষাকাল আরও এক বছর বাড়িয়ে দেবার কথা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের প্রগতি

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাম্প্রতিককালে যে বৈচিত্র্য আনবার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি আনবার প্রশ্ন আছে। এদিক দিয়েও আজকের শিক্ষাবিদ্‌দের অনেক কিছু ভাববার আছে।

প্রাথমিক, বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে ধারাবাহিকতা না থাকলে যে নানা সমস্যার উদ্ভব হবে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। মানব-জীবনের বিকাশ ধারাবাহিক। সেই ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগস্থাপনের প্রয়োজন। তার পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ-প্রণালী, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিশেষ বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় বর্তমানে শিক্ষার এক এক পর্যায়ে যে বিভিন্ন স্তর ও মান নির্ণীত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো সংগতি আজও আসেনি। যেমন, প্রাথমিক স্তরের আগে শিক্ষার্থীদের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট ধারা নেই। গৃহ-পরিবেশ ও শিক্ষা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম ; ফলে শিক্ষক এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হন। তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে দৈন্য ও অব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মানে পৌঁছোতে বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ ক'রে যখন শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসে, তখন এ সমস্যা আরও জটিল রূপ ধারণ করে। তার কারণও সুস্পষ্ট। মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়গুলিকে দুটি স্তরে ভাগ করা যায়, যেমন,—নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক। এ ছাড়া উন্নত মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও প্রবর্তন করা হয়েছে।

কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের এ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এক বিরাট শিক্ষাবিপর্যয় ডেকে আনছে। যতদিন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও ধারায় এই শিক্ষাব্যবস্থার সমীকরণ না হচ্ছে ততদিন এমনি সমস্যা থেকেই যাবে।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রবেশ করার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তা এখনও পূর্ণাঙ্গ নয়। তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একই স্তরে উন্নীত করতে হবে এবং যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা স্তর হিসাবে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাকে বাস্তব ক'রে তুলতে হবে। দুঃখের বিষয় এই সাময়িক ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। কারণ, যে স্বল্প সময়ে এই স্তরে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাকে অবাস্তব বলা চলে।

আজ একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম সমস্যা হ'ল শিক্ষক-সমস্যা। বিষয়-বস্তুও বিচিত্র। এগুলিকে যথাযথভাবে পড়াতে হলে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন তার একান্ত অভাব রয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এই সব সমস্যা মিটতে না মিটতেই নতুন আর এক পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। তা হ'ল সব বিদ্যালয়কে ১১ শ্রেণীর পরিবর্তে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা। কিন্তু তা করতে হলে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। তাই সরকার আভাস দিয়েছেন যে, প্রাথমিক আয়োজন হিসাবে দশমশ্রেণীর সব বিদ্যালয়গুলিকে আগে একাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। তারপর একে একে চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এই পরিকল্পনার পেছনে সদিচ্ছার অভাব নেই। কিন্তু মনে হয় বাস্তব দৃষ্টির এখানে অভাব ঘটেছে, তাই সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌দের এত ঔদাসীন্য। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সময়ে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যার পূর্ণ সমাধান আজও হয়নি। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের মানকে আরও উন্নীত করতে চাওয়া কতখানি সমীচীন তা বলা মুশকিল, আর যদি একান্তই তা করতে হয় তবে আগে একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করাই বোধহয় সহজ হবে। কারণ একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে কিছু কিছু আয়োজন, শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিবেশ এসে গেছে। তাদের উন্নীত করতে হলে নতুন ক'রে কিছু করতে হবে না, কেবল অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হলে সবকিছু নতুন ক'রে করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আজ দশম ও একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতির ব্যাপারে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এই নতুন পরিকল্পনাকে চালু করবার সময় এই অসন্তোষের কারণগুলি অনেকখানি দূর করা যায়। যেমন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ধারাকে সাময়িকভাবে মূল দুটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে ফেলা চলে ঃ—

(ক) দশম শ্রেণী পর্যন্ত, ও

(খ) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী।

পাঠ্যসূচীর দিক থেকে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা দূর করতে হলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক রকম বিদ্যালয়েই কেবল Core Subjects পড়ানো যেতে পারে। তারপর যারা দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়বে তাদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে Elective Subjects পড়ানো হবে, আর যারা দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের জন্যে দুবছরের প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের সাময়িক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপারেও এমনিভাবে একটা সামঞ্জস্য আনা যায়। আজ অনেকেরই ক্ষোভ যে দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে দুবার পাবলিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে মাত্র একবার পরীক্ষা দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার মিলতে পারে। এই বৈষম্য দূর করতে হলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে দুটি পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়,—একটি দশম শ্রেণীর শেষে আর একটি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। যারা দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়বে তাদেরও যেমন দুবার পরীক্ষা দিতে হবে, তেমনি যারা দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়বে তাদেরও দুবার পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যিক করলে এই সমস্যার সমাধান হয়। কেবল তাই নয়, দুটি অংশে পরীক্ষাটিকে নেবার ব্যবস্থা হলে পাঠন-ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা বোধ হয় অনুকূল।

আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিত্যনূতন পরিবর্তনের একটা রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। কারণ আজ আমরা এত দ্রুতগতিতে চলেছি যে তার সঙ্গে তাল ফেলে চলা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যে একটা যোগাযোগ আছে তা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু জীবনকে বুঝতে হলে চাই অন্তর্দৃষ্টি, তার অভাবে জীবন শুকিয়ে যায়। আজ যান্ত্রিকতার চাপে রসের কার্পণ্য ঘটেছে, চারদিকে গতানুগতিক জীবনধারা—আর তা থেকে বর্তমান শিক্ষা যে রসদ সংগ্রহ করছে, তা যথেষ্ট নয়। ফলে মানুষ গড়ে উঠছে না। যারা শিক্ষার আলোকে ধন্য হতে পারছে তাদের মধ্যেও মানবিক

দৃষ্টির অভাব ঘটছে। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে স্বার্থপরতা ও নীচবৃত্তি মানুষের শিক্ষাকে সার্থক হতে দিচ্ছে না। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র ক্রমশ যেন ছিন্ন হয়ে আসছে; অথচ আজ কথায় কথায় সংস্কৃতির প্রসঙ্গ নানাভাবে এসে পড়ে। জাতির জীবনে এ একটা বিপর্যয় বলতেই হবে। যেখানে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ব্যাহত হয়, যেখানে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশের বদলে অপ্রয়োজনীয় তথ্যের জঞ্জালে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হয়, সেই শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। শিক্ষার প্রগতির কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু এই প্রগতি বলতে আমরা কি বুঝি? প্রগতি মানে পরিবর্তন নয়। একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে যখন পরিবর্তন সাধিত হয়, তখনি প্রগতিকে আশা করা যেতে পারে। তা না হলে, কেবল নতুন কিছু করার জন্যই যদি পুরনোকে ভেঙ্গে চুরমার করতে হয়, তবে সেখানে ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে।

পর পর দুটি মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী একটা নৈতিক ও সামাজিক অবনতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুকেন্দ্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে সমাজের নৈতিক আদর্শের হানি হয়েছে। সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের মুখোমুখি হয়ে বর্তমান যুবসম্প্রদায় কতখানি আত্মোন্নতি করতে পারবে কে জানে! শিক্ষার উপকরণ ও আয়োজনের দিকে যে দৃষ্টি আজ পড়েছে তার সার্থকতা কতখানি তা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে অন্তর থেকে বাইরে আজ আমরা বেশি দৃষ্টি দিতে চেয়েছি। একে আর যাই হ'ক শিক্ষার প্রগতি বলা যায় না।

ভারতের শিক্ষাদর্শন

মানুষের সভ্যতার ধারা স্মরণাতীত যুগ থেকে বয়ে আসছে। ফেলে-আসা দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত বিচিত্র কাহিনী! মানুষ যখন নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করল, তখন সে বুঝল যে অন্যান্য স্বষ্টি থেকে সে পৃথক্‌, তার মধ্যে আছে অনন্ত সম্ভাবনা। শুরু হ'ল তার পদক্ষেপ, জয়ী হল সে জীবনযুদ্ধে, স্বষ্টির রাজ্যে মুকুটমণি ব'লে তার পরিচয় মিলল। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, দুরন্ত অভিযানের পথে কি তার পাথেয় ছিল? পাথেয় ছিল শিক্ষা। এই শিক্ষার শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে

যেদিন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অসহায় মানুষের বুক কেঁপে উঠেছিল, অন্তরে আগুন জ্বলে উঠেছিল। জ্ঞানযজ্ঞের সে হুতাশন আজও অনির্বাণ।

একে একে কত শত মনীষীর অভ্যুদয় হ'ল, সভ্যতার কত বিবর্তন ঘটল, আর শিক্ষা-জগতেও তার আলোছায়া পড়তে লাগল। এই যে শিক্ষা, এ শুধু ভারতের নিজস্ব নয়, বিশ্ব-সভ্যতার অন্তরালেও একই প্রেরণা কাজ ক'রে চলেছে। তবে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, আর তার ছাপ শিক্ষার উপরেও সুস্পষ্ট। ভারতের শিক্ষার যে কয়টি বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আত্মোপলব্ধির প্রতি একটি বিশেষ নির্দেশ। সৃষ্টি-রহস্যের মাঝখানে আমি কে, আমার স্থান কোথায়?—এই জিজ্ঞাসা অন্য কোনো শিক্ষা এমনি ক'রে করেনি, এত গভীরে কেউ দৃষ্টি দেয়নি। অবশ্য গ্রীক সভ্যতায় আত্মা নিয়ে আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমাদের ভারতবর্ষে আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে বহুদিন থেকে। শঙ্করের বেদান্তবাদ আবিষ্কার করেছে নিজেকে। উপনিষদ্ বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে আত্মজ্ঞানই হ'ল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আত্মানং বিদ্ধি—এই হ'ল উপনিষদের অমর বাণী। তারপর তপোবনের শিক্ষায় সেই আত্ম-জ্ঞানের অনুশীলন চলেছে। বহুদিন পেরিয়ে ইতিহাসের কুহেলিকাময় যুগ উত্তীর্ণ হয়ে আমরা এসে পড়েছি মধ্যযুগের ভারতে। সেখানে দেখেছি প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, রাজশক্তির দম্ভ, উত্থান-পতন। এই রাজনৈতিক বিপর্যয় হয়তো ভারতের ঐশ্বর্যকে অনেকটা হরণ করেছে, কিন্তু তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে নষ্ট ক'রে দিতে পারেনি। দেশ-বিদেশ থেকে বহু শক্তির উপদ্রব ঘটেছে এই ভারতের কোমল মাটিতে, কিন্তু কারও পায়ের চিহ্ন আজ আর আঁকা নেই। তারপর পশ্চিমের জানলা দিয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলো বিকীরিত হতে লাগল, আর সেই জ্ঞানের বাতি হাতে নিয়ে অনেকেই শিক্ষাবিস্তারের নামে প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এ ছিল এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢেউ ভারতের উদার সংস্কৃতির বুকে আছড়ে পড়তে লাগল। রামমোহন, কেশব সেন প্রমুখ বহু পাশ্চাত্য ভাবের পূজারী ভারতের নিজস্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে আলোড়ন জাগালেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাহারা হয়ে পড়ল।

এমন এক সঙ্কট-মুহূর্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হ'ল। তাঁর মধ্যে

দেখি সব ধর্মের মৌলিক সূত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, অথচ ঐতিহ্যের মূল সূত্রটি তিনি হারাননি। পুঁথির জীর্ণ পাতার অন্তরাল থেকে তাঁকে শিক্ষা আহরণ করতে হয়নি, হৃদয়সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি যে অমৃতের অধিকারী হয়েছিলেন তাই তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ ক'রে গেছেন। যাবার সময় তা বণ্টনের ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজিকে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন। স্বামীজি সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য ধারক ও বাহক। সারাজীবন ধ'রে তিনি ভারতের অন্তরাত্মার সাধনা ক'রে গেছেন, তার মৃন্ময় রূপের পেছনে যে চিন্ময় সত্তা রয়েছে তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। ভারতের পথে ও প্রান্তরে বহুদিন তাঁর কেটে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতকে নিবিড় ক'রে জানতে, ভারতের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করতে। এ ছিল তাঁর প্রস্তুতি-পর্ব। কিছুদিন পরে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মূলমন্ত্রকে। ভারতের চরম দুরবস্থা, জনসাধারণের দুর্দশা তাঁকে ব্যথিত করেছে। আর সেই দুর্দশাকে দূর করবার জন্য নিজেকে আহুতি দিয়েছেন তিনি। নশ্বর পৃথিবীতে যে ক'দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর দেহমনকে তিনি সেই মহান ব্রতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সারা দেশের শরীরে যে ব্যাধি তা নিরসন করতে হলে চাই শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষাই সব ব্যাধির আরোগ্য আনবে। তবে যে শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন তাকে সংকীর্ণ অর্থে তিনি ব্যবহার করেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, জীবন জুড়েই শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বলেছিলেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। এই শিক্ষাকে কল্যাণের অমোঘ মন্ত্র হিসেবে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞা হ'ল, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা নিহিত রয়েছে, যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তার প্রকাশই হ'ল শিক্ষা। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, এ জগৎ ব্রহ্মময়; প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণী তাঁরই সৃষ্টি, তাই তারা সেই অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। তারা অমৃতের সন্তান, তবে কেন ভারতের জনসাধারণের এই চরম নিগ্রহ! তাই তিনি বজ্রকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছেন উপনিষদের সেই বাণী: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—ওঠ, জাগো। হীনতাবোধ ও যে কোনো দুর্বলতাকে তিনি বরাবর ঘৃণা করেছেন। বলেছেন, দুর্বলতাই পাপ,

দুর্বলতাই মৃত্যু। তাঁর এই উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গীতার কর্মযোগকে কেন্দ্র ক'রে তিনি ভারতীয় শিক্ষার নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিকে তিনি জ্ঞান-তপস্যার পরম পাথেয় ব'লে মনে করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল Life-building Education। একটা জীবনকে কিভাবে গড়া যায়, একটা মানুষকে কিভাবে পূর্ণ মানুষ করা যায়, এই ছিল তাঁর চিন্তা। তাই কেবল জ্ঞানের অনুশীলন ও বুদ্ধির বিকাশকে তিনি প্রাধান্য দেননি; দেহচর্চা, সৎচিন্তা ও চরিত্রগঠন তাঁর শিক্ষার মূলকথা ছিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ করতে হলে আগে তাকে শক্তিমান হতে হবে, বলিষ্ঠ হতে হবে, তার স্নায়বিক দৌর্বল্য দূর করতে হবে, জাগাতে হবে সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি—the will power, আর তার জন্যে চাই উপযুক্ত আধার। দেহ দুর্বল হলে সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির ধারক হওয়া যায় না। তাই তিনি বলেছেন যে, গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলে সেই শক্তির বেশি অধিকারী হওয়া যায়। তার মানে এ নয় যে মননশক্তির কোনো মূল্যই নেই। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার মূলকথা হ'ল এই যে, চিৎশক্তিকে জাগ্রত করতে হলে আমাদের বলিষ্ঠ হতে হবে। এখানেও দেখি উপনিষদের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি হয়েছে তাঁর কথায়—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজি নিজে কোনো বিধান দেননি। শুধু বলেছেন, পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাওয়াই শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য, "চরৈবেতি" অর্থাৎ শুধু চলো আর চলো। এই যে চিরন্তন অভিযান আলোর দিকে, অন্ধকার পথে এই যে তীর্থযাত্রা, এর কোনো শেষ নেই। এখানে পাথেয়ই প্রধান অবলম্বন। শিক্ষার পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি দুটি জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, শিক্ষায় আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াই হ'ল প্রধান, অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে প্রথমে উন্মুখ হতে হবে। শিক্ষার জন্যে চাই মনের প্রস্তুতি, শ্রদ্ধা ও প্রেষণা—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় motivation। এই আগ্রহ, এই প্রেষণার সঞ্চার না হলে কোনো শিক্ষাই সার্থক হতে পারে না। উপর থেকে চাপিয়ে দেবার জিনিস এ নয়, অন্তর থেকে তার সঞ্চার; তাই শিক্ষকের কাজ কেবল বক্তৃতা দেওয়া নয়, এই

প্রেষণা সঞ্চার করা। স্বামীজি শিক্ষক সম্পর্কে বলেছেন যে, শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে শিক্ষার্থীর সামনে একটা আদর্শ তুলে ধরা, আচরণের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতাকে জাগিয়ে তোলা। তাঁর মনোভাব হবে সেবার মনোভাব। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকবে। আগে তাঁকে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে শেখাতে হবে, আগে তাঁকে শিক্ষার্থী হয়ে জানতে হবে। তবেই তো তারা অনুকরণ করতে শিখবে। স্বামীজির এ এক অপূর্ব বিশ্লেষণ। এই নির্দেশের মূলে একটি দার্শনিক সত্য লুকিয়ে আছে তা হ'ল এই যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই, সবাই সেই অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। তাই There is nothing like teaching—কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। এক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে আর এক ব্যক্তিত্বের উপর। আর এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার সঞ্চার হয়।

স্বামীজির এই শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের চরম সত্য উঁকি দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল উদ্যান রচনার কাজ, আর সে উদ্যানের অঙ্কুর হচ্ছে শিশু। সৃষ্টিকর্তার রহস্যময় প্রক্রিয়ার ফলে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে যথাযথ বারিসিঞ্চনে রৌদ্রাতপনিয়ন্ত্রণে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই তো কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হবে। এইভাবে শিক্ষায় পরিবেশ-রচনার দিকে স্বামীজি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল এই পরিবেশ-রচনা। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আপনা থেকেই শিশু বেড়ে উঠবে। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও যে একটি কথা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে, কি ক'রে আমাদের একাগ্রতা বাড়াতে হবে? তাঁর মতে, আমাদের যে সব স্নায়ু-কেন্দ্র আছে তারই সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতার লেনদেন ঘটে। এই স্নায়ুগুলোকে যদি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, স্নায়বিক সংহতি ও সংযোগ যদি স্থাপন করা যায়, তবে অভিনিবেশ বা আগ্রহ আসবেই। Building up nervous associations কি ক'রে সম্ভব সে সম্পর্কেও তিনি কয়েকটি মূল নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, নিয়মিত ধ্যান-ধারণা, দেহকে বলিষ্ঠ রাখা ও কিছু কিছু যোগাভ্যাস করা। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। স্বামীজি চেয়েছিলেন ভারতের গণজাগরণ। সেই

গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার। চাই এমন শিক্ষাসেবী যারা পল্লীপ্রান্তে গিয়ে দীনের কুটিরেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবে। সে শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা নয়। তা হচ্ছে জীবন গড়ার শিক্ষা, চরিত্র গঠনের শিক্ষা। অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে স্বপ্ন তা যেন দেখতে শেখে এই সব দরিদ্র জনসাধারণ, কারণ তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গণদেবতা। তাই তো স্বামীজির দৃষ্টিতে তারা দরিদ্রনারায়ণ। তাই তিনি মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে নিজের ভাই ব'লে সম্বোধন করেছেন। এদের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাকে জাগ্রত করতে হবে। এ কথা সত্যি নয় যে, ভারতের আত্মচিন্তা তাদের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোয়নি। তারাই হ'ল ভারত মায়ের আদুরে ছেলে। তাদের সঙ্গে তাই ভারতের মাটির নাড়ির টান। তারা জানে যে, দেহ আর আত্মা এক নয়, শরীরকে তারা আলাদা ক'রে ভাবতে শিখেছে, তাই গ্রামে গিয়ে অনেক জায়গায় তাদের বলতে শুনেছি, বাবু, শরীরটা আজ ভালো নেই; কখনও বলেনি, আমি ভালো নেই। মনের অবচেতন স্তরে কোথা থেকে তাদের এই শিক্ষার স্রোত পৌঁছে গেছে যে, আমি হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিক সত্তা যা শরীরের চেয়ে অনেক বড়। তাই শরীরকে আমি-র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে শিখেছে তারা। এখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতের আকাশে বাতাসে সেই সাংস্কৃতিক মন্ত্র। স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ, দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, একটি যেন আর একটির পরিপূরক। পরিশেষে এই কথাই বলতে হয় যে, তাঁর মতে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল বিমুক্তি। এ কেবল আত্মার বিমুক্তি নয়; সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি, সকল দুর্বলতা থেকে মুক্তি। ইংরেজীতে একে বলা যায়—Salvation of all kinds—Spiritual, Economic, Social and Political।

এ কথা মানতেই হবে যে, স্বামীজি তদানীন্তন সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, আর সেই আলোড়ন কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একটা কথা আছে যে, Great men think alike অর্থাৎ যাঁদের মধ্যে লোকোত্তর প্রতিভা রয়েছে সেই মহাপুরুষরা একই ধারায় চিন্তা করেন। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা-বিচিন্তার সঙ্গে স্বামীজির শিক্ষা-বিচিন্তার মূলগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন। ভারতের যুগতপস্যার ফল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নবজাগরণের প্রতিভা তাঁর মধ্যেই স্ফুরিত হয়েছিল। তাঁর সর্বব্যাপী জীবনদর্শন শিক্ষাকেও স্পর্শ করেছিল। তাই জীবনদর্শী সাধকের দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনায়। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন এমনি একটি তপস্যা যা আমাদের বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে, আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ও অনন্ত শক্তির মধ্যে সংগতি বিধান করে। এই সংগতি ও সামঞ্জস্যবিধান শিক্ষার মূলকথা। চারদিকে যে ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে, যে আনন্দের ধারা বইছে তারি মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবে—এইতো হ'ল শিক্ষার মূলকথা। একদিকে ব্যক্তিসত্তা, আর একদিকে বিশ্ব-প্রকৃতি, এই দুইএর মধ্যে মহামিলন ঘটাতে পারে কেবলমাত্র শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব এই কথাই বলে যে, মানব-জীবন আনন্দেরই প্রকাশ, তাই আনন্দকে তিনি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে, কেবল বুদ্ধির বিকাশেই শিক্ষার সার্থকতা আসে না, আসে অনুভূতির প্রকাশে। আজ আমরা অনুভূতির সেই পরম সম্পদকে উপেক্ষা ক'রে চলেছি, তাইতো এত বিড়ম্বনা।

বার বার কবিগুরু এই অনুভূতির দিকে আমাদের সচেতন ক'রে দিয়েছেন। মানুষ মানুষ কিসে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে মানুষ আজ দেবতার জয়টীকা পরেছে, হিংসার মধ্যেও প্রেমের জয়গান গেয়েছে। এই প্রেম জীবনের সব তুচ্ছতাকে ভুলিয়ে দেয়। এই বোধের তপস্যা এনে দেয় অমরত্ব, মানুষকে ক'রে তোলে নির্ভয় মৃত্যুঞ্জয়। ঋষি রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন এই পরম সত্যকে, সব দেহমনকে তিনি উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর রূপরসের নৈবেদ্যকে আস্বাদ ক'রে তিনি ধন্য হয়েছেন। প্রবৃত্তির মাধ্যমে নিবৃত্তির পথে উত্তরণের ইঙ্গিত তাই তাঁর বহু কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ সংস্কার, মানুষের হাতেগড়া বিচারের মাপকাঠি তিনি উপেক্ষা করেছেন। মুক্ত আকাশে বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দিয়ে শূন্যলোকে উধাও হয়েছেন, সংকল্প ছিল অমরাবতীর বার্তা বহন ক'রে নিয়ে আসা। কবি কেবল তাঁর স্বপ্নলোকেই বিচরণ করেননি। মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে তাকে ভালোবেসেছেন, বুঝেছেন যে জীবনকে ধন্য করতে হলে চাই আত্মার উন্মোচন। তাই উপলব্ধি ও উন্মোচন

এই দুটি প্রক্রিয়াই তাঁর কাছে সমান মূল্য পেয়েছে। নিজেকে মেলে ধরবার যে চেষ্টা, নিখিলের মাঝখানে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যে স্বপ্ন, তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য তাঁর মতে নির্দিষ্ট নয়, একটা গতিবাদের ইঙ্গিত সেখানেও যেন ফুঠে উঠেছে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে। তিনি বুঝেছেন, যা-কিছু গতিহীন যা-কিছু নিশ্চল, সেখানেই আছে গ্লানি, সেখানেই সত্যের অপমৃত্যু ; আর যেখানে গতি, স্পন্দন, বেগ সেখানেই আছে সত্যের পরমপ্রকাশ। তাইতো তাঁর দৃষ্টিতে তুলিতে আঁকা ছবি মসীর বন্ধন উপেক্ষা ক'রে মূর্তরূপ নিয়েছে, ভাষা পেয়েছে অনন্তের মাঝখানে ; তাইতো নদী কেবল জলধারা বয়েই চলে না, নিখিল সৃষ্টিপ্রবাহের স্পন্দন তারি মধ্যে ধ্বনিত।

এই গতির ছন্দটুকু তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ চিন্তা তাঁর মৌলিক। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকেও তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তপোবনের শিক্ষাকে শান্তি-নিকেতনের শিক্ষাধারার মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন তিনি। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় বিহঙ্গের কাকলীর মাঝখানে সবুজ প্রাণের যে অবুঝ উচ্ছ্বাস চলতে থাকে, সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন যে সার্থক হয়ে ওঠে তা তিনি বুঝেছিলেন। সেখানে ইটকাঠের ব্যবধান নেই, আছে প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ। আছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অন্তরাত্মার যোগ। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত-স্রোতের মতো চলাচল করতে পারে। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটি অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে ; সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। এখানে শিক্ষায় স্বাধীনতার যে যথেষ্ট মূল্য আছে এ কথা তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাবের দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিক্ষাকে তিনি তপস্যা ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে 'আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে'।

শিক্ষক সম্পর্কে কবি অনেক কথাই বলেছেন। তার মধ্যে তিনি জোর দিয়েছেন শিক্ষকের চরিত্রের দিকে। অবশ্য চরিত্র কথাটি তিনি সংকীর্ণ অর্থে

ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, যা মানুষকে চলতে শেখায়, যা মানুষকে আচরণ করতে শেখায় তাই হচ্ছে চরিত্র। তাই তিনি বলেছেন, শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল শিক্ষার্থীর চিত্তকে গতিশীল ক'রে তোলা, আর তা করতে হলে তাঁকে প্রাণের নবীনত্ব বজায় রাখতে হবে। কেননা, এই নবীনত্বের অভাবে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে শিক্ষকের মূল্য অনেক বেশি। শিক্ষক যোগ্য হলে তিনি অবস্থানুযায়ী যে কোনো শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন বা উদ্ভাবন করতে পারেন, কারণ শিক্ষা হ'ল একটি প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া। এক প্রাণ হতে অন্য প্রাণে যে অনুভূতি-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তারি ফলে শিক্ষার সঞ্চার। বোধের তপস্যাকে কবি প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ এই বোধ না হলে জীবনের উপলব্ধি আসে না, সাংস্কৃতিক মন গ'ড়ে ওঠে না। নীতি বলতে তিনি বুঝেছেন জীবনদর্শন। আর ধর্মের সঙ্গে নীতির যোগাযোগ থাকলেও দুইএর মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। যা আমাদের জীবনকে ছন্দোময় ক'রে তোলে, যা মনের আবর্জনা দূর করে, তাকেই কবি নীতি বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন। সংস্কৃতিবান্ ক'রে তোলার মাধ্যমে যে নীতিশিক্ষার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সমস্যার মুখোমুখী হয়ে শিক্ষাগুরু অনেক বাস্তব সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রথমেই আনতে হবে মানবিক চেতনা। শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে তা সম্ভব নয়। তেমনি শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকা চাই। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের এই যে বন্ধন একে তিনি শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছলেই হ'ল।

জনশিক্ষার দিকেও তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের অধিকাংশ নাগরিক জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত। বিশেষ ক'রে যাঁদের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, যাঁরা জননী, তাঁদের শিক্ষিত ক'রে না তুললে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে কি ক'রে! তাই তিনি লোকশিক্ষা-সংসদের প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মাধ্যমে গৃহস্থালীর কাজ করতে করতেও গৃহস্থ বধূরা জ্ঞানের আলোক পেতে পারবেন—এই ছিল তাঁর আশা। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ সরলভাবে

তথ্য পরিবেশনের সংকল্প নিয়ে তাঁর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের আয়োজন। কেবল তাই নয়, কবিগুরুর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা তখন বেশ একটা সাড়া জাগিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থীরা জনসেবার কাজে এগুবে এটাই ছিল তাঁর আশা। শিক্ষার সঙ্গে তাই এই সব কাজের নিবিড় যোগাযোগ সাধন করবার জন্য তিনি নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যাতে জীবনের শুরু থেকে শিক্ষার্থীরা শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে, যাতে সমাজের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর লোকদের শ্রদ্ধা করতে শেখে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার প্রবর্তন করেন। হাতের কাজ, শিল্প, এমন কি যুগোপযোগী যান্ত্রিক শিক্ষার দিকেও তিনি সজাগ ছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। একদিকে হৃদয়ের কমনীয় বৃত্তির উন্মোচন, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা—এই দুইএর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায়। তিনি বুঝেছিলেন যে, সকলেই চায় আত্মপ্রকাশ করতে, আত্ম-উন্মোচনের তাগিদ সবার মাঝখানে। কিন্তু ভাষা সেখানে বড় অসহায়। কতটুকুই বা আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি!

ভাষার যাদুকর হয়েও ভাষার এই অক্ষমতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন, তাই হৃদয়ের ভাষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্যে আরও কয়েকটি মাধ্যমের আশ্রয় নিয়েছেন। কখনও রেখা, কখনও সুর, কখনও বা নৃত্য ও ভাস্কর্য তাঁর হৃদয়ের ভাষাকে রূপ দেবার ভার নিয়েছে। অন্তরের এক অব্যক্ত তাগিদ কবিকে যেন পাগলের মতো প্রকাশের পথে ছুটে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। তাইতো আমরা তাঁকে কখনও কবি, কখনও চিত্রশিল্পী, কখনও বা সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে পেয়েছি। জীবনের এই যে বিচিত্র ধারা, এর সঙ্গম ঘটেছে রবিতীর্থে। শিক্ষার মধ্যে সব কিছুর পরশ লেগেছে, কারণ সবকিছু নিয়েই তো শিক্ষা। আজ সেই শিক্ষাকে পরিবেশন করতে হলে বিদ্যালয়ই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে চাই আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমাজদেহে এই সব প্রতিষ্ঠানের পত্তন করতে হবে। পরিবার থেকে শুরু হবে শিক্ষার উন্মেষ। প্রতিটি পরিবারই শিক্ষার বুনিয়াদ গড়বে, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ভার নেবে। তারপর আমাদের দেশের পাঠাগারগুলোরও একটি বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। তাদের কেন্দ্র ক'রে জনশিক্ষার প্রসার হবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষাগুরু

রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের দেশে সাধারণ উৎসবগুলোরও এক একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাদের ঘিরেও আমাদের জনসাধারণ শিক্ষার আলো পায়। এ ছাড়া, কথকতা, যাত্রা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত যা আজ বিলুপ্তপ্রায়, তাদের আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এইভাবে জনশিক্ষার জন্যে তাঁর মন সব সময়েই ব্যাকুল ছিল।

রবীন্দ্রনাথ কেবল শিক্ষার মাঝখানেই জীবনকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। শিক্ষার চেয়েও সংস্কৃতির মূল্য তাঁর কাছে অনেকখানি, কারণ সেখানে আছে রুচি, শালীনতা,—আছে জ্ঞান ও বোধের তপস্যার সংমিশ্রণ। তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"জ্ঞান যদি হীরক, তবে সংস্কৃতি হবে তার দ্যুতি।" সত্যই সংস্কৃতির সৌরভ না থাকলে মানব-জীবনের সার্থকতা কোথায়? কেবল পুঁথিগত শিক্ষা সংস্কৃতির সন্ধান দিতে পারে না, এর জন্য চাই হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন। আজ আমাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা এই যে, বিজ্ঞান-জগতে আমরা বহু কিছু উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু সংস্কৃতির পথে আমরা ততখানি এগিয়ে যেতে পারিনি। তার ফলে যন্ত্রদানব আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। ক্রমশ মানব-প্রীতির অভাব ঘটেছে। তাই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্যে তাঁর বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর শিক্ষাদর্শন। শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক মনীষীর অভ্যুদয় হয়েছিল। তিনি ভারতপ্রেমিক গান্ধীজি। দেশের কল্যাণই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তিনিও বুঝেছিলেন ভারতের চরম দুর্দশার কথা। বুঝেছিলেন, আমাদের সমাজ এখনও অনেক নিচে। তাকে ভেঙ্গেচুরে এক নতুন সমাজের বুনিয়াদ খাড়া করতে হবে, আর তা করতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকে গান্ধীজি মূলত একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে দেখেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হ'ল, সামাজিক উন্নয়ন ও মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। দুই একটি কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, পূর্ণ সামাজিক বিকাশের জন্যে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে সকলকে নিয়ে যেতে হলে চাই জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ, কারণ জীবন থেকেই শিক্ষা রস আহরণ করে।

গান্ধীজির আদর্শ ছিল জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমন্বয়। পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে জ্ঞান ও কর্ম। শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, মানব-জীবনের সমস্ত দিকের বিকাশ গান্ধীজির কাম্য হলেও ধর্মীয় বিকাশকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই পূর্ণবিকাশের জন্যে তিনি যে আশ্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে শিক্ষা হবে একটি তপস্যা। ভিন্ন ভিন্ন ব্রতপালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-জীবনের নৈতিক ভিত্তি গ'ড়ে উঠবে। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাই দেখা যায়, গান্ধীজি-প্রবর্তিত শিক্ষায় সবখানেই কর্মের জয়গান; কর্ম ও ধর্ম যেন হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। সেখানে কর্মের মধ্যেই অবসরের সূচনা, নতুন কোনো অবসরের প্রয়োজন নেই। তিনি বুঝেছিলেন যে, আলস্যই মনে আবর্জনা নিয়ে আসে। তাই যে কোনো ভাবে আলস্যকে দূর করতে হবে। এ ছাড়া মানুষের সৃজনী প্রতিভা নানাখাতে বয়ে চলে, তাদের রূপ দিতে হলে চাই ভিন্নমুখী কর্ম। কৃষি ও কৃষ্টি এ দুইএর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না যদি তার মধ্যে থাকে মনন, থাকে বিহ্বলতা। গান্ধীজির দৃষ্টি ছিল ব্যাপক ও গভীর। তিনি বুঝেছিলেন যে, শ্রমবিমুখ ভারতবাসী জীবনের সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, তাই সেখানে শিক্ষাকে ভিত্তি ক'রে কর্মের উৎসাহ জাগাতে না পারলে জাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যে যার রুচি অনুযায়ী বিচিত্র কর্মধারার একটিকে বেছে নেবে। তাকে ঘিরেই তার পরিক্রমা শুরু হবে, অভিজ্ঞতার প্রসার হবে, আর সেই অভিজ্ঞতাই দেবে শিক্ষার সন্ধান। Learning by doing —এই ছিল তাঁর শিক্ষার নীতি। কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা আসে সেটাই হয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান। তা ছাড়া এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা কর্মীর মধ্যে বাস্তবদৃষ্টি আনে, জীবনের প্রস্তুতি আনে। শৈশব থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব নিতে শেখে সেজন্য গান্ধীজির প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় দায়িত্ববণ্টনের ব্যবস্থা আছে। কেউ বা সভাসমিতি, কেউ বা এক-একটি বিভাগীয় কাজ, কোনো কর্মশালার এক-একটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে তাদের জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজেদের শ্রেণী-সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে শেখে।

বুনিয়াদী শিক্ষা। যাতে শ্রেণীব্যবধান ও জাতিভেদের অবসান ঘটে এজন্যেও এই মনীষীর চিন্তার অবধি ছিল না। এখানেও দেখা যায় যে, তিনি সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক সাম্যের উপর ভিত্তি ক'রে এক নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। এই সমাজের ভিত্তিস্থাপন হবে বিদ্যালয়ে—এই ছিল তাঁর আশা। শিক্ষাকে সবদিক থেকে ফলপ্রসূ করবার জন্যে তিনি তাকে কর্মকেন্দ্রিক করতে চেয়েছেন। উৎপাদনই সেখানে বড় কথা নয়, এটা শিক্ষার একটি স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। সমাজ-চেতনা বা সামাজিকতা বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। কর্মকে কেন্দ্র ক'রে পরস্পরের মধ্যে যে বোঝাপড়া, যে আদান-প্রদান সেটাই বৃহত্তর সমাজে বিশেষ কার্যকরী হয়। যে সব জিনিস বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে উৎপন্ন হয় সেগুলোকে পণ্যহিসেবে বিক্রয়ের জন্যে সাধারণ বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়, এইভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলোর একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা আসে। আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা চিন্তা ক'রে গান্ধীজি তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়কে পণ্যশালায় পরিণত করতে কোনোদিন তিনি চাননি। আজ অবশ্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা শোনা যায়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, গান্ধীজির মতে কর্ম ব্যক্তিত্ববিকাশের একটি মাধ্যমমাত্র। সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে শুধু শিশুর মন ও বিষয়কে জানলে হবে না। ভিন্ন ভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্ণবিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত। তাই পরিচালনার শক্তি ও সামর্থ্য না থাকলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যোগ্যতা আসে না। নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার চেয়ে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূলকথা।

দেশপ্রীতি ও ঐক্যবোধের উন্মেষের দিকেও বুনিয়াদী শিক্ষা সজাগ। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করলে চলবে না, এ কথা গান্ধীজি

স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ মূল্য আছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিকাশের অবকাশ খুবই অল্প। একটি বিশেষ শিল্পব্যবস্থাতে সীমায়িত রাখায় শিশুর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। তা ছাড়া এই বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পল্লীপরিবেশেরই উপযোগী, কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজ বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু কিছু ব্যবস্থার রদবদল করবার নির্দেশ অনেকে তাই দিয়ে থাকেন। সত্যদ্রষ্টা গান্ধীজির এই পরিকল্পনা আজ সমালোচনার সম্মুখীন হলেও তার পেছনে যে একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে জীবনদর্শন চিরন্তন, তার ভিত্তি কেবল বস্তুসর্বস্ব নয়, আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে তা সমৃদ্ধ। তাছাড়া পল্লীপ্রধান ভারতের রূপ ও গড়ন সহজে বদলাবার নয়। এই দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর শিক্ষাদর্শন। ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর এক মহামনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিস্মৃত হবার নয়। শিক্ষাকে তিনিও খণ্ড ছিন্ন ভাবে দেখেননি। জীবনের সঙ্গে শিক্ষা যে মেশামেশি হয়ে আছে; একটি যে আর একটির অঙ্গীভূত—এ কথা তিনি বহু জায়গায় বলেছেন। জীবনকে শ্রীঅরবিন্দ নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি মানবজীবনের অমরত্ব ঘোষণা করেছেন, আজীবন সাধনা করেছেন দিব্যজীবন লাভ করবার জন্যে। দেহকে তিনি কোনোদিন উপেক্ষা করেননি, বরঞ্চ সাধনার পথে দেহের উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁর মতে যোগ-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। জীবনকে যতই পবিত্র করা যায় ততই মানুষের মন স্বচ্ছ হয়, ততই সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এই পবিত্রতা ও পূর্ণতা আনতে গেলে আমাদের সত্যান্বেষী হতে হবে। প্রেম, প্রজ্ঞা, শক্তি ও সৌন্দর্যসাধনা এই চার পথ বেয়ে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়, দিব্যজীবন শতদলের মতো দল মেলে, চারদিকে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে।

জীবনের এই যে পরম প্রকাশ তা সম্ভব হয় সেই অনন্তশক্তির কল্যাণে। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই শক্তি সারা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে পরিব্যাপ্ত, তার সঙ্গে মিলন তাই প্রত্যেক মানুষের বাঞ্ছনীয়। যতদিন সেই মিলনের পথে বাধা ততদিনই দুঃখ-বিচ্ছেদের বেদনা। কে সেই জীবনদেবতা যার জন্যে আমাদের এই নিরন্তর আকুলি-বিকুলি! তার উত্তরে তিনিই বলেছেন, The unknowable is something to us supreme and wonderful। তাঁকে না জানলে অন্ধকার আমাদের চারদিকে ভিড় করে। তাঁকে জানার মধ্যেই আছে আনন্দ, আছে উন্মাদনা। এক গভীর তৃপ্তি মানুষের মনকে ভরিয়ে দেয় যখন সেই দিব্য স্পর্শ পেয়ে মানুষ ধন্য হয়। একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আত্মার মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সেই মুক্তির পথে জয়যাত্রা। ব্যক্তিজীবনে বিশ্বস্রষ্টার যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তার মধ্যেই সব রহস্যের সন্ধান মেলে। তাকে আবিষ্কার করার মধ্যেই আছে প্রগতি, শিক্ষাই সেই প্রগতি এনে দেয়। মায়ায় ঘেরা এই সংসার। সেই মায়াময় জীবনে সত্যের সন্ধান পেতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন। ইংরেজীতে যাকে বলেছেন Supramental knowledge। আমাদের মন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সেই প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে না। তাইতো অন্তরের যে সংগ্রাম চলতে থাকে অজানাকে পাবার জন্যে—তা জীবনব্যাপী। তবে যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত, আমাদের মনদর্পণে মাঝে মাঝে সে উঁকি দেবেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "Mind is a reflective mirror which receives presentations or images of a pre-Existent Truth."

মরজগতের বাইরে পদক্ষেপ করতে হলে দিব্যজীবনের অধিকারী হতে হবে। যে আত্মা অবিনশ্বর তাকে উদ্ধার করতে হবে, দেহপিঞ্জর থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে ; তবে সে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পাবে। এই স্তর আমাদের অনেকেরই অগম্য, কিন্তু ঋষির স্বপ্নে বার বার তা দুলে উঠেছে। মৃত্যুর আবরণ সেখানে টুটে গেছে, মনে হয়েছে—মৃত্যু সেই অমৃতলোকের সিংহদ্বার। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন, তাই তিনি গেয়েছিলেন "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। ইন্দ্রিয়লোক আনে বিভ্রম, আনে মোহবন্ধন, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবেই সেই অতীন্দ্রিয় দিব্যসত্তার স্পর্শে ধন্য হওয়া যাবে।

জীবন-মরণের সব রহস্য একে একে বিদায় নেবে। কিন্তু কি সম্পদের অধিকারী হলে আমরা এই ছোট্ট গণ্ডি দিয়ে ঘেরা জীবনে অসীম অনন্তের স্বর শুনতে পাব? এই প্রশ্ন ঋষিমনকে বার বার বিহ্বল ক'রে তুলেছে। শেষে তাঁর চেতনা ও বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করেছে। কিন্তু জ্ঞানের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারাননি। জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি গীতার বাণী জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—অর্থাৎ জীবনে জ্ঞানের থেকে পবিত্র আর কিছুই নেই। তাই সেই জ্ঞানের হুতাশন জ্বালিয়ে মানুষের কামনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। সেই অমর লোকের পথে উত্তরণ করতে হলে অতিপ্রাকৃত মনকে গ'ড়ে তুলতে হবে, অজ্ঞতাকে দূর করতে হবে। তবেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা দেখা দেবে, তবেই সেই দেবলোক থেকে নেমে আসবে দিব্যদ্যুতি,—ম্যনুষকে তা অমর করবে, করবে জ্যোতির্ময়। শ্রীঅরবিন্দের এই দার্শনিক চিন্তা মনকে বিহ্বল ক'রে দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে, কে এই পরম পুরুষ? স্বর্গের দেবদূত ব'লে ভ্রম হয়। তবে এ কথা বললে ভুল হবে যে, তিনি কেবল অবাস্তব লোকে বিচরণ করেছেন। যা তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন তাকে রূপ দেবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। দেশের মাটিকে তিনি নিবিড় ক'রে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে। স্বাদেশিকতা ও মানব-প্রেম সেখানে হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। দেহকে বৈতরণী পারাপারের নৌকা হিসাবে তিনি দেখেছেন, সেখানে জ্ঞান হবে কর্ণধার, তরঙ্গসঙ্কুল পারাবারে বুদ্ধি হবে সঙ্গী। এই বুদ্ধিকে নিরন্তর পরিমার্জনের ফলে উত্তীর্ণ করতে হবে। কি প্রক্রিয়ায় চিৎশক্তি উদ্বুদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। একাগ্রতা, চিন্তানিয়ন্ত্রণ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ যে আত্মশক্তি লাভ করে তা শিক্ষার পথকে সুগম ক'রে তোলে। শিক্ষা বলতে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ একটি প্রক্রিয়া বোঝেননি। তিনি বুঝেছেন, যে উপায়ে মানুষ সেই দিব্যসত্তার অধিকারী হতে পারে তাই হ'ল শিক্ষা। তবে বাঁচতে হলে বাস্তবকে উপেক্ষা করলে চলবে না। স্বদেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। দেহের উৎকর্ষ

আনতে হবে, মনকে বলিষ্ঠ করতে হবে। এইভাবে জীবন ও শিক্ষার মাঝে একটা সংহতি আসবে।

এক এক যুগে এক একটি ব্যক্তিত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যুগমানস সমাজ ও শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়। যাঁরা মনীষার ধারক ও বাহক তাঁদের ধ্যান-ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। যে ক'জন ভারতীয় মনীষীর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান তাঁদের মধ্যে স্বামীজি, গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি বিদেশীয় শিক্ষাবিদ্‌দেরও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানও স্মরণীয়।

শিক্ষায় বিদেশীয় ভাবধারা

রুশো (Rousseau)

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। শিক্ষাতত্ত্বে এই সার্থক পরিণতির পথিকৃৎ হলেন রুশো। অসহায় উপেক্ষিত শিশুকে মুক্তি দেওয়ার মানসে তাঁর মনীষা এক নতুন দৃষ্টির সন্ধান দিল। তিনি এক শিক্ষাবিপ্লব আনলেন, আর সেই বিপ্লবের ফলে সে যুগের দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শন সবক্ষেত্রেই এক যুগান্তর এলো। বিশেষত, শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর মৌলিক চিন্তা প্রণিধানযোগ্য।

দর্শন ও শিক্ষা পারস্পরিকভাবে জড়িত, তাই রুশোর শিক্ষাচিন্তার পেছনে তাঁর দর্শনের ধারা লক্ষ্য করবার মতো। তিনি বলেছেন যে, বিশ্বের অন্তরালে এমন একটি ইচ্ছাশক্তি আছে যা তাকে গতিশীল ক'রে তোলে। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের সমস্ত কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। একদিকে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি, আর একদিকে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ভিন্ন ভিন্ন স্রোত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তার প্রকৃতির মাঝে আছে আদর্শের ইঙ্গিত, সত্যের ইঙ্গিত। সবকিছু সৌন্দর্য জমা হয়ে আছে প্রকৃতির রূপমঞ্চে।

রুশোর প্রাকৃতবাদ জন্ম নিয়েছিল তাঁর এই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ থেকে। তিনি বুঝেছিলেন যে, মানুষ স্বভাবতই সুখ-দুঃখের আস্বাদ পায়। আর তার সঙ্গে প্রকৃতির যে আত্মীয়তা তা নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর মতে

প্রকৃতি হ'ল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, প্রকৃতির রাজ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

যদিও রুশো প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ব'লে মনে করেছেন, তবুও তিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি। রুশো বলেছেন যে, সুখ সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা কোনো শ্রেণীবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তাঁর বাস্তবদৃষ্টি মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে, তাই তাঁর মতে সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল সুখকে করায়ত্ত করা। এই সুখ ও শান্তির পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, শিল্প ও রাষ্ট্র।

রুশো স্বীকার করেছেন যে, আমরা শিক্ষা পাই প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে ও বস্তুনিচয়ের কাছ থেকে। প্রকৃতি বলতে তিনি কখনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও শক্তিকে বুঝিয়েছেন, আবার কখনও বা প্রকৃতি বলতে তিনি যা সমাজ-বহির্ভূত তাকেও বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, যা প্রকৃতির কাছ থেকে আসে তাই ভালো এবং যা সমাজসৃষ্ট তাই মন্দ। সমাজ ও প্রকৃতি এখানে পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি। আরও ব্যাপক অর্থে রুশো প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বের বিধানকেও তিনি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

রুশো হলেন প্রকৃত ভাববাদী। তাই প্রকৃতির মর্মস্থলে যে মন, বুদ্ধি ও আত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল 'এমিল'। এই গ্রন্থে রুশো শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শিশুর হৃদয়, বিচারশক্তি ও চিত্তবৃত্তির বিকাশের দিকে নিয়োজিত করেছেন।

এ ছাড়া তাঁর আরও অনেক গ্রন্থ সে যুগে সাড়া জাগিয়েছিল। যেমন—(১) First Discourse on the Arts and Sciences, (২) Discourse on Inequality ইত্যাদি।

যে শিক্ষাতত্ত্ব রুশোর এই সব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাকে সংক্ষেপে নিবদ্ধ করা চলে ঃ—

(১) শিশুরা মূলত সৎ এবং জন্মমুহূর্তে সব শিশু একই রকম থাকে; সামাজিক পরিবেশ ক্রমশ তাদের মধ্যে বৈষম্য এনে দেয়।

(২) শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং শিক্ষাকার্য যত আগে শুরু হয় ততই ভালো।

(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশুর স্বাধীনতা ও সুখের ব্যবস্থা করা।

(৪) বস্তুর মাধ্যমেই শিশুর শিক্ষা চলবে, কারণ গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে যে জ্ঞান শিশুরা লাভ করে রুশো তার বিশেষ কিছু মূল্য দেননি।

(৫) শিক্ষাক্ষেত্রে বংশধারার চেয়েও পরিবেশের প্রভাব যে অনেক বেশি, রুশো তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এই সব শিক্ষাব্যবস্থায় যে কয়টি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রতিটিকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

এক থেকে পাঁচ বছরের শিক্ষা। রুশোর মতে, শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে স্বাধীনতার মাধ্যমে। স্বাধীনতা আর আনন্দ না থাকলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। তবে হৃদয়বৃত্তি ও কামনা নিয়ন্ত্রণ করার উপর রুশো যে জোর দিয়েছেন তাকে অনেকেই বাড়াবাড়ি বলেছেন।

প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে যে রূপের লীলা চলছে শিশুকে তার স্বাদ পেতে দিতে হবে ; তবেই সেই মুক্ত অঙ্গনে খেলাধুলো ক'রে তার দেহ-মনের বিকাশ ঘটবে। সেখানে আপনা থেকেই দেহ পুষ্ট হয়, মনের খোরাক জোটে। শৈশবের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নৈতিক উন্নতির দিকে রুশো কোনো জোর দেননি, এমন কি তার অভিজ্ঞতার ধারা যাতে সীমায়িত না হয় সেজন্যে তাকে অফুরন্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার জন্যে।

পাঁচ থেকে বারো বছরের শিক্ষা। যে কোনো কারণেই হোক রুশো মানব-সমাজের চেয়ে প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তিনি শিশুকে মানুষের উপর নির্ভরশীল না ক'রে বস্তুর উপরে নির্ভরশীল করতে চেয়েছেন। বস্তুর উপর নির্ভরশীল করবার দুটো দিক আছে—একটি মানসিক দিক, অন্যটি নৈতিক দিক।

নৈতিক দিক থেকে বলা হয়েছে যে, শিশুকে নীতিজ্ঞান দেওয়া কোনো-মতেই বাঞ্ছনীয় নয়, তার অন্তরকে ভুলভ্রান্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে ও তার শিক্ষা হবে স্বাভাবিক ফলভোগের মাধ্যমে। মানসিক দিক থেকে বলা হয় যে, অভিজ্ঞতাই হবে মানসিক বিকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

সেখানে কোনো বিষয় পাঠ্যভুক্ত করবার সার্থকতা রুশো দেখেননি। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশো বলেছেন যে, মানুষের প্রথম মনন হ'ল ইন্দ্রিয়ের মনন। তাই ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে পুস্তক ব্যবহার করলে শিশুর মৌলিক অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কর্ম ও নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রুশো যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা শিক্ষাজগতে এক যুগান্তর এনেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আরও বলেছেন যে, 'শৈশব হ'ল বুদ্ধিবৃত্তির নিদ্রার সময়।'

বারো থেকে পনেরো বছরের শিক্ষা। রুশো মনে করেছেন, এই স্তরের শিক্ষাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলবার সার্থকতা আছে। তাই শিশুর শিক্ষার গতিকে অনেক বাড়িয়ে তুলবার জন্যে রুশোর নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই স্তরের শিক্ষা হবে মূলত বৌদ্ধিক, অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশের জন্যে শিক্ষার সমস্ত আয়োজন নির্দিষ্ট থাকবে।

বিশেষত বাস্তবশিক্ষার গুরুত্ব এই স্তরে অনেক বেশি, তাই ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ও হাতের কাজ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে। এমন কি বিজ্ঞান শেখাতে গিয়ে যেসব সমস্যামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়, তাদের কর্মকেন্দ্রিক করবার নির্দেশ তিনি বারবার দিয়েছেন। এখানে রুশো ও ডিউইর পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখাতে গিয়ে মূর্ত সমস্যার প্রবর্তন করলে কিশোর-মনে বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয়। তাই ভূগোল শিক্ষা হবে প্রাকৃতিক বস্তুর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সেখানে শিক্ষা শুরু হবে সংকীর্ণ পরিবেশে এবং শিশু ক্রমশ জানা থেকে অজানার দিকে এগিয়ে যাবে। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে করতে শিশু ও কিশোর ক্রমশ কর্মঠ হয়ে উঠবে। একে একে শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা অর্জন করবে। এইভাবে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করবে।

পনেরো থেকে কুড়ি বছরের শিক্ষা। রুশোই প্রথম মানব জীবনের বয়ঃসন্ধিক্ষণের চরম মূল্যের কথা বলেছেন। এর পূর্ববর্তী স্তরে শিশুর দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিকাশের জন্যে শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। এই স্তরে তার নৈতিক ও সামাজিক জীবন গ'ড়ে তুলবার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

তিনি তাই বলেছেন যে, নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সমাজের আর পাঁচ জনের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। আর সেই নৈতিক জীবনের প্রধান চালক হবে অন্য সকলের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম। এই প্রেমময় সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে যোগ্য প্রস্তুতি আনতে হবে নানাভাবে, —কখনও উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের মাধ্যমে, কখনও বা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। ধর্মশিক্ষার জন্যে রুশো এক নতুন মতাবলী উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের স্বাধীনতা, অমরত্ব প্রভৃতি সদাচারের মূলনীতি নির্ধারণ করা। নীতি ও ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে রুশো এই বয়সের উপযোগী সৌন্দর্যতত্ত্ব পাঠ করাতে চান। সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলনীতি সম্বন্ধে রুশোর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। মানবজাতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান পরিবেশন করাও রুশোর শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মোটকথা, রুশোর মতে শিক্ষা হ'ল একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আর এর উৎস হ'ল মানুষের অন্তরে। মূলত এ শিক্ষা একটি জীবন-প্রক্রিয়া, তাই শিক্ষার মূলকথা হ'ল পরিচালনা ও নির্দেশ।

তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা তুলে ধরেছেন সেটি হ'ল মানবশিশুর বিবর্তন ও পরিণতি সম্বন্ধীয় ধারণা। তাঁর মতে মানবশিশু যখন ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই সব পর্যায় অনুযায়ী শিশুকে পরিচালিত করা,—যেমন শৈশবে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, বাল্যে বুদ্ধির শিক্ষা, বয়ঃসন্ধিক্ষণে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রুশোর মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্যের দিক থেকে রুশো ছিলেন ভাববাদী। তাই নৈতিক ও ধর্মশিক্ষাই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

মানবকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর ব্যবহারের নির্দেশ দিলেও রুশো বহুমুখী কর্মকে পাঠক্রমের মূলবস্তু ব'লে নির্ধারিত করেছেন। কথোপকথন, অঙ্কন, সঙ্গীত, হাতের কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথের নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও রুশোর প্রধান বক্তব্য হ'ল এই যে, শিশুমনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতির রূপ নির্ধারণ করা উচিত।

রুশোর মতাবলীর মূল্যায়ন। আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব ধারণা রুশো দিয়েছেন সেগুলির মূল্যায়নের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে।

মূলত দেখা যায় যে, রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু অসঙ্গতি রয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে নূতন ভাবধারার সঞ্চার করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে মানবশিশুর যে অগ্রগতি ঘটে সে সম্পর্কে রুশো ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা সব সময়ে সার্থকতা লাভ করেনি। মাঝে মাঝে তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাকে জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ক'রে দেখেছেন রুশো, আর সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর শিক্ষার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাকে ও জীবন-প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ এক ক'রে দেখা সঙ্গত নয়—কেন না, অনিয়ন্ত্রিত জীবনের সব কিছুই শিক্ষার মধ্যে স্থান পেতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শিক্ষাকার্যের উৎসকে শিশুর মধ্যে দেখা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ শিশু ও সমাজ—এই দুইই শিক্ষাকার্যের উৎস। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ধারার সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশ-ধারার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে মনে করা ঠিক নয়। সুতরাং এই ধারণার উপর নির্ভর ক'রে পাঠক্রম রচনা করলে বা শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয় করলে ভুল করা হবে। তাই রুশোর প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা করতে হলে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হবে। প্রথমত, তিনি শিক্ষাকে একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ব'লে মনে করেছেন এবং শিক্ষাকে শিশু-প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। আবার তাকে জীবন-প্রক্রিয়া বলে অভিহিত ক'রে রুশো শিক্ষাকে জীবন্ত ও জীবন-কেন্দ্রিক করতে চেয়েছেন।

পেস্তালৎসি (Pestalozzi)

রুশো শিক্ষায় যে যুগান্তর এনেছিলেন তা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্ম দিল। মানবপ্রেমিক এই মনীষীর মন শিশুর জন্য কেঁদে উঠেছিল ; তাই আজীবন তাঁর সাধনা। আর সেই সাধনার ধারাকে বজায় রাখবার জন্যে পেস্তালৎসি আত্মনিয়োগ করেন। শিশুর প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সমগ্র জীবনে ও কর্ম প্রচেষ্টায়। রুশোর ভাবনা ও

মননশীলতা পেস্তালৎসিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই প্রেরণাই তাঁকে বিচিত্র কর্মপথে টেনে নিয়ে গেছে। পেস্তালৎসির কাছে কর্মই ছিল ধর্ম। তাঁর পদ্ধতিকে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে বুঝতে হবে তাঁর শিশু-মনস্তত্ত্বকে। তাঁর মতে, জটিল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা শুরু হয়। মনোযোগের সাহায্যে এই সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে মনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগের ভেতর দিয়ে একে একে মানুষের মন শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। যে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তা হ'ল :—

(১) অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতি

(২) স্পষ্টতা ও বর্ণনা

(৩) সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

তিনি যে প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার নাম হ'ল আনসাউংগ (Anschaung) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কাণ্টের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। পেস্তালৎসি যে আনসাউংগ প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন তার জন্য শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিই যথেষ্ট নয়, মনের ক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। সংখ্যা, আকৃতি ও নামকে আনসাউংগের তিনটি মৌলিক রূপ ব'লে তিনি আখ্যা দিয়েছেন।

শিক্ষকের কাজ হ'ল এই প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা। তাই শেখার ব্যাপারে তিনি পরিচালনার উপর বেশি মূল্য আরোপ করেছেন। বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তুকেও তিনি বৈজ্ঞানিক দিকে প্রসার করতে চেয়েছেন।

শিক্ষাতত্ত্ব। পেস্তালৎসির মতে শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির দিকেই নির্দিষ্ট নয়। সামাজিক উন্নতিবিধানও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাতে সর্বসাধারণের শিক্ষা ও ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের বিকাশ একই সূত্রে গ্রথিত হয়, পেস্তালৎসি সেদিকে সজাগ ছিলেন। তিনি বিকাশের ধারাকে এক জৈবিক প্রক্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন। তাই কর্মের মাধ্যমে যাতে ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে সে সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ উল্লেখযোগ্য। দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে সমান স্থান দিলেও তিনি শেষে আত্মিক শিক্ষার উপরই বেশি গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। শিক্ষার বিষয়বস্তুর সম্পর্কেও তাঁর পরিকল্পনা খুব ব্যাপক ছিল। ভূগোল, প্রকৃতি-পাঠ, সংগীত ইত্যাদি বিষয়কে তিনি কার্যাবলীর সংগে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিষয়-

বস্তুগুলিকেও তিনি কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই পাঠক্রমের মধ্যে আরো বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর স্থান থাকা উচিত ব'লে তিনি মনে করতেন। শিক্ষায় গ্রহণীয় পদ্ধতির ব্যাপারেও পেস্তালৎসি লকের প্রয়োগতত্ত্ব ও রুশোর প্রকৃতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। শিশুদের মনোবিকাশের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাব যে দুর্নিবার, সে কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে শিক্ষার প্রক্রিয়ার ব্যবহার কার্যকরী হয়, সেজন্য তিনি ভাষার সংখ্যা ও আকৃতি সম্পর্কে বস্তু-পাঠের এক সম্পূর্ণ ক্রমের উদ্ভাবন করেছেন। জীব-জন্তু, চারাগাছ, মডেল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দ্বারা যে বাস্তবশিক্ষা তিনি প্রবর্তিত করেছেন তা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বস্তুত পেস্তালৎসি শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক করতে চেয়েছেন, আর তা করতে গিয়ে তিনি শিশুদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে কাজ, পর্যবেক্ষণ ও স্তরবিন্যস্ত কর্মধারার সাহায্যে শিক্ষাদান চালিত হওয়া উচিত। যে মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি ক'রে সহজ থেকে ক্রমশ কঠিনে নিয়ে যেতে হবে, সেগুলিকে নিয়ে পেস্তালৎসি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা গ'ড়ে তুলেছেন। সেগুলিকে সংক্ষেপে গ্রথিত করা হ'ল :—

(১) পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিক্ষাদান-কার্যের ভিত্তিস্বরূপ।

(২) ভাষাকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত।

(৩) শিক্ষাদান-কার্য সর্বক্ষেত্রে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলবে।

(৪) নৈপুণ্যলাভের জন্যে শিশুকে প্রত্যেকটি বিষয়ে যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

(৫) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশ।

(৬) এই জন্যে জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি এবং শিক্ষার সঙ্গে নৈপুণ্য যুক্ত করা উচিত।

মোটকথা, দৈহিক শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যুক্ত করতে হ'লে একটি সুসমঞ্জস পাঠক্রমের প্রয়োজন। দেহ-চর্চার জন্যে পেস্তালৎসি পৃথক্ কোনো ধারাবাহিক কর্মধারা উদ্ভাবন করেননি। শিল্পনৈপুণ্য ও কারিগরী কাজের দক্ষতাকে তিনি দেহচর্চার অঙ্গ ব'লে মনে করেছেন।

পেস্তালৎসির মতাবলীর মূল্যায়ন। পেস্তালৎসি তাঁর শিক্ষা-প্রকল্পে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিকে পারস্পরিকভাবে কল্পনা করেছেন ও তাকেই শিক্ষার চরম লক্ষ্য ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আগে যে সব শিক্ষাবিদ্ এসেছিলেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল যে-কোনো একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই মনীষী সর্বপ্রথম ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ-সাধনের মাধ্যমে সমাজের উন্নতিবিধানের স্বপ্ন দেখেছেন। এইভাবে ব্যক্তি ও সমাজ একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এইখানেই পেস্তালৎসির শিক্ষা-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সবদিকে জোর দিয়েছেন ও তাঁর অন্তর্বৃত্তির বিকাশের ধারাকে শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আত্মিক শিক্ষাকে তিনি সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ব'লে কল্পনা করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা চিরদিনই উপেক্ষিত। এই মনীষী তাই তাঁর পরিধিকে আরও বিস্তীর্ণ করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়বস্তুকে কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশন করবার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের মতোই সাহিত্য, ইতিহাস ও সৌন্দর্যবোধের চর্চা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকেও তাঁর চিন্তা শিক্ষাবিদ্দের অন্তর গভীর-ভাবে স্পর্শ করে। মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতির বাস্তব রূপায়ণ ক'রে তিনি শিক্ষার এক বিরাট সম্ভাবনা সকলের কাছে স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতিকে সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা কতদূর কার্যকরী হতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন।

দৈহিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার দিকে তাঁর একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টি ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা ক'রে তিনি একটি প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষককে তিনি যে আসনে বসিয়েছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রাণতা ও প্রেম এই দুইটি গুণই যে শিক্ষক-জীবনের পরম সম্পদ, এ কথা তিনি বার বার বলেছেন।

বিদ্যালয় সম্পর্কেও তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য। গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, তাকে কমিয়ে নিয়ে এসে বিদ্যালয় গৃহের অনুকূল পরিবেশ রচনার চেষ্টা ক'রে তিনি একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

মোটকথা, রুশোর পরে পেস্তালৎসির আবির্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। রুশোর মতবাদকে ভিত্তি ক'রে পেস্তালৎসি তাঁর শিক্ষাসৌধ রচনা করলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি চিন্তায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন ও সাহসভরে অস্পষ্ট শিক্ষাতত্ত্বকে স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং এই হিসাবে তিনি শিক্ষার অগ্রদূত।

হার্বার্ট (**Herbert**)

শিক্ষায় একটি ভাববাদের বন্যা এসেছিল যখন রুশোর মতো আরও অনেক মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। সে আজকের কথা নয়। একে একে তাঁদের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জন হার্বার্ট এই মনীষীদের অন্যতম। তিনি রুশোর পথ অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁর প্রভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নিবার হয়ে দেখা দিয়েছে। এক পূর্ণাঙ্গ মনস্তত্ত্বের উদ্ভাবনে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হার্বার্টের অবদান কম নয়। শিক্ষার নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব স্থাপন ক'রে তিনি এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। একদিকে নৈতিক ও সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব স্থাপন, অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব-নির্ভর এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন, হার্বার্টের শিক্ষানীতির মূল কথা।

হার্বার্টের দর্শন। হার্বার্টের দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই বেশি সার্থকতা লাভ করে। তিনি ফিক্‌টের তত্ত্বকে বর্জন ক'রে এক বাস্তববাদী দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের অভিজ্ঞতাই তাকে প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, আর সেই প্রকৃত বস্তুর মধ্যে আত্মা অন্যতম। পারস্পরিক সম্পর্কে এসে বস্তুগুলি একে একে সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু তবুও নিজস্ব প্রকৃতি বজায় রাখবার চেষ্টা করে। বস্তুনিচয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ঘাত-প্রতিঘাত মানব-অভিজ্ঞতার উৎসস্বরূপ।

এই সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা জন্মায় ও পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশ নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়।

মোটকথা, মানুষের ধারণা যে গতিশীল ও সক্রিয় এবং মানবসমাজের ভিত্তিস্বরূপ,—একথা হার্বার্ট মনে করতেন।

হার্বার্টের শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পুরাতন মনস্তত্ত্বের পার্থক্য হ'ল এই যে, তিনি ধারণাগুলিকে প্রক্ষোভ ও সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ধারণাগুলি যখন সুষম হয় তখন প্রীতির সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বৈষম্য ও সংঘর্ষের উদ্ভব হ'লে বেদনার জন্ম হয়।

যখন মনের সামনে কোনো নতুন ধারণা উপস্থাপিত করা হয়, তখন সেটি অন্য ধারণার সাহায্যেই বোধগম্য হয়। নতুন ধারণাগুলি আত্মস্থ হওয়ার পর তা পুরনো ভাবজটের অংশীভূত হয়ে যায়। কখনো তা আবার নতুন অভিজ্ঞতার আহরণের পথে সহায়তা করে। এমনি ক'রে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। তাঁর এই মৌলিক তত্ত্ব বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে হার্বার্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে নৈতিক চরিত্রগঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে আভ্যন্তরীণ কয়েকটি বিকাশের দিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলি হ'ল কর্মদক্ষতা, উদারতা, বিচারবোধ ও ন্যায়বোধ। যদিও নৈতিক আদর্শ হার্বার্টের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে, তবুও তিনি বলেছেন যে, এই ধারণাকে আরও প্রসারিত না করলে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মানুষের কমনীয় বৃত্তির যে উন্মেষ তার মূল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকখানি। শিক্ষার দায়িত্ব হ'ল সেই বৃত্তির উন্মেষসাধন করা।

হার্বার্ট শিক্ষাকে একটি শিল্প ব'লে মনে করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে দর্শন, তাই দর্শনকে তিনি শিক্ষার পরম পরিণতি ব'লে অভিহিত করেছেন। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি শিক্ষার তিনটি দিকের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল (১) শৃঙ্খলা রক্ষা, (২) শিক্ষণ, (৩) নৈতিক শিক্ষা। এদের মধ্যে শিক্ষণের মূল্য সবচেয়ে বেশি, কারণ শিক্ষণই চিন্তার বিবর্তন আনে ও বহুমুখী আগ্রহের সঞ্চার করে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে হার্বার্ট তাঁর পুরোধাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিবাদী ছিলেন। তিনি মানবতার ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর উপর বেশি

গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সেইজন্যই তাঁর প্রবর্তিত পাঠক্রমের মধ্যে ইতিহাস ও সাহিত্য বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাঁর মতে এই দুটি বিষয় সমগ্র পাঠক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

হার্বার্টের এই কেন্দ্রীকরণ ও সংপৃক্তীকরণের প্রয়াস পাশ্চাত্যের শিক্ষা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একদিকে সাহিত্য, ইতিহাস ও সামাজিক বিষয়বস্তু, অন্যদিকে গণিত ও বিজ্ঞান,—এই দুইএর মধ্যে এক সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানপাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হার্বার্ট কখনই উদাসীন ছিলেন না। তাছাড়া তিনি হাতের কাজ সম্পর্কেও যে উক্তি করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "নিজের হাতকে কি ভাবে ব্যবহার করা যায় প্রত্যেক লোকের তা জানা উচিত। মানুষকে জান্তব স্তর থেকে উন্নীত করবার ব্যাপারে ভাষার সঙ্গে হাতও সমান মর্যাদা দাবি করতে পারে।"

হার্বার্টের কেন্দ্রীকরণ-তত্ত্বের সঙ্গে বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত পাঠ্যবস্তুর যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর কেন্দ্রীকরণ-নীতি আজকের দিনেও তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষার পদ্ধতি। হার্বার্টের মতে, শিক্ষণ দুটি রূপ গ্রহণ করতে পারে—একটি বিশ্লেষণমূলক, অপরটি সংশ্লেষণমূলক।

সংশ্লেষণমূলক শিক্ষা আবার দুপ্রকারের হতে পারে—(ক) বর্ণনামূলক, ও (খ) শিক্ষামূলক।

বর্ণনামূলক শিক্ষণে শিক্ষক ঘটনা ও কর্মের বর্ণনার মাধ্যমে শিশুর অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেন। তার এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোজন ক'রে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হবে তা শিক্ষকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করার প্রয়োজন।

কিন্তু বিশ্লেষণমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। শিশুকে তার ভ্রমাত্মক অভিজ্ঞতা থেকে সরিয়ে এনে নতুন এক অভিজ্ঞতা দান করাই হ'ল এর উদ্দেশ্য। বিশ্লেষণের মাধ্যমে একে একে শিশু তার ভ্রম বুঝতে পারে ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে শিশু তার খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে সংহত ক'রে নিতে পারে।

হার্বার্টের মতে, বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শিশুর মনে আগ্রহ সঞ্চার করাই শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং তা করতে হ'লে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় একটি ক্রমিক ধারা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। হার্বার্ট খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, মনের সংহতি বজায় রাখতে হ'লে জ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে, আর সেই সঙ্গতি রাখা সম্ভব হয় দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে (১) কেন্দ্রীকরণ ও (২) সংযুক্তিকরণ। এই প্রক্রিয়া দুটিকে হার্বার্ট পরে বিস্তৃত করেছেন এবং শিষ্যেরা তা আরও প্রসারিত করেছেন। আয়োজন, উপস্থাপন, তুলনা ও বিমূর্তন, সামান্য-করণ ও অভিযোজন এই পাঁচটি স্তর আজ আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের মূল্যায়ন। শিক্ষার লক্ষ্য, তার প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সম্পর্কে হার্বার্ট যে আলোকপাত করেছেন তা এক যুগান্তর এনেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে নৈতিক চরিত্রকে প্রধান স্থান দিয়েছেন সত্য, কিন্তু চরিত্রকে তিনি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যজ্ঞান—সবকিছুই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ স্থান পেয়েছে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছাত্রদের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা করেছেন। এই বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলতে হলে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। তাই শিক্ষাকে তিনি শিল্পকর্ম ব'লে অভিহিত করেছেন।

হার্বার্ট শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা চিন্তাজগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের জন্যে তিনি যে সকল নীতি উপস্থাপিত করেছেন তাদের মধ্যে 'সাংস্কৃতিক স্তর-তত্ত্ব' ছাড়া অন্যান্য সব নীতিই যুক্তিসিদ্ধ।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও হার্বার্টের উদ্ভাবন বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। রাস্কের মত গ্রহণ করলে হার্বার্টের পদ্ধতির বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনা প্রকট মনে হয়ঃ—

(১) যে শিক্ষণের উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন সেরূপ শিক্ষণ ভিন্ন অন্য প্রকারের শিক্ষণ ব্যাপারে হার্বার্টের স্তরগুলির প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

(২) শিক্ষণ একটি শিল্পকার্য, কিন্তু হার্বার্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ-দানের নির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তন করার মধ্যে একটি গতানুগতিকতা এসে পড়ে।

হার্বার্টের স্তরবিভক্ত পদ্ধতি মূলত উদ্ভাবনমূলক নয়। কারণ যেখানে আরোহমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, সেখানে হার্বার্টের পদ্ধতি তত কার্যকরী নয়। তাছাড়া হার্বার্টের পদ্ধতিতে শিশু অপেক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা অনেক সক্রিয় ও গতিশীল।

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব। হার্বার্টের আগ্রহতত্ত্ব আজ শিক্ষাজগতে প্রধান কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি যে সব নীতির সন্ধান দিয়েছেন, আজও তার মূল্য আছে। কিন্তু একথা মানতে হবে যে, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বুদ্ধিই একমাত্র আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়ক নয়—এইটিই হার্বার্টীয় নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা। তবে আগ্রহ শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। বিষয় ও পদ্ধতি যে আগ্রহ-সৃষ্টির ব্যাপারে অনেকখানি কাজ করে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। হার্বার্টের এ বিষয়ে নির্দেশ আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। বর্তমান যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ রচনার দিকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আয়োজনের মূলে হার্বার্টের শিক্ষানীতির প্রভাবও কম নয়।

হার্বার্ট শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনের এক মহান্ নেতা ছিলেন। শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনেও তাঁর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে তিনি সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলন। শুধু তাই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবিকতার আদর্শকে সঞ্চারিত করবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। গণতন্ত্রের বীজ তাঁর শিক্ষাপ্রকল্পে নিহিত ছিল ঠিকই, তবে তাঁর গণতান্ত্রিক প্রেরণা খুব শক্তিপূর্ণ ছিল না এবং তিনি সামাজিক প্রগতিরও খুব সমর্থক ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে গণতান্ত্রিক শিক্ষার একজন নায়ক ব'লে গ্রহণ করা হয় না। তবে যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দান যে অসামান্য এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

জন ডিউই (Dewey)

শিক্ষাজগতে জন ডিউইর আবির্ভাব স্মরণীয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তাঁর শিক্ষাদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেবল তাই নয়, তাঁর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিবাদ প্রতিটি চিন্তাশীল মনকে নাড়া দিয়েছে। তাঁর মতে শিক্ষাই জীবন, আবার জীবনই শিক্ষা। তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন, আর এই দুই-এর মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন আবিষ্কার করেছেন। জীবনকে কেন্দ্র ক'রে দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে একটি মিলন তিনি ঘটিয়েছেন। শিক্ষার ভাবধারা যখন একটি পথে নির্দিষ্ট ছিল তখন ডিউইর মনীষা সেই জড়তা থেকে শিক্ষাকে মুক্তি দিয়েছে। কখনও প্রকৃতিবাদ, কখনও আদর্শবাদ—এক একটি বিশেষ মতবাদ শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে। ডিউই এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ধারাকে অনেকখানি প্রসারিত করেছেন।

ডিউই বলেছেন যে, শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, আর তা থাকতেও পারে না। দিগন্তরেখার মতো এই লক্ষ্য আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যাবে। ক্রমশ দূর থেকে দূরান্তরে সে আমাদের পথের নিশানা দেবে। শিক্ষায় এই যে গতিবাদ, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে উপনিষদের মন্ত্র "চরৈবেতি।" অকারণ অবারণ চলাই হ'ল প্রাণের লক্ষণ। আর চলতে চলতে মানুষ যে পাথেয় আহরণ করে, সেটাই হয় শিক্ষার উপাদান।

জন ডিউই যে শুধু একজন মহান শিক্ষাবিদ্ ছিলেন তাই নয়, তাঁর জীবনদর্শন ও দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার বহুক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যে সব দার্শনিক চিন্তা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন—

ডিউইর দর্শন

(১) এই বিশ্বের গঠনকার্য শেষ হয়ে যায়নি, আজও সে ক্রমপরিণতির পথে।

(২) অতীন্দ্রিয় কোনো জগতের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, কারণ বিশ্বের

মৌলিক বস্তু থেকে সব কিছুর উদ্ভব,—এমন কি জীবন ও মন এদের বিবর্তন থেকেই উদ্ভূত।

(৩) এ জগতের প্রতিটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ফলে পদার্থের সঙ্গে মনের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের কোনো প্রকৃত দ্বৈতভাব নেই।

(৪) বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হ'ল তার বিবর্তন বা পরিবর্তন ; চিরচঞ্চল জগতে স্থির থাকবার নিয়ম নেই।

(৫) বিশ্বের এই যে গতিশীলতা তার স্বীকৃতির উপর মানুষের স্বাধীনতা নির্ভর করে। মনের বন্ধনমুক্তি ঘটে তখনই, যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সবই দুদিনের, সবই কালস্রোতে ভেসে যায়।

(৬) এই বোধ থেকেই সত্যানুভূতি জাগে আর পরীক্ষামূলকভাবে জীবনকে নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখলে সেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৭) চিন্তা থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়, আর জীবনের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যে সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাতেই সত্যিকারের অভিজ্ঞতা জন্মায় আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

(৮) কোনো বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বলতে বোঝায় অন্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন। জ্ঞান বস্তুকে মানুষের আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে, আর এই জ্ঞানের সত্যতা নির্ণীত হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। তাই মানুষের জ্ঞানের কোনো সীমা নেই। অন্তহীন জ্ঞানের পরিধি ; জীবন যদিও চঞ্চল ও সীমায়িত।

নীতিবিদ্যা সম্পর্কেও ডিউইর ধারণা বৈচিত্র্যময়। যেমন, তিনি বলেছেন, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ নিজেই সত্য, শিব ও সুন্দরের মতো পরম কাম্যবস্তু সৃষ্টি করছে। এই সব কাম্যবস্তুর কোনো চিরন্তন মূল্য নেই ; তারা শুধু মুহূর্তের পরিণতি। শিক্ষা, সৌন্দর্য সবকিছুই মানুষকে অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দিতে সহায়তা করে ; তাই লক্ষ্য ও উপায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ডিউইর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা বা ভাবনা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, সামাজিক জীবনের মূল কথা হ'ল অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান,

আর সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, যেখানে এই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান অব্যাহত। গণতন্ত্র সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ অভিজ্ঞতার এই বাধাবন্ধহীন পূর্ণাঙ্গ আদান-প্রদান একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে যে যোগসূত্র তা এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে; কারণ শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও সামাজিক জীবন-প্রক্রিয়া মূলত একই। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতে শিক্ষার চরম বিকাশ ঘটে ; কেননা এখানেই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান সবচেয়ে বাধাহীন। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র ও প্রকৃত শিক্ষা মূলত অচ্ছেদ্য।

মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ডিউইর বিশিষ্ট চিন্তাধারা

(১) মানুষ তার জীবনযাত্রা শুরু করে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে। আর সেই প্রবৃত্তিগুলি মূলত প্রচেষ্টামূলক। এদের প্রধান কাজ হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করা। তাই মনের উৎস খুঁজতে হবে এই সব সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে। মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজ জীবনের ফল-স্বরূপ, আর আদিম প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। মন ও চেতনার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, কিন্তু মনের ব্যাপ্তি চেতনার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাই প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্যে উদ্বর্তিত করার প্রয়োজন। এই সব ধারণা ছাড়াও ডিউই মানবজীবনের অনুভূতি সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, আমাদের বেশির ভাগ অভিজ্ঞতাই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দ্বারা খণ্ডিত। তাই যে সব অভিজ্ঞতা শিল্পকর্মপ্রসূত সেখানে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কেবল তাই নয়, মানুষের শিল্প ও সাধনা চরম সার্থকতা লাভ করে অনুভূতির উৎকর্ষে ; আর এই অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

তাই দেখা যায়, শিক্ষার প্রস্তুতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও পরিচালনার দিক থেকে ডিউই যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, যে তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন, তার মূল্য অনেকখানি। কি সামাজিক দিক থেকে, কি ব্যক্তির দিক থেকে, তিনি শিক্ষাকে উদ্দিষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃতির ধারা নবজাতকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব হ'ল শিক্ষকের এবং সেই দায়িত্ব পালিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। সমাজ জীবন

যখন এত জটিলরূপ ধারণ করেনি, তখন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজ মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেকখানি বেড়ে গেছে, আর অন্তরে পরিবর্তন আনবার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যালয়কেই মেনে নিতে হয়েছে। শিক্ষাই হ'ল সমাজের প্রগতি-সংসাধনের প্রধান হাতিয়ার। সমাজের ভুলভ্রান্তি দূর ক'রে নতুন অবস্থার উপযোগী আচরণগত পরিবর্তন আনা শিক্ষার কাজ। ডিউই এবিষয়ে তাই বারবার সকলকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন।

ব্যক্তির দিক থেকেও তাঁর শিক্ষা-চিন্তা খুবই সজাগ। তিনি শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র ক'রে, তার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে, শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। অভিজ্ঞতা ও আচরণের পুনর্গঠনের মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি। তাই শিক্ষাকে ডিউই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ব'লে মনে করেছেন। তাঁর মতে এটি একটি নিত্যপ্রবহমান প্রক্রিয়া। শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য তিনি স্থির করেননি, তবে জীবনের কয়েকটি মূল্যবান দিক তিনি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান শিক্ষায় ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শিশুর মানসিক প্রকৃতির উপর ডিউই যে জোর দিয়েছেন, তা খুবই বিজ্ঞানসম্মত।

শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন ঠিকই, তবে সঙ্গে সঙ্গে সমাজগত মনস্তত্ত্বের উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের এক নিগূঢ় সম্পর্ক পরিস্ফুট ক'রে ব্যক্তিসত্তার বিকাশে সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবকে তিনি বার বার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। গণতন্ত্রের ভাবধারা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মানবতাবাদ বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাস্তব দৃষ্টি থেকেও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা বঞ্চিত নয়। আবার বৈজ্ঞানিক ভাব-ধারাও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাই ডিউইর প্রয়োগবাদ নিছক তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগের উপর বেশি জোর দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ডিউই ছিলেন অগ্রদূত।

রুশো থেকে শুরু করে ডিউই পর্যন্ত শিক্ষার ভাবধারার বিবর্তন লক্ষ্য করবার মতো। এই বিবর্তনের পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা হ'ল জীবন ও শিক্ষার মধ্যে এক অখণ্ড যোগাযোগের উপর ভিত্তি ক'রে। যতদিন এই সত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত না হবে ততদিন এ পরিবর্তন দেখা দেবেই। জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি হয় শিক্ষাকে অবলম্বন ক'রে। মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে তার পূর্ণ প্রকাশ ও পরিণতি ঘটাতে হ'লে চাই শিক্ষার প্রগতি। ডিউইর শিক্ষাদর্শনে এই প্রগতিবাদ পরিণতি লাভ করেছে।

প্রথমে, রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় মানবশিশুর মধ্যে যে প্রাণশক্তি ও পবিত্রতা অন্তর্নিহিত, তার উদ্‌ঘাটন হয়েছে। তারপর একে একে মানব-মনের গতি-প্রকৃতিকে ঘিরে শিক্ষার ভাবাদর্শ চিত্রিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনায়।

পেস্তালৎসি, হার্বার্ট, ফ্রয়েবল, মণ্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে যে শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেছেন তার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে ডিউইর শিক্ষাদর্শনে। শিক্ষায় ক্রমবিবর্তনের এই ইতিহাস তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপজীব্য।

পর্যায় ১

শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা

এক

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

শিক্ষার যে কয়েকটি উপাদান আছে তার মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই দুইটি মানবিক উপাদানের উপর শিক্ষার অগ্রগতি মূলত নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষাজগতের কর্ণধার। শিক্ষার অগ্রগতি তাঁরই উপর নির্ভর করে। প্রধান শিক্ষকই শিক্ষানিকেতনের অন্তরাত্মা। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা সবকিছুই শিক্ষার উন্নতি ও অবনতির মূলে কাজ করে। তাঁরই উপর নির্ভর করে সহকর্মী শিক্ষকদের সহযোগিতা। এক কথায় বলতে গেলে, প্রধান শিক্ষকই হলেন বিদ্যালয়ের অধিনায়ক, আর তাঁরই নেতৃত্বে সবকিছু শিক্ষার আয়োজন।

বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কখনো পরিদর্শন, কখনো সংগঠন, কখনো বা শিক্ষণ ও পরীক্ষণ। এ ছাড়া অনেক-ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে সংযোজক হিসেবে কাজ করতে হয়। এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করতে হলে প্রধান শিক্ষকের কেবল বিদ্যাবত্তা থাকলেই চলবে না, তাঁকে দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। যোগ্যতার দিক থেকেও তাঁর বহু কিছুই থাকা দরকার ; যেমন—দূরদর্শিতা, সহানুভূতি, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নিরপেক্ষতা, সংগঠন-প্রতিভা, আত্মসংযম ও কর্মকুশলতা। প্রধান শিক্ষকের প্রচুর ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি কি ভাবে করবেন এবং তা ক্ষেত্রোপযোগী হচ্ছে কি না তা বিচার-সাপেক্ষ।

প্রধান শিক্ষকের কাজ

যে কয়েকটি পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ ভাগ করা হয়েছে, একে একে তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

পরিদর্শন। প্রথমেই বলা হয়েছে পরিদর্শনের কথা। পরিদর্শন বলতে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সব কিছু দেখাশোনা করা বা তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা বোঝায়। শাসন-শৃঙ্খলা, আভ্যন্তরীণ বিদ্যালয়-পরিচালনা, অফিসের দৈনন্দিন

হিসাবপত্র দেখা, সহকর্মীদের কাজকর্ম লক্ষ্য করা, ছাত্রদের দৈনন্দিন পড়াশুনা তদারক করা, এমন কি বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করাও প্রধান শিক্ষকের কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিভাবে এই পরিদর্শনের কাজকে সার্থক করা যায় সেদিকে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ চিন্তার দরকার। এর জন্যে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সকলের সহযোগিতা নিতে হবে। একথা ঠিকই যে, আজকের দিনে পরিচালনার কাজ ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। নানাকারণে সহকারী শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটুতেই তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ও অভিমান দেখা যায়। তাই প্রধান শিক্ষক যতক্ষণ নিজের ব্যক্তিত্বের গুণে তাঁদের সকলকে আপনার ক'রে না নিতে পারছেন ততক্ষণ পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময়ে শ্রেণীপাঠনের মাঝে মাঝে প্রধান শিক্ষককে হঠাৎ শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এতে শিক্ষক অনেকক্ষেত্রেই বিব্রত হয়ে পড়েন ও বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক যদি নিজে বিনয়ী হন এবং কারও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যে কৌশলে কোনো কিছু নির্দেশ দেন তাহলে তা ফলপ্রসূ হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীপাঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতি একটি বিশেষ স্থানে লিখে নিয়ে পরে কোনো অধিবেশনে সাধারণভাবে তা আলোচনা করলে কোনো শিক্ষকই তাতে ক্ষুণ্ণ হন না, বরঞ্চ তাঁরা যে যাঁর ত্রুটিকে সংশোধন ক'রে নিতে সচেষ্ট হন। প্রধান শিক্ষকের প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর মনোভাব, রুচি ও আদর্শ অনেক সময়ে তাঁর সহকারী শিক্ষকদের কাছেও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। মোটকথা, পরিদর্শনের কাজে প্রধান শিক্ষককে বিশেষ কৌশলী হতে হবে,—উপস্থিত-বুদ্ধি ও সপ্রতিভ কার্যক্রম হবে তাঁর প্রধান পাথেয়।

সংগঠন। সংগঠন বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। যে যাঁর স্থান ও সুযোগ অনুসারে বিদ্যালয়ের সংগঠন করবেন। শ্রেণীবিন্যাস থেকে শুরু ক'রে সময়-পত্রিকার প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের প্রসার ও কার্যাবলীর প্রবর্তন সব কিছুই সংগঠনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্র-ভর্তি, শিক্ষক-নির্বাচন, বেতন-সংগ্রহ সব কিছুই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। তাই প্রত্যেক ব্যাপারেই বিদ্যালয়ের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁকে কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষণ। যদিও প্রশাসনিক কাজ প্রধান শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, তবুও শ্রেণীপাঠনের কাজে মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করতে হয়। সাধারণত উচ্চতর শ্রেণী ও নিম্নতর শ্রেণী সাধারণ শিক্ষকের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। অন্তত সেগুলোর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবার জন্যে প্রধান শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের প্রভাব যাতে ছাত্রদের উপর পড়ে সেজন্যে শিক্ষক হিসাবেও তাঁর কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত প্রধান শিক্ষকের শ্রেণীপাঠনের উদ্দেশ্য হবে আদর্শ পাঠ হিসেবে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা, যাতে তাঁর সহকারী শিক্ষকরা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন।

পরীক্ষণ। শিক্ষা ও পাঠনের প্রগতি-বিচারের জন্যে পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন এখনও অপরিহার্য ব'লে বিবেচিত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। শ্রেণীপাঠনের সাফল্য প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর না করলেও তাঁর উপর নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি। আজ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা চলেছে। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ব'লে অনেকে মনে করছেন। কিভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে মূল্যায়নের একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করা যায় সে সম্পর্কেও প্রধান শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। যে রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে তার পরিমার্জন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আর একটি বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সজাগ হতে হবে। পরীক্ষার বিভীষিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পরীক্ষার ফলাফলই সবচেয়ে বড় কথা নয়; কতটুকু জ্ঞান তারা আহরণ করেছে, কতটুকু জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করতে পারে, তা দেখাই হ'ল পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্যে পরীক্ষাকে দৈনন্দিন পাঠের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তার গুরুত্বকে হাল্কা ক'রে দিতে হবে। ছোট ছোট সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা চালু রাখলে এই বিভীষিকা অনেকখানি দূর হবে। তবে এইসব পরীক্ষার সময় ও কাল অনির্দিষ্ট রাখতে হবে। হয়তো শ্রেণীপাঠনের শেষে মাত্র পনরো মিনিটের জন্যে শিক্ষক হঠাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে

বলবেন। এইভাবে অল্প সময়ের জন্যে মাঝে মাঝে শ্রেণী-পরীক্ষা প্রবর্তন করলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নৈর্ব্যক্তিক বস্তুমুখী প্রশ্নপত্রের সাহায্যে এইসব ছোট ছোট পরীক্ষা সম্ভব হতে পারে। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়-তালিকার মধ্যে কতখানি এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায়—তা নির্ভর করে প্রধান শিক্ষকের পরিকল্পনার উপর। আজ শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার মূলে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি অনেকখানিই দায়ী। পরীক্ষাসর্বস্ব মনোভাবের ফলে সত্যিকারের জ্ঞানোন্মেষ সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি।

আগে বলা হয়েছে যে, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শক্তি। তাঁকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্পর্শে আসতে হয়—কখনো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে, কখনো সহশিক্ষকদের সঙ্গে ও কখনও পরিচালক সমিতির সঙ্গে। অভিভাবকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময়ে অন্যান্য স্থানীয় বিদ্যালয়ের ও আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। যে-কোনো বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক একটি বিশেষ যোগসূত্র। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জানবেন, প্রত্যেকের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর রাখবেন। তাঁদের গৃহ-পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের নিবিড় ক'রে জানতে হলে তাঁকে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে ও অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় তাদের আচরণ-গত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত হতে হবে। যদি কারো কোনো বিশেষ আচরণগত সমস্যা থাকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে সমাধানের প্রয়াসী হওয়াও প্রধান শিক্ষকের ঐকান্তিক কর্তব্য। শিক্ষার্থী ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে। আনন্দ-উৎসবে, বিদ্যালয়ের সাধারণ অধিবেশনে, এই সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ'ড়ে ওঠে। বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী-সংখ্যা এতই

বেড়ে চলেছে যে একজন প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর বিষয়ে খবরাখবর রাখা সম্ভবপর নয়। সেজন্য অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষকদের সহযোগিতায় তাঁকে এই কাজে ব্রতী হতে হবে। নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের নিয়ে ছোট ছোট আলোচনাচক্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যা আলোচনার সার্থকতা আছে। এ ছাড়া Cumulative Record Card-এ শিক্ষার্থীদের যে বিবরণ পাওয়া যাবে তাকেও কাজে লাগাতে হবে। ভর্তির সময় এমন তথ্য সংগ্রহ করা দরকার যা পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীর সমস্যা-নির্ধারণে সাহায্য করবে। মোটকথা, সব কিছুই প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। যদি তিনি বিশেষ উৎসাহী হন, ছাত্রবৎসল হন, তবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে তিনি হবেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। ছাত্র-বন্ধু হিসেবে সবখানে ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি যথাযোগ্য নির্দেশ দেবার অধিকারী হবেন। দেখা যায়, আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলে আজও এই সম্পর্ক কিছু কিছু বজায় আছে। কিন্তু শহরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় এ সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। এটি একটি বিরাট সামাজিক সমস্যা সন্দেহ নেই। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে তা বিবেচ্য। মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে শহরের বিদ্যালয়গুলিকে ছোট করা সম্ভব না হলেও সেখানে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা দরকার, আর বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। কিন্তু এতেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না। কারণ পরিবেশের প্রভাব খুব অনুকূল নয়। ঘরে ফিরে এসে শিক্ষার্থীরা অভি-ভাবকদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পায় অনেক সময় তা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা গঠনে অনুকূল হয় না। শিক্ষকরা কেবল বেতনভোগী কর্মচারী, আর কোনো দাবিই তাঁদের নেই, এমন অনেক মন্তব্য তাদের শুনতে হয়। আজ আমাদের সমাজে যে কাঞ্চন-কৌলীন্য দেখা দিয়েছে তা আর একটি অন্তরায়। অর্থের মানদণ্ড দিয়ে মানুষের মূল্যায়ন যে-কোনো সংস্কৃতিরই পরিপন্থী। নতুন ক'রে ভারতীয় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে সমস্ত শিক্ষা কেবল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলতে থাকবে, মানুষের অন্তরের স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হবে।

প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষক। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রধান

শিক্ষকের সঙ্গে সহশিক্ষকদের সম্পর্ক আন্তরিক নয়, কোথায় যেন একটা ভেদ রয়ে গেছে। শিক্ষকদের মধ্যে হৃদ্যতার অভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য থাকবেই। রুচি, শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক হতে পারে না। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্য-বন্ধন ও সংহতিকে আনতে হবে। সেখানেই প্রধান শিক্ষকের কৃতিত্ব। প্রধান শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সহশিক্ষকদের অন্তরে একটা বিশিষ্ট আসন ক'রে নেবেন—এটাই বড় কথা। কেবলমাত্র শক্তি ও নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করা যায় না, কারণ "Teaching is mainly a cooperative job"। সহযোগিতাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা চিন্তা করাও চলে না। শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষার্থীদেরও আদর্শ হবে, আর সেই আদর্শ তাদের চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে। আগেই বলেছি যে, এক-একটি বিদ্যালয় এক-একটি পরিবারের বৃহত্তর সংস্করণ হবে। সেখানে প্রধান শিক্ষক হবেন পরিবারের নেতা, শিক্ষার্থীরা হবে সন্তানের তুল্য। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক যত মধুর হবে, শিক্ষা-পরিবেশ তত অনুকূল হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নিয়েও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁকে সহযোগীদের সাহায্য নিতে হবে। ব্যক্তিত্বের অভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ অন্তরায় হ'লে চলবে না। আজ শিক্ষায় গণতন্ত্রের যে নতুন নীতি আমরা অনুসরণ করতে চলেছি, তাকে রূপ দিতে হলে প্রথমেই তার পত্তন করতে হবে এই শিক্ষক-সমাজের মধ্যে। পদাধিকার-বলে অন্যান্য শিক্ষকদের উপর নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। বিচার-বিবেচনা ক'রে, সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয়, যে সিদ্ধান্ত সত্যিকারের কল্যাণ আনে সেটাকেই গ্রহণ করতে হবে। সেখানে ব্যক্তির স্থান থাকবে না। দেখতে হবে, এই সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতি। যেসব বিদ্যালয় সরকারী নয় সেখানে পরিচালক সমিতির প্রভাব খুব বেশি, অথচ বিদ্যালয় পরিচালনার মূল দায়িত্ব থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর। এই পরিচালক সমিতির যাঁরা

সদস্য হন অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে শিক্ষার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার সমাধানে তাঁদের অনেক নির্দেশ গ্রহণ-যোগ্য হয় না, এবং ফলে প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ সহায়ক হয়। যে-কোনো বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে উভয় পক্ষের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক বিশেষ বাঞ্ছনীয়। তা না হলে বিদ্যালয় ঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। প্রতিটি শিক্ষায়তনে কিছু-না-কিছু স্থানীয় সমস্যা থাকবেই, আর এই সব সমস্যার সমাধান ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে সংগঠনমূলক কার্যকলাপের বিশেষ প্রয়োজন। সেখানে প্রধান শিক্ষককে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাঁকেই বিদ্যালয়ের সবকিছু সমস্যা তুলে ধরতে হবে ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে বিদ্যালয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র সমিতির সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। এইভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি ও প্রধান শিক্ষক মিলেমিশে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে গেলে বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্ভবপর। অনেক সময় দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে বহু অশিক্ষিত লোক প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে পরিচালক সমিতিতে সদস্যের আসন করে নেন। এতে কাজে বাধারই সৃষ্টি হয়। তাই মনে হয় যে, এই সব সমিতি-গঠনে প্রধান শিক্ষকের নিজস্ব মতামতই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেওয়া সঙ্গত। তাছাড়া, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; তা না হলে শিক্ষার সংগঠনমূলক কাজ ব্যাহত হতে পারে।

প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবক। কেবল বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা আবদ্ধ নয়। তাঁকে জনসাধারণ ও অভিভাবকদের সংস্পর্শেও আসতে হয়; বহু শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের স্তুতি-নিন্দা শুনতে হয়। প্রধান শিক্ষক যদি সংযত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হন, তাহ'লে বহু অনর্থের সূত্রপাত হতে পারে। তাঁকে অমায়িক হতে হবে; সহিষ্ণু অথচ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক অভিভাবক আছেন, যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত; তাঁদের সমস্যা বুঝতে হলে চাই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরহঙ্কার মন। আবার এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা গর্বিত ও

উদ্ধত ; তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে সেদিকে প্রধান শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, জনসাধারণের মধ্যেও প্রধান শিক্ষক হবেন একজন বিশেষ নেতা। তাঁর অমায়িক আচরণে সাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগবে, ভালোবাসা জাগবে। বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিরূপ ; সমাজ-কল্যাণ তারও লক্ষ্য। তাই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধান শিক্ষক। তাঁরই উদ্যোগে বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে জনকল্যাণের আয়োজন চলবে।

একই অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে যোগাযোগ ও হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এজন্য স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মিলিতভাবে কোনো ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, মেলা, উৎসব ও শিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে পারস্পরিক সম্প্রীতি গ'ড়ে উঠতে পারে।

অনেক সময়ে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, বিতর্ক-সভা, পাঠচক্র প্রভৃতি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ'লে এইসব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে নিবিড় মেলামেশা হতে পারে ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব আসতে পারে।

দুই

বিদ্যালয় ও শিক্ষা-পরিবেশ

বিদ্যালয় শব্দটি বহুদিনের পরিচিত। যেস্থানে বিদ্যার আদান-প্রদান চলে, সেই স্থানকে তীর্থের সঙ্গে তুলনা করলে বোধহয় ভুল হয় না। সেকালে কিভাবে এই সব বাণীপীঠের উদ্ভব হয়েছিল তা এখনও কিছুটা অস্পষ্ট। তবে একথা বলা যায় যে, বিদ্যালয় একদিনে গ'ড়ে ওঠেনি ; এর পেছনে বহুদিনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। মানুষ যখন ঘর বাঁধতে শিখল, তখন সে বুঝল যে, প্রকৃতিকে জয় করতে হবে ; বুঝল, এমন পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে যা তাকে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করবে। কি সে পাথেয়, এই হ'ল প্রশ্ন। অনুভব করল সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে। ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার নবজন্ম হ'ল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলতে থাকল। দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে বাণীর মন্দির গ'ড়ে উঠল। প্রথমে অবশ্য কয়েকটি পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এক-একটি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল, গুরুগৃহের পত্তন হ'ল। আজ কিন্তু গুরুগৃহের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে, যুগের দাবি মেটাবার জন্য বিদ্যালয়-গৃহ ও বিদ্যা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা। তার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশকে পরিণতি দেওয়া, উদ্দেশ্য—জীবনের প্রস্তুতি আনা। ফলে, আজ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-পরিবেশে বৈচিত্র্য এসে পড়েছে। মনের চাহিদা বেড়ে গেছে। প্রাচীন ভারতে পর্ণকুটিরের অন্তরালে যে জ্ঞানের শিখা জ্বলে উঠত আজ আধুনিক প্রাসাদোপম বিদ্যালয়-গৃহগুলিতে তা সম্ভব হচ্ছে না কেন কে জানে !

বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ। প্রয়োজনের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনও অনেক বেড়ে গেছে সন্দেহ নেই। এতে নানা ধরনের ঘরবাড়ি ও তার গঠন-কৌশলের প্রশ্ন উঠেছে। কোন বিদ্যালয় কত বড় হবে, কেমন তার গঠন-কৌশল হবে—সঙ্গে সঙ্গে তাও ভাবতে হবে। শুধু শ্রেণীকক্ষের কথা ভাবলে চলবে না, সামগ্রিক বিদ্যালয়-পরিবেশের কথাও ভাবতে হবে।

কতগুলি ঘর থাকবে, কতখানি জমি থাকবে, কি তাদের আয়তন হবে, ক'তলার বাড়ি হবে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। তাই বিদ্যালয়ের নির্মাণ-কাজ শুরু করার আগেই এমন একটি পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত না হয়। বিদ্যালয় যেন কারাগার না হয়ে ওঠে। সেখানে রাখতে হবে আনন্দময় পরিবেশ, যা প্রতিটি মনে দোলা দিতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তার ব্যবস্থা করা চাই। আজও শান্তিনিকেতনে ছায়াশীতল স্নিগ্ধপরিবেশে বৈচিত্র্যময় শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ের (Open-air School) সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। তাই বিদ্যালয়ের জন্য গৃহের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।

বিদ্যালয়-গৃহের স্থান নির্বাচন। স্থান নির্বাচন কথাটি তখনি প্রযোজ্য যখন রুচিমতো স্থানের অভাব থাকে না। আজ শহরে যেসব বিদ্যালয়ের পত্তন হচ্ছে সেখানে এই প্রশ্ন না তোলাই ভালো। কারণ, দেখা যায়, হয়তো বা বাজারের ধারে, নয়তো জনমুখর কারখানার পাশে, এমন বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে পরিবেশ খুবই প্রতিকূল। তবে সাধ্যমতো স্থানের অভাবকে পরিবেশ-সৃষ্টির মাধ্যমে অনুকূল ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য যেখানে রুচিমতো স্থান পাওয়া যায় সেখানে কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়, যেমন—

(ক) স্থানটি যেন বেশ খানিকটা খোলামেলা, আলোবাতাসযুক্ত ও উচ্চ-ভূমির উপর হয়।

(খ) জমিটি কিছু পরিমাণে বালু বা কঙ্করময় হ'লে ভালো হয়, তাহ'লে বৃষ্টির জল জমির উপর দাঁড়াতে পারে না।

(গ) স্থানটি শহরের জনবহুল অঞ্চলে বা বস্তির কাছে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঘ) রেললাইন, ষ্টেশন বা কারখানার কাছে কখনই কোনো বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। মোটকথা, বিদ্যালয়-পরিবেশটি শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র, কোলাহলবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর অবস্থিতি হবে এমন

স্থানে যেখানে জনমানবের কলরব গিয়ে পৌঁছোয় না ; অথচ লোকালয় থেকে খুব বেশি দূরে না হয়। স্থানটি প্রচুর পরিসরযুক্ত হওয়া উচিত, যাতে বিদ্যালয়গৃহের চারপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ ও শ্যামলিমা থাকতে পারে।

বিদ্যালয়-গৃহ ও তার ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো। আগেই বলেছি যে বিদ্যালয়-গৃহের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস পায়, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, অথচ বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বাড়ির নকশা কি ধরনের হ'লে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্য সাধারণত E H L প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি টাইপ বা ছাঁচ (pattern) অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের টাইপ বা ধরনের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে আর তা হ'ল বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষের সামনে এক বা একাধিক মুক্তপ্রাঙ্গণের ব্যবস্থা রাখা। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিদ্যালয়ের কোনো বাঁধাধরা ছক নেই। পরিসর ও প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি টাইপের উপযোগিতা আছে। সাধারণত, বিদ্যালয়-গৃহ একতলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চলাফেরার পক্ষে ও কাজের সুবিধার পক্ষে একতলা বাড়ি বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ি যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ততই চলাফেরার জন্য সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া, প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শনের কাজেও অসুবিধা হয়। এতে বিদ্যালয়ের সাধারণ স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে। বিরাট বিরাট শহরে, যেখানে স্থানের অভাব, সেখানে নিরুপায় হয়েই বাড়িটি উঁচু ক'রে তৈরি করতে হয়। এতে চলাফেরার অসুবিধা ছাড়াও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। ওঠানামার সিঁড়ি, রেলিং ইত্যাদি মজবুত ক'রে তৈরি না করলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ওঠানামার জন্য অন্তত দুটো সিঁড়ির একান্ত প্রয়োজন। আর লক্ষ্য রাখতে হবে এই সিঁড়িগুলো যেন সোজাসুজি রাস্তায় গিয়ে না পড়ে। তাছাড়া, ধাপগুলোর উচ্চতা খুব বেশি হ'লে ছোট ছেলে-মেয়েদের প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। মোটকথা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও উপযোগিতা—সবদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়-গৃহের প্রতিটি অবয়ব তৈরি করতে হবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘর বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে থাকা উচিত। যেমন—কমন রুম, ষ্টাফ রুম, অফিস ঘর, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, এ্যাসেম্বলি হাউস, টিফিন রুম, ইত্যাদি। এছাড়া, ভিজিটারস্ রুম, ষ্টোর রুম, ও ল্যাভেটারিরও বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমেই আসে শ্রেণীকক্ষের কথা। শ্রেণীকক্ষের কথা বলতে গেলে তার আয়তনের কথা এসে পড়ে। কারণ, আয়তন ও পরিসর অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আসন নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোনো শ্রেণীতে চল্লিশ জন শিক্ষার্থী থাকে তবে শ্রেণীর মেঝের মাপ অন্তত চারশ' বর্গফুট হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব বর্গাকৃতি ঘরই ভালো। যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা যাতে থাকে, সেজন্য ঘরগুলি অন্তত ষোলো-সতেরো ফুট উঁচু হ'লে ভালো হয়। আমাদের দেশে মাথাপিছু দশ বর্গফুট আয়তনের কথা মুদালিয়ার কমিশন স্থপারিশ করেছেন। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় এই আয়তন আরও অনেক বেশি।

যাতে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে কিশোররা ছোটাছুটি করতে পারে, চলে-ফিরে বেড়াতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শ্রেণীর আয়তন নির্দিষ্ট করতে হবে। আলো-বাতাসের জন্য ও স্থবিধামতো চলাফেরার জন্যে ঘরে প্রচুর পরিমাণে জানলা-দরজা রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, সামনের দিক থেকে আলো এসে ছাত্রদের চোখ যেন ঝলসে না দেয়। দেওয়ালের রঙ হালকা সবুজ বা হলদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরের কোণগুলি যাতে পরিষ্কার থাকে সেজন্য কোণগুলি গোলাকার ক'রে দিতে হয় এবং দেওয়ালের নিচের অংশ তেল রঙ দিয়ে রঙ করলে ভালো হয়। মোটকথা, শ্রেণীকক্ষের পরিচ্ছন্নতা, পরিসর ও পারিপাট্যের উপর শিক্ষা-পরিবেশ অনেকখানি নির্ভর করে। স্থন্দর ও স্নিগ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। যাতে স্বচ্ছন্দ আরামে প্রতিটি শিক্ষার্থী শ্রেণীতে ব'সে পড়তে পারে ও লিখতে পারে ও প্রয়োজনমতো চলাফেরা করতে পারে সে রকম ব্যবস্থা দরকার।

এরপরে আসে কত ছাত্র ও ছাত্রী একই শ্রেণীতে থাকবে এই প্রশ্ন। এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সংঘাত চিরদিনের। শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা যতই কম হবে ততই পাঠন ও শিক্ষণ কার্যকরী হবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু

তবুও দেখি এক এক শ্রেণীতে অনির্দিষ্ট শিক্ষার্থীসংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে। এরপর দেখা যায়, সেই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ ও বুদ্ধিগত মিল নেই। যেখানে এত অমিল সেখানে কোনো একটি বিশেষ শিক্ষণ-পদ্ধতি কার্যকরী হতে পারে না। আজ ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এটি একটি বিশেষ সমস্যা। শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও এ সমস্যার পূর্ণ সমাধান আজও নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

আসবাবপত্র

বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র বলতে বোঝায় সবকিছু সরঞ্জাম, যা শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছন্দ বিহারকে ও শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। তার বসবার জায়গা থেকে শুরু ক'রে লেখার ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাক-বোর্ড, বইয়ের ছোট ছোট আলমারি, নেচার-টেবিল সবই বোঝায়। এমন কি, কোনো ছবি, মডেল, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি শিক্ষার উপকরণও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যখন আসবাবপত্রের উপযোগিতার প্রশ্ন ওঠে তখন কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হয়ঃ

প্রয়োজনীয়তা। (১) যাদের প্রয়োজনে আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে আসবাব তৈরি করতে হবে।

(২) যেসব শিক্ষার্থী এই সব আসবাবপত্র ব্যবহার করে তারা স্বভাবতই চঞ্চল ; সেজন্য আসবাবপত্রের গঠনও খুব মজবুত হওয়া উচিত।

(৩) নানাভাবে এইসব আসবাবপত্রের ব্যবহার হতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে যাতে এগুলো হাল্কা ধরনের অথচ টেকসই হয় সেই-ভাবে তৈরি করা উচিত।

আকৃতি। কেবলমাত্র সুগঠিত হলেই চলবে না, আকৃতির দিক থেকেও আসবাবপত্র সুন্দর করতে হবে, যাতে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হয়। আজকাল দেখা যায় যে, অনেক স্কুলেই খুব হাল্কা কাঠের তৈরি সুন্দর সুন্দর ডেস্ক ও চেয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব ডেস্ক সাধারণত তিন শ্রেণীরঃ (ক) একজনের উপযোগী একক ডেস্ক, (খ) দুই জনের উপযোগী ডেস্ক, ও (গ) পাঁচ জনের উপযোগী দীর্ঘ ডেস্ক।

বলা বাহুল্য, একক ডেস্ক সুবিধার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো, কারণ তাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী স্বতন্ত্রভাবে বসতে পারে। এছাড়া, এই ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে ইচ্ছামতো যেতে পারেন। ডেস্কের উপরিভাগের ঢালু অংশটি ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো হয়। সাধারণত ডেস্কের তলায় বই রাখবার জায়গা ও উপরে কালির দোয়াত রাখবার ব্যবস্থা থাকে। অবশ্য আজকাল ফাউন্টেন পেনের বহুল প্রচলন হওয়ায় দোয়াতের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এই ডেস্ক নানা ধরনের হতে পারে ; তবে কোনো একটি বিশেষ ধরন সব কাজের উপযোগী নয়। ডেস্ক ও বেঞ্চির উচ্চতা শিক্ষার্থীর উচ্চতা অনুযায়ী নির্ণীত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে এখনও ডেস্কের বদলে হাইবেঞ্চ চালু আছে আর তার কারণও মূলত অর্থনৈতিক।

শ্রেণীকক্ষের আসবাবের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য আসবাব হ'ল ব্ল্যাক-বোর্ড। কারণ ব্ল্যাক-বোর্ড শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই অনেকেই ব্ল্যাক-বোর্ডকে শ্রেণীকক্ষের প্রতিফলক ব'লে থাকেন। পঠনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোর্ডের কাজ যখন চলতে থাকে তখন শিক্ষকের যা কিছু বক্তব্য তা বোর্ডেই পরিস্ফুট হয়। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগাবার পক্ষে এটি একটি বিশেষ উপাদান। ব্ল্যাক-বোর্ডের ছোট্ট ফলকটির উপর সমস্ত শ্রেণীকক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লে শিক্ষকের বক্তব্য ও শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ব্ল্যাক-বোর্ড শিক্ষণের ও পাঠনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার শুরু হয় ব্ল্যাক-বোর্ডে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাক-বোর্ডে কিছু লিখতে দিলে তাদের মনে বেশ উদ্দীপনা জাগে। সকলেই চায় ব্ল্যাক-বোর্ডে লেখবার সুযোগ। এই সুযোগলাভের ফলে, শ্রেণীকক্ষ মুখর ও সজীব হয়ে ওঠে।

এই ব্ল্যাক-বোর্ড নানা ধরনের হতে পারে। যেমন, (ক) দেওয়ালের সঙ্গে স্থায়ীভাবে লাগানো ; (খ) তেকাঠার উপর হেলান দেওয়া ; (গ) ফ্রেমের মধ্যে ঘুরন্ত অবস্থায় বসানো ; (ঘ) দেওয়ালের গায়ে ঠেলে উপরে-নিচে করবার ব্যবস্থা-সম্বলিত। ব্যয়ের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধে হ'ল প্রথমটি। কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে তা খুবই অসুবিধাজনক।

তেমনি চতুর্থটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু খুবই সুবিধাজনক। তাই মধ্যপন্থা হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের ব্যবস্থাই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে মাত্র একখানি বোর্ডের ব্যবস্থা সেখানে অনেক সময়ে শিক্ষককে অপেক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ সকলের লেখা না হয় ততক্ষণ কাজের গতি কম থাকে। যে ব্যবস্থায় দুটি বোর্ড ওঠা-নামা করতে পারে, অর্থাৎ একটি বোর্ডে লেখা শেষ না হয়ে গেলেও, সেটিকে উপরে উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষক আর একটি বোর্ড ব্যবহার করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা যে সুবিধাজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বোর্ডের দুটি অংশ দুই খণ্ডে বিভক্ত। একটি খণ্ড নিচে থাকে; সেটি লেখা হয়ে গেলে পরে ঠেলে দিলে তা উপরে উঠে যায়। ফলে বোর্ডের দুটো অংশেরই লেখা একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর চোখের সামনে থাকে।

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে এইসব আধুনিক সরঞ্জাম রাখা সবসময়ে সম্ভবপর হয় না। সেজন্য সীমাবদ্ধ অবস্থায় যতদূর করা সম্ভব তা করতে হবে। যেমন, শিক্ষকরা রোলার বোর্ড তৈরি ক'রে প্রয়োজনমতো গোল ক'রে জড়িয়ে রেখে শ্রেণী-পাঠনের সময় তা ব্যবহার করতে পারেন। অবসর-মতো কোনো কিছু লিখে বা এঁকে শ্রেণীতে দেখাতে হলে এই বোর্ডই সবচেয়ে উপযোগী। সাধারণত, কাপড়ের উপর আঠালো প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর কালো রঙ ক'রে এই বোর্ড তৈরি করা হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে এগুলোর রঙ পাল্টানো দরকার হয়। বেশির ভাগ স্কুলেই দেখা যায় যে, লেখার পর লেখার আস্তরণ প'ড়ে বোর্ডগুলি চিত্র-বিচিত্র হয়ে আছে। এর কারণ বহুদিন সেগুলোকে ভালো ক'রে পরিষ্কার করা হয় না। ফলে, শিক্ষক যখন সেই বোর্ডগুলিকে ব্যবহার করেন তখন তাঁর লেখা কখনো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না। তাই মাঝে মাঝে নিয়মিত বোর্ডগুলিকে পরিষ্কার না করলে বোর্ডের ব্যবহার সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া আর একটি সমস্যা আছে। বোর্ডের উপর অনেক সময় এমনভাবে আলো এসে পড়ে যাতে পেছনের শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখা দেখতে পায় না। ব্ল্যাক-বোর্ডটিকে শ্রেণীর মধ্যে ঠিক জায়গায় রাখা হয় না বলেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়। বোর্ডের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হলে ঝাড়নের ব্যবহার অপরিহার্য। খসখসে মোটা অল্প ভেজা কাপড়ের ঝাড়ন সবচেয়ে ভালো, কারণ তা না হলে খড়ির গুঁড়ো

সমস্ত শ্রেণীকক্ষে উড়তে থাকে। তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বোর্ডের স্থান-নির্বাচনের একটি মোটামুটি নিয়ম আছে। বোর্ডটিকে শিক্ষকের বাঁ দিকে, সাধারণত শ্রেণীর একটি কোণে, রাখতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে দেখতে পায়। বোর্ডটি রাখবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয় আলো এসে শিক্ষার্থীর পড়বার অসুবিধা না ঘটায়।

শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ

শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য আজ এসেছে তার সঙ্গে ধাপ মিলিয়ে চলতে গেলে বহুবিধ উপকরণের দরকার হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতা, আনন্দ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়তার (Audio-visual Education) প্রয়োগ করতেই হবে ; কারণ, ইন্দ্রিয়গুলোই শিক্ষার সিংহদ্বার। তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে কিশোর-মনে যত দোলা দেওয়া যায় ততই তা কার্যকরী হয়ে ওঠে। আনন্দের সামগ্রী যতখানি শ্রেণীপাঠনের মধ্যে আনা সম্ভব ততই তা উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

শিক্ষায় দৃশ্য-সহায়তা (Visual Aids)। প্রথমেই ধরা যাক, দর্শনেন্দ্রিয়ের কথা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Visual Aids। কেবলমাত্র ব'লে গেলে যতখানি কাজ হয় তার চেয়ে বেশি কাজ হয় শিক্ষার্থীর সামনে যদি কোনো চার্ট, নকশা, ছবি, ম্যাপ বা মডেলকে তুলে ধরা যায়। অবশ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ কাজ করতে হবে। অনেক সময় চাক্ষুষ সহায়তার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে কিশোর-মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ও তাতে পাঠনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এছাড়া বিষয় অনুযায়ী এই সব উপকরণের প্রয়োগ না করলে বিশেষ ফল হয় না। তবে একথা ঠিক যে, আমাদের দেশে খুব কম ক্ষেত্রেই শিক্ষার এইসব উপকরণ মেলে। যদি কোথাও বা কিছু ম্যাপ, গ্লোব বা চার্ট দেখা যায়, সেগুলির জীর্ণ অবস্থা কিশোর-মনে উৎসাহ জাগায় না। একমাত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর কারণ—এ কথা বললে ভুল হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য, শিক্ষকের আলস্য ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহের অভাবে শিক্ষার উপকরণ ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয় না।

শিক্ষায় শ্রাব্য-সহায়তা (Audio Education)। এদেশে এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা নেই বললেই চলে। রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যবহার খুব কমসংখ্যক বিদ্যালয়ে আমরা দেখতে পাই। এমন কি সাধারণ স্লাইড (slide) বা প্রজেকটার শহরের মুষ্টিমেয় সরকারী প্রতিষ্ঠানেই বা কটা থাকতে পারে! মনে হয়, শ্রেণীপাঠনের উন্নতি ক'রতে হ'লে কেবল বক্তৃতা দিলে চলবে না। কেবল প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর মনের আগ্রহ বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিষয়কে বস্তু-ধর্মী ও সরস ক'রে তুলতে হ'লে এই সব উপকরণের প্রয়োজনকে স্বীকার করতেই হবে। তবে আমাদের দেশের অবস্থা চিন্তা করলে মনে হয় যে ব্যয়বহুল আয়োজন আমরা না করতে পারলেও এমন অনেক আয়োজন করতে পারি যা সাধাসিধে অথচ কার্যকরী। যেমন চার্ট, ছোটখাট মডেল বা কোনো পেপার কাটিং-এর ব্যবহার অনায়াসেই শ্রেণীতে করা যায়। শিক্ষক যদি উৎসাহী হন, তিনি ছাত্রদের সাহায্যে এমনি অনেক উপকরণই তৈরি করতে পারেন। যেমন, মাটির কলসির উপর রঙ দিয়ে গ্লোব তৈরি করা, সামান্য টুকিটাকি জিনিস দিয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য কিছু সহায়ক (Aid) তৈরি করা। পুরোনো মুদ্রা, টিকিট বা প্রস্তরফলকের টুকরো সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস শেখানোর কাজে লাগানো যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সংগ্রহশীল মন যদি থাকে তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তা জাগিয়ে দেওয়া যায়। তখন তারা পরম আনন্দে পথের ধারে যেখানে যা পায় তা সংগ্রহ করবে ও শ্রেণীতে নিয়ে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চিন্তা করবে কোনটাকে কি কাজে লাগানো যায়। এইভাবে, পরিবেশের মধ্যে, প্রকৃতির রাজ্যে, শিক্ষার যে উপাদান ছড়ানো আছে শিক্ষার্থী তা আহরণ করতে শিখবে। সেখানে শিক্ষকের কাজ হবে সেই আহরণীবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়া। ঠিকভাবে এই বৃত্তি অঙ্কুরিত হলে দেখা যাবে যে শ্রেণীকক্ষের রূপান্তর ঘটছে। প্রতি-দিনই কিছু-না-কিছু উপকরণ-সম্ভারে শ্রেণী-পরিবেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। এইভাবে সমস্ত বিদ্যালয়-পরিবেশ সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠতে পারে। শুধু শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাণীনিকেতন তাদেরি লীলাঙ্গন। তারাই সেখানে প্রাণ। এই মমত্ববোধ যদি তাদের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া যায়

তাহলে আজকের উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের রুচির পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। কখনই তারা প্রাণ ধ'রে তাদের নিজেদের বিদ্যালয়ের জানলা-দরজা ভাঙতে পারবে না। তাই আজ সব কিছু নির্ভর করছে শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠার উপর। শুধু শিক্ষার্থীদের দোষ দিলে চলবে না। বিদ্যালয়-জীবন যদি কারাবাসের নামান্তর হয় তবে শিক্ষার্থীদের মন বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। তাই এই বিদ্যালয়-জীবনকে আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে। আর প্রাণের স্পর্শ হবে সেখানে পরম পাথেয়।

পাঠাগার

যে-কোনো শিক্ষানিকেতনের পক্ষে পাঠাগারের বিশেষ একটি ভূমিকা আছে। বিদ্যালয়েরই একটি অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য অংশ এই পাঠাগার। ফেলে-আসা দিনের কত অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এক একটি গ্রন্থে। আর পাঠাগারের মধ্যে এইসব গ্রন্থের যত সমাবেশ হয়, শিক্ষাপরিবেশ ততই সমৃদ্ধ হয়। "নীরব সমুদ্রের মহাশব্দের সহিত এই পাঠাগারের তুলনা হইতে পারে। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলো কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।"—পাঠাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। জীবনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ যা কিছু অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে সে রূপ দেয় মসীরেখায়, ভাষায়, আর সেই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে, ভাবকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে সংস্কৃতির তাজমহল—এইসব পাঠাগার। ছোট ছোট পাঠাগার যে-কোনো বিদ্যালয়ের পক্ষেই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। কিশোর-মনের চাহিদা মেটাবার পক্ষে তাদের রুচি অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করতে পাঠাগারের বিশেষ সার্থকতা আছে। পাঠাগার-পরিবেশ হবে স্নিগ্ধ, যেন সাধনার ক্ষেত্র। সমাহিত ভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের সেখানে জ্ঞানের তপস্যা চলতে থাকবে।

গ্রন্থগুলির সার্থক বিন্যাস না হ'লে গ্রন্থের স্তূপ পাঠাগারের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে পারে না। বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ হওয়া উচিত ও সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশিকাপত্র পাঠাগারের সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য রাখা উচিত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে গ্রন্থসমাবেশ হ'লে তা পাঠকদের

রুচি, উৎসাহ এবং জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে পারে। কোনো গৃহপরিবেশেই তা সম্ভব হতে পারে না। তাই বিদ্যালয়-পাঠাগারকে সে দায়িত্ব নিতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসু মন পরিতৃপ্ত হতে পারে। পাঠ্যগ্রন্থের সীমিত-জ্ঞান সকলের মনে তৃপ্তি সঞ্চার করতে পারে না। তার গণ্ডি পেরিয়ে কল্পনাপ্রবণ মন ছুটে বেড়ায়।

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক একটি সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল তাই নয়, প্রত্যেকটি শ্রেণীতে ছোটখাট গ্রন্থ-সমাবেশেরও প্রয়োজন আছে। যে যার রুচি-অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন করবে বা তা থেকে তথ্য আহরণ করবে—এই হচ্ছে শ্রেণী-পাঠাগারের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই সব শ্রেণী-পাঠাগারে কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক বা সহায়িকা রাখলেও ভালো হয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে, বহু মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থী বই কিনতে পারে না, পড়ার কোনো সুযোগ পায় না। অবসর সময়ে এই সব শ্রেণী-পাঠাগার থেকে যাতে তারা প্রয়োজনমতো সাহায্য পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে যেটুকু পড়ানো হবে তার ব্যাপ্তি ঘটবে শ্রেণী-পাঠাগারে।

শ্রেণী-পাঠাগার ছাড়াও আজ অনেক বিদ্যালয়ে বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠাগার খোলার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এক একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে সেই প্রসঙ্গে সংগৃহীত গ্রন্থ নিয়ে বিষয়-পাঠাগার গ'ড়ে উঠবে। বিষয়-শিক্ষক সেই সব পাঠাগারের ভার নেবেন। এই পাঠাগারের শিক্ষক নিজেও যেমন তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবেন, তেমনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রসারেও তিনি সাহায্য করতে পারবেন। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানলাভের দ্বারা ক্রমোন্নতির ধারার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে হবে। এইজন্যে এইসব পাঠাগারের বিশেষ মূল্য আছে।

পাঠাগারিক। পাঠাগার-পরিচালনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই পাঠাগারিকের কথা ওঠে। খুব কম বিদ্যালয়েই স্বতন্ত্র পাঠাগারিকের ব্যবস্থা আছে। সেখানে কোনো শিক্ষক এই অতিরিক্ত কাজের ভার নেন। তার ফলে কাজের অবস্থা কি হয় তা সহজেই অনুমেয়। যিনি পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত হবেন তাঁকে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি উদ্যোগী হ'লে পাঠাগার-পরিবেশটি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের

ছবি, সময়-পত্রিকা ও পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে আসবাবপত্র পাঠাগার-পরিবেশকে লোভনীয় ক'রে তোলে ও পাঠের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠাগারিককে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর পাঠোপযোগী হালফিলের বই সংগ্রহ করতে হবে। আধুনিক প্রকাশনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পাঠাগারিকের। তাঁর প্রকৃতি হবে অমায়িক ও দরদী। সব শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবার জন্যে সর্বদাই তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন শিক্ষার্থী কি বই চায়, কি তার প্রয়োজন সেইসব বিষয়ে পাঠাগারিককে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই তিনি তাঁর কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাঠাগারিকের নিজেকে আগ্রহশীল পাঠক হতে হবে, তবেই তিনি সকলকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে পাঠাগারে নতুন গ্রন্থের যোজনা হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় অনেক বিদ্যালয়ে দেখা যায়, কেবল শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ীই বই কেনা হয়।

আজকের দিনে পাঠাগারে খোলা আলমারির প্রথা চালু করবার জন্যে একটি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীরাই তাদের ইচ্ছামতো বই নাড়াচাড়া করতে পারবে ও নির্বাচন করতে পারবে। এতে অবশ্য প্রথম প্রথম কিছু বই খোয়া যাবে ঠিকই, তবে এতে সততার অভ্যাস ক্রমশ গ'ড়ে উঠবে ও একে একে তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।

শিক্ষার্থীদের উপর এইসব পাঠাগার-পরিচালনার ভার দিলে ভবিষ্যতে অনেক সুফল হতে পারে। অবশ্য পাঠাগার-পরিচালনার জন্যে বিদ্যালয়ে একটি সমিতি থাকা ভালো, আর সেই সমিতিতে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষককে রাখতে হবে। নতুন বই কেনবার সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকাল বেশির ভাগ শিক্ষার্থী রোমাঞ্চ, উপন্যাস, গল্প পড়তে চায়। বিশেষ ক'রে যারা কিশোর-কিশোরী তাদের মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়বার দিকে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেকে হয়তো একে কুরুচিপূর্ণ অভ্যাস ব'লে ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, বয়সের একটা ধর্ম আছে। তাকে জোর ক'রে রোধ করা চলে না। তাই এসম্বন্ধে মুদালিয়ার কমিশন সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, কিশোরদের জোর ক'রে নীতিকথা পড়িয়ে

কোনো লাভ নেই। কারণ জোর ক'রে কারও রুচি পাল্টানো যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে রুচির উৎকর্ষ ঘটে।

শিক্ষকের নির্দেশে ও পরিচালনায় অতিরিক্ত পাঠও চলতে পারে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে ব'সে এইসব অতিরিক্ত পাঠে যে যার ইচ্ছামতো ব্রতী হবে এবং প্রয়োজন হ'লে শিক্ষকের নির্দেশ গ্রহণ করবে। এগুলিকে আমরা বলতে পারি পরিদর্শিত পাঠ বা supervised study। এরপরে শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে ঐসব বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে তৎপর হবে।

পাঠাগারের পরিচালনার জন্য কয়েকটি খাতা রাখা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামে বই দেবার জন্যে রেজিষ্টারীতে এক একটি স্বতন্ত্র পাতা থাকবে। এছাড়া প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী পাঠাগারে কোন বই কতটা পড়ল তার একটা রেকর্ড থাকা দরকার। সহজ কথায় একে বলা যায়, লাইব্রেরী ডায়েরী। এই লাইব্রেরী ডায়েরী লেখা হলে সহজেই প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতির ক্রম-পরিচয় লাভ করা যায়।

আজকের পাঠাগারগুলিতে বই নেবার ও দেবার স্থবিধের জন্যে অনেক রকম ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যাতে সহজেই বইএর নির্দেশিকা-পত্র দেখে বই পাওয়া যেতে পারে সেজন্য কার্ডের আকারে বইয়ের নাম, গ্রন্থকারের নাম—সবকিছু ড্রয়ারে সাজিয়ে রাখা হয়। এছাড়া, বইয়ের আলাদা তালিকা পাঠাগারের একটি বিশেষ অঙ্গ। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক এক উপলক্ষে এক এক ধরনের বই—বিশেষ বিশেষ টেবিলে একসঙ্গেই প্রদর্শনীর মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরলে ভালো হয়। যেমন, বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দের লেখা গ্রন্থ বা বিবেকানন্দের জীবনী দুই-একটি টেবিলে সাজিয়ে রাখা হলে পাঠকের পক্ষে তা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অবশ্য এই সব বিন্যাস বা সাজসজ্জা অনেকখানি নির্ভর করে পাঠাগারিকের উদ্যোগ-আয়োজনের উপর। তাঁর উৎসাহ থাকলে, পাঠাগার একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিদ্যালয়ের কার্যসূচী ও সময়-তালিকা

যে-কোনো একটি বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যা শিক্ষার্থীকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আসল

কথা, শিক্ষার্থী-জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ করতে হলে যে যে অভিজ্ঞতা ও কাজের প্রয়োজন, বিদ্যালয় তার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তাই তার কার্যসূচী হবে বৈচিত্র্যময়। কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব কার্যসূচীর প্রবর্তন করতে হবে; যেমন:

(ক) শিক্ষার্থীর শারীরশিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(খ) তথ্য পরিবেশন ও তথ্যানুশীলনের ব্যবস্থা রাখা;

(গ) বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তা করা;

(ঘ) সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (critical thinking) গ'ড়ে তোলা;

(ঙ) বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য (skill) অর্জন করতে সহায়তা করা;

(চ) জীবনের প্রতি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলা;

(ছ) সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা।

এই সব বিবিধ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হ'লে অনুরূপ আয়োজনের দরকার। তার জন্যে চাই শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা ও প্রধান শিক্ষকের উৎসাহ ও উদ্যোগ। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে; অথচ জাতীয় জীবনে সুস্থ সবল নাগরিকের বিশেষ প্রয়োজন। স্বামীজির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের দেশের প্রথম প্রয়োজন সুস্থ, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ যুবশক্তি; কারণ দুর্বলতাই সকল পাপের মূল। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শৈশব থেকেই এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিয়মিত দেহচর্চা ও শারীরশিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে প্রচুর অবসর ও উপযুক্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন। একথা ভাবলে চলবে না যে, মন শরীরের চেয়ে বড়। শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়।

তারপর বুদ্ধিবিকাশের যে গুরুদায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত, সে দায়িত্ব পালন করতে হলে পাঠ্যতালিকা, পাঠনপ্রণালী ও পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ সংহতির প্রয়োজন, ইংরাজীতে যাকে বলে coordination। প্রতিটি বিষয় যাতে সমানভাবে পরিবেশন করা হয় ও তার অনুশীলনের যথাযথ ব্যবস্থা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সময়-তালিকা প্রণয়ন করার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষক কেবল তথ্যের পরিবেশনেই তৃপ্ত। শিক্ষার্থী

তাকে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। তাই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তথ্যপরিবেশনকে যেমন সরস ও সহজ ক'রে তুলতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার অনুশীলনের ব্যবস্থাও করতে হবে। যাতে তারা শ্রেণীতে বসেই কোনো বিষয়কে ঘিরে কিছু কিছু আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর করতে পারে তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণের দিকে প্রবণতা দেখা দেবে। যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির বিকাশ হবে আলোচনার মাধ্যমে। ক্রমশ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষসাধন করাই হবে এর প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য একথা ঠিকই যে, একটু বয়স না হলে, কৈশোরের আবির্ভাব না ঘটলে, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠে না।

এ ব্যাপারে শ্রেণী-শিক্ষককে বিশেষ সচতেন হতে হবে। নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দিতে হবে; অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগাতে হবে। কখনও বা সন্দেহ-সংশয়ের মাঝখানে শিক্ষার্থী সমাধান খুঁজতে থাকবে ও তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করবে। জীবনে নানা সমস্যাই আসে; তার জন্যে প্রস্তুতির দরকার। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ভাবী জীবনের প্রস্তুতি হয়, তবে সেখানে critical thinking বা যুক্তিবাদী মনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ সংশয় পারাবারের তীরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় এদিকে কতখানি দৃষ্টি দেওয়া হয় তা কারও অজানা নেই। তথ্যের ভারে শিক্ষার্থী যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় কোথায় তার? সেজন্য মনে হয় যে, বোঝা কমিয়ে যদি চিন্তনের দিকে বেশি লক্ষ্য দেওয়া যায় তা হলে বোধ হয় আমরা লক্ষ্যের দিকে বেশি এগিয়ে যেতে পারব।

তাছাড়া গতানুগতিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি হ'ল এই যে, সে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দিকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। হাতের কাজের নৈপুণ্য বা কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করাও যে শিক্ষার একটি চরম লক্ষ্য সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন উদাসীন ছিল। আজ বিবিধার্থসাধক (Multipurpose) বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যতালিকার মধ্যে তার স্থান হয়েছে বটে, তবে সেসব বিষয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

অনেক সময় দেখা যায়, জীবনে সব আছে, অথচ শান্তি নেই। তার

কারণ বোধ হয় সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। তাই জীবনের প্রতি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে না উঠলে, মানবপ্রীতির উন্মেষ না হলে, সব শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীর জীবনের শুরু থেকে এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিতে হবে। একে একে তার মন ও হৃদয়ের বিকাশ সাধন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিক্ষা হ'ল বোধের তপস্যা। এই বোধ বা অনুভূতি যদি জেগে না ওঠে, যদি একটা সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাই, তবে সে শিক্ষা আমাদের আর যাই দিক, স্থায়ী কল্যাণ ও তৃপ্তি দিতে পারবে না। এই দিকে তাই আজ বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে। আজ পৃথিবীর বুকে যে হানাহানি, তার মূলে আছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

মনে হয়, এর মূলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথমে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে একটা পুরো মানুষ গ'ড়ে ওঠে। তাইতো স্বামীজি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমি চাই মানুষ গড়ার শিক্ষা—যে শিক্ষা মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দেবে।'

একদিকে এইসব দায়িত্ব, অন্যদিকে বিদ্যালয়ে কার্যসূচীর দৈন্য ও প্রাণহীন আয়োজন। এর সমাধান করতে হলে এমন একটি সময়-তালিকা প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবদিকে সুসমঞ্জস সংহতি বজায় থাকে। তাই বিদ্যালয়-জীবনে সময়-তালিকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, কার্যপরিচালনার পূর্বকার কল্পিত নকশাটির নাম হ'ল বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা বা Time Table। তাই সময়-পত্রিকা ছাড়া বিদ্যালয়ের কোনো কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। একজন শিক্ষাবিদ্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সময়-তালিকা হ'ল বিদ্যালয়ের হৃৎস্পন্দন। এই হৃৎস্পন্দনের ফলে সমগ্র দেশে যে রক্তধারা প্রবাহিত হয় তা সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনে গতি সঞ্চার করে।

সময়-পত্রিকা প্রস্তুতের মূল সূত্র

আগেই বলেছি যে, পাঠ্যতালিকার সঙ্গে সময়-তালিকার প্রশ্ন জড়িত। বিদ্যালয়ে দিনের কোন সময়ে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কি কাজ করবে সে বিষয়ে একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করাই হ'ল সময়-তালিকার উদ্দেশ্য। যাতে

বিনায়াসে সমস্ত বিদ্যালয়ে সময়-সূচী সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সময়-তালিকা প্রস্তুত করাই বাঞ্ছনীয়।

সময়-পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের সার্থক সমন্বয় করতে হয় :—

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় ;

(খ) বিভিন্ন ছাত্রদের মানসিক শক্তির পরিমাণ ;

(গ) বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যাবলী ;

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের যোগ্যতা।

এছাড়া আরও অনেক দিকে দৃষ্টি দেবার আছে। যেমন, বিদ্যালয়ের পরিসর, শিক্ষকের সংখ্যা ও স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে কিভাবে সময়-তালিকাকে কার্যকরী করা যায় এ নিয়ে বহু আলোচনার অবকাশ আছে। তবে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখলে কাজ সহজ হয়। যেমন :

(১) বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলির শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করা ;

(২) পাঠ্যবিষয়গুলির গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান দেওয়া ;

(৩) বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক কাঠিন্য অনুযায়ী সময়-তালিকায় অগ্রাধিকার দেওয়া ;

(৪) শ্রেণীগুলিকে সকল সময়ের জন্যে কাজে নিযুক্ত রাখা ;

(৫) শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতানুযায়ী সমভাবে কর্মবিতরণ করা।

এছাড়া শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও অবসাদ; শিক্ষকের রুচি, যোগ্যতা ও প্রবণতা প্রভৃতির প্রশ্নও আছে। সময়-তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাঠ্যতালিকায় নানাজাতীয় বিষয় থাকে। তাদের মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কতকগুলি সহজ ; কতকগুলি সাধারণ পরীক্ষার বিষয়, কতকগুলি কেবল বিদ্যালয়েই পরীক্ষা হয়। সুতরাং আমাদের বর্তমান পরীক্ষাকেন্দ্রিক অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ পরীক্ষায় স্থান পেয়েছে কিনা তার উপর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। বলাবাহুল্য, যে বিষয়গুলি পরীক্ষায় স্থান পেয়েছে সেগুলির গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। আবার তার মধ্যেও গণিত, ইংরেজি, ইত্যাদি বিষয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পুঁথিগত বিদ্যার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গিয়ে বিদ্যালয়-জীবনের সব আনন্দই হারিয়ে গেছে। আনন্দ পরিবেশনের কোনো ব্যবস্থাই সময়-তালিকায় নেই। খেলাধুলো, হাতের কাজ, ব্যায়াম, নানারকম আলোচনা-চক্র, বিতর্ক সভা, পরিভ্রমণ (excursion) ইত্যাদি বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ না হলে সময়-তালিকা মনস্তাত্ত্বিক হবে না। কারণ, তা শিক্ষার্থীর সব প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের সময়ে আর একটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি। ক্লান্তি-মূল্য বিচার ক'রে দেখতে হবে। আর যে বিষয়গুলি অধিক মনোযোগসাপেক্ষ—অর্থাৎ যা সহজেই ক্লান্তি উৎপাদন করে, সময়-তালিকাতে সেগুলিকে প্রথম দিকে স্থান দেওয়া উচিত। কোন বিষয় কতখানি ক্লান্তি আনে, এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। যে-কোনো শিক্ষা-পরিকল্পনায় সময়-তালিকার মূল্য যে অনেকখানি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের মন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলতে পারে না। তাই একঘেয়ে কাজে ক্লান্তি আসে, আসে অবসাদ। অনেক সময় এই ক্লান্তি-অবসাদের মূলে থাকে দেহের অক্ষমতা, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করতে চাইলেও মানুষের দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর একটা দিকেও আমাদের ভাবতে হবে; সেটা হচ্ছে মনের দিক। অনেক সময় দেখা যায় যে, দৈহিক ক্লান্তি না আসা সত্ত্বেও মানসিক অবসাদ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা কারণে এই অবসাদ আসে। তাই সময়-তালিকা প্রণয়নে এই সব দিকে দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিষয়গুলির ক্লান্তিমূল্য অর্থাৎ কোন বিষয় কতখানি ক্লান্তি আনতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নিতে হবে। আর সেই বিষয়ঘটিত ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে সময়ঘটিত ক্লান্তিও বিচার করতে হবে। কারণ, তা না হ'লে শিক্ষার অগ্রগতি পদে পদে ব্যর্থ হবে। বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যকালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে ক্লান্তিমূল্য অনুযায়ী বিষয়গুলির সন্নিবেশ করলে শিক্ষায় সুফলের আশা অনেক বেশি।

আমাদের বিদ্যালয়গুলো সাধারণত শুরু হয় বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা থেকে। প্রথম ঘণ্টায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে খানিকটা পথের ক্লান্তি থেকে যায়। তাই মনোসংযোগের দিক থেকে প্রথম ঘণ্টার চেয়ে দ্বিতীয় ঘণ্টা অধিকতর মূল্যবান। ক্রমশই যত বেলা গড়াতে থাকে ততই ক্লান্তি নেমে আসে।

শিক্ষার্থীদের চল-চপল মন বিদ্যালয়ের রুদ্ধ পরিবেশে স্থির থাকতে চায় না। ফলে, শিক্ষার সব আয়োজনের সার্থকতা হারিয়ে যায়। মনের গতি-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, কাজের মধ্যে সে চায় আনন্দ, চায় অবসর ও বৈচিত্র্য। বিদ্যালয়-জীবনে সেই বৈচিত্র্য আনতে হবে কাজের সঙ্গে সঙ্গে। কিছু কিছু অবসরবিনোদনের আয়োজন করতে হবে, তবেই শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে। খেলাধুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক শিক্ষার উপকরণ পেতে পারে, তেমনি খেলার ছলে শিক্ষা দিলেও তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-জীবনে কার্যকরী হয়।

বিদেশের স্কুলগুলোয় এই পদ্ধতি বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। স্কুল শুরু হয় সকাল নটায়। বারোটার সময় স্কুলেই খাওয়া দাওয়া, তার মাঝে একবার দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা, আবার মাঝে দুবার মাঠে ছোটাছুটি করার ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রাম। দেড়টা থেকে আবার স্কুল শুরু। প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত চ'লতে থাকে। কিন্তু বিকালের বেশির ভাগেই হাল্কা ধরনের বিষয় পড়ানো হয়। গল্প বলা, ছবি আঁকা, যে যার খুশিমতো কাজ করার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে। একই ক্লাসে কেউ বা ছবি আঁকছে, কেউ বা সেলাই করছে, কেউ বা মডেল তৈরি করছে। আবার যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তারা ক্লাসটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে।

আমার মনে হয়, ও দেশের বিদ্যালয়ের কর্মধারার মধ্যে শিক্ষকের যে স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকে তার মূল্য কম নয়। ছকে বাঁধা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে আমরা সবকিছুর মধ্যেই তার প্রতিফলন দেখতে চাই। এইখানেই বিড়ম্বনা। যতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা না আসবে ততদিন আমরা কেবল গড্ডলিকায় ভেসে চলব, কোনো বৈচিত্র্যই আসবে না। নতুনের কোনো স্বাদ না থাকার জন্যে শিক্ষার সব আয়োজন প্রাণহীন হয়ে যাবে। তাই স্থানীয় পরিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী, ঋতু অনুযায়ী এই সময়-তালিকার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এমন কি, আমাদের বিদ্যালয়ে যে চিরাচরিত ছুটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে তারও কিছু অদল-বদল করলে ভালো হয়। একটানা দীর্ঘ অবকাশ না দিয়ে, মাঝে মাঝে অল্প-মেয়াদী ছুটি দিলে, বোধহয় তা বেশি কার্যকরী হয়।

সময়-তালিকা সাধারণত দুই প্রকার হতে পারে ঃ—

(ক) শ্রেণী অনুসারে ;

(খ) শিক্ষক অনুসারে।

এই দুই ধরনের সময়-তালিকার প্রচলন থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। বিষয় অনুসারেও একটি সময়-তালিকার সার্থকতা আছে। কোন বিষয়ে কত সময় দিলে তার পাঠন কার্যকরী হবে সেবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রধান শিক্ষকের থাকা উচিত। এ ছাড়া যাতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলো, সখ (hobby) ও রুচি অনুযায়ী কার্যকলাপ সময়-তালিকায় স্থান পায় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

অনেকেই হয়তো সময় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। প্রশ্নটির মধ্যে যুক্তি আছে ঠিকই, তবে আমাদের বহু সময়ের অনর্থক অপচয়ও হয়। যেমন, কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে সেই সময়টির আমরা কোনো সদ্ব্যবহার করতে পারি না। অঙ্কের ক্লাসে হয়তো বাংলার শিক্ষককে পাঠানো হয়। এতে ক্লাসের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। তার চেয়ে সারা বছরের অনুপস্থিত শিক্ষকদের কথা ভেবে সেই সময়ের উপযোগী একটি কার্যতালিকা ঠিক ক'রে রাখলে তাতে সুফল হতে পারে। আবার এমন দেখা গেছে যে, অনেক বিষয় পড়াবার পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ঘণ্টা যথেষ্ট নয়। সেখানে পর পর দুটি ঘণ্টা পেলে কাজের বেশি অগ্রগতি হয় ও পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমে যায়। বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। অন্তত এক একদিনে এক একটি বিষয় (unit)-শিক্ষা শেষ না হলে পরের দিনে আবার সেই শিক্ষার জন্য শ্রেণী-পরিবেশ তৈরি করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ফলে, বহু সময়ের অপব্যয় হয়। মোটকথা, একটি নির্দিষ্ট সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের কার্যধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেলে বোধহয় সময়ের অপব্যয় কম হয়। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠনকাল যদি যথেষ্টই না হয় তবে যে-কোনো ভাবেই হোক তার বিস্তার বাঞ্ছনীয়। হয় আরও সকালে বিদ্যালয়ের পাঠনকাল শুরু করা ও বিদ্যালয়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আর তা না হলে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবসর কমিয়ে দিয়ে পাঠনকালের জন্য কিছু সময় নিলে বোধহয় এইসব সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভবপর হয়।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

যেসব লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সেদিকে যাত্রা শুরু করতে হলে কেবল-মাত্র পাঠ্যবিষয় পরিবেশন করলে চলবে না, পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলীরও সেখানে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। হয়তো এতদিন তার মূল্য স্বীকৃত হয়নি নানাকারণে; তাই তাকে বলা হ'ত পাঠ্যাতিরিক্ত (Extracurricular) কার্যাবলী। আজ তাকে আর সে আখ্যা দেওয়া হয় না। তাকে বলা হয় সহপাঠক্রমিক (Co-curricular)। এই নামের পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা পরিবর্তন এসেছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য কাজের যোজনার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে সকলেই স্বীকার করেন। কেবল গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাদের এগিয়ে আসতে হবে জীবনের পথে; সমাজের পটভূমিকায় নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখী হবার প্রস্তুতি আনতে হবে। জ্ঞানের অনুশীলন ও তার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আচরণকে উপযুক্ত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ অনুশীলনেরও প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজনের দিকে তাকালে আচরণ অনুশীলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ—(ক) মনস্তাত্ত্বিক, (খ) সামাজিক ও (গ) বাস্তব।

মানুষের বিকাশ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত—বৌদ্ধিক (Intellectual), মানসিক (Emotional) ও শারীরিক (Physical)। এই তিনটি স্তরের সুষম বিকাশ ঘটলে তবেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে।

সহপাঠক্রমিক বিষয় বলতে অসংখ্য কাজকর্ম বোঝায়। পড়াশুনা ছাড়া খেলাধূলো, আলাপ-আলোচনা, ছোটাছুটি ও এমনি অনেক কাজই বোঝায়, যার সঙ্গে হয়তো শিক্ষার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে এগুলিও সহায়ক। শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি, সামর্থ্য, আগ্রহ অনুযায়ী কাজ বাছাই ক'রে নেবে আর সেইসব কাজের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রসার ঘটবে। কর্মই তখন জীবনের ধর্ম হবে।

প্রথম কথা, জ্ঞানানুশীলনের জন্যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে যেমন নানাবিষয়ের সংযোজন করা হয়, তেমনি অন্যান্য বিচিত্র কার্যধারা প্রবর্তন করাও আজকের শিক্ষার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শিশু যখন কৈশোরের দিকে এগিয়ে চলে তখন

তার আচরণে নানা প্রবৃত্তি উঁকি দেয়। সবসময়ে এটা যে সামাজিক তা নয়, কোথাও কোথাও মনের অসামাজিক প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলিও প্রকাশের পথ খোঁজে। কাজের মাধ্যমে এইসব কামনা-বাসনা কিছু কিছু পরিতৃপ্ত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দলগত কাজে অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ঘটে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষার্থীর সবরকম প্রয়োজন মেটাতে হলে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিভাবে সেই দায়িত্ব সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রবর্তন করা যায়, তা আমাদের আলোচ্য। আগেই বলেছি যে, শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে আমরা কেবল বুদ্ধির বিকাশকেই বুঝি না; আবেগ, উচ্ছাস, সামাজিকতা, ব্যক্তিত্বের ক্রমপরিণতিকেও বুঝি। যতই বয়স বাড়তে থাকে, শিক্ষার্থীর মনের চাহিদা ততই বেড়ে যায়। অনন্ত প্রশ্ন, অনন্ত কৌতূহল তার মনে ভিড় করে। সে চায় জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আহরণ করতে। এই অভিজ্ঞতাই হ'ল তার বৌদ্ধিক বিকাশের মূল ভিত্তি। তাই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তন যখনি করতে হবে তখনি ভাবতে হবে কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা তা প্রবর্তন করতে চলেছি। এর লক্ষ্য হবে শ্রেণীর ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে দিতে পারিনি এইসব কার্যাবলীর মাধ্যমে তা দিতে হবে। এইভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শ্রেণীপাঠনের পরিপূরক হবে। এমন অনেক খেলাধুলো প্রবর্তন করা যায় যেখানে বুদ্ধির প্রয়োজন। এইসব পরিস্থিতিতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, তাদের রুচি মার্জিত হয়।

আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর কিশোরদের মন সবসময়েই প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে। তাকে ঠিক খাতে বইয়ে দিতে না পারলে অনেক বিপর্যয় দেখা দেয়। কখনও অতিরিক্ত ক্রোধ, কখনও প্রচণ্ড খেয়াল, কিশোর-জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করতে চায়। এইসব কার্যাবলী ঠিকভাবে প্রযুক্ত হ'লে তাদের আবেগ-জীবনের ক্রমোন্নতি ঘটে। তারা বুঝতে শেখে বাস্তবকে, বুঝতে শেখে সমাজ সংসারকে। একে একে সামাজিক চেতনার উন্মেষ হয়, দুর্দম প্রাণশক্তি ক্রমশ নিয়ন্ত্রিত হয়। দলগত কাজের মধ্যে প্রচণ্ড স্বার্থ-বুদ্ধির সংকোচ ঘটে।

এই সঙ্ঘ-চেতনাই সামাজিক চেতনার প্রথম ধাপ। গণ্ডি দিয়ে ঘেরা নিজের জগৎ ছেড়ে তার পদক্ষেপ শুরু হয়। লেনাদেনার মূল্য সে বুঝতে শেখে। তাই এইসব সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তুলতে হলে এমন কাজ ও খেলা-ধুলোর প্রবর্তন করতে হবে যেখানে সহযোগিতা, সহানুভূতি, নিয়মনিষ্ঠা ও অনুভূতির উন্মেষ হয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। এতে তারা আপন আপন রুচিমতো কাজ বেছে নিয়ে নিজের আগ্রহ ও শক্তির পরিচয় দিতে পারে। এইসব কার্যাবলীকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে কাজের মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের আবিষ্কার করবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শিক্ষার্থী নিজেকে ভালোবাসতে না পারলে কোনো কিছুই ভালোবাসতে পারে না। যার আত্মমর্যাদাবোধ আছে, যে নিজেকে সম্মান দিতে জানে, সে সকলকেই সম্মান দিতে পারে। তার অভাব ঘটলে জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে যায়। কৈশোরের নানা স্রোত যখন জীবনে ভিড় করে তখনি তাদের সুষ্ঠু নির্দেশ চাই। বাইরে থেকে আদেশ-অনুদেশ চাপিয়ে দিলে চলবে না। অন্তরের নির্দেশ জাগিয়ে তুলতে হবে নানা কাজের মাধ্যমে। সে যখন বুঝতে শিখবে কোথায় তার সম্পদ ও শক্তি, কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন, তখন তার নিজের প্রতি ভালোবাসা তাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। আজকাল 'অবসর বিনোদনের শিক্ষা' কথাটি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। খণ্ড-ছিন্ন অবসরমুহূর্তগুলিকে কি ভাবে উপভোগ্য ও সার্থক ক'রে তোলা যায় এই হ'ল শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, কাজের শেষে অবসাদের বোঝা নেমে আসে ; অবসরের মুহূর্ত গ্লানিতে ভ'রে ওঠে। অথচ নিখিল সৃষ্টির মধ্যে আনন্দের সামগ্রী ছড়িয়ে আছে। চারদিকে সুন্দরের প্রকাশ ; তাকে দেখবার মতো চোখ থাকা চাই। শিক্ষার্থীদের এই চোখ খুলে দিতে হবে, আর তা খুলে দিতে হলে আগে শিক্ষকদের সেই দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। হতাশার গান গেয়ে কোনোদিনই তার স্পর্শ পাওয়া যায় না। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে মানুষও যেন একটি যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মচক্রের আবেষ্টনে সে পঙ্গু। নির্দিষ্ট বাঁধা পথে ঘুরে প্রাণশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হচ্ছে। এর প্রতিকার কোথায় ? যন্ত্র-সভ্যতাকে আমরা নির্বাসন দিতে পারব না। যুগের ধর্ম মানতে হবে,

কিন্তু তার পূর্ণ আধিপত্য আমরা মেনে নিতে পারি না। যন্ত্র যন্ত্রই থাক। তার মধ্যেই এমন এক নতুন মন্ত্রের সন্ধান পেতে হবে যা মানুষের জীবনে ছন্দ আনবে। সে মন্ত্র হ'ল, হাজার দুঃখের মধ্যেও সুখের সন্ধান পাওয়ার মন্ত্র। যাকে মনে হয় নিরর্থক, ব্যর্থতার গ্লানি যেখানে পুঞ্জীভূত, তাকে সার্থক ক'রে তোলা যায় কি ক'রে? জীবনের শুরু থেকে যদি সেই মন্ত্র-শিক্ষাই আমরা শিক্ষার্থীদের দিতে পারি তবে তার চেয়ে বড় পাথেয় আর কিছুই নেই।

জীবনে এমন অনেক খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত আসে যাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা জীবনপাত্রকে ভ'রে তুলতে পারি, অবসরকে আনন্দমুখর ক'রে তুলতে পারি। এইসব খণ্ড-স্বর্গ রচনা করতে গেলে মনের যে প্রস্তুতির দরকার, সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে তা সম্ভব। কেউ কলা, কেউ মৃৎশিল্প, কেউ সঙ্গীত, কেউ বা টুকিটাকি জিনিস নিয়ে কিছু মডেল তৈরি করতে করতে আনন্দ খুঁজে পাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আবিষ্কার করবে। এই সুযোগ দিতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেয়াল-খুশিমতো কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। Hobby centreএ যে সহপাঠক্রমিক কাজের অনুশীলন চলতে থাকে, তারি ফলে গ'ড়ে ওঠে স্বভাবের বিচিত্র দিক। ব্যক্তিত্বের বিকাশ তাতে আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দেয়।

শ্রেণীতে পাঠক্রমভুক্ত যে জ্ঞান শিক্ষার্থীরা আহরণ করেছে সেই বিযুক্ত-জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করতে হলে নানাধরনের শিক্ষামূলক ও সহপাঠ-ক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। এর ফলে খণ্ডিত বিভক্ত জ্ঞান বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংহত হতে পারে। এই ধরনের কার্যা-বলীর আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উৎসব, প্রদর্শনী, আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজকে অনেক কাছাকাছি আনা যায়। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে। আজ বিদ্যালয়কে একটা Community Centre ব'লে ধরা হয়েছে। বাইরের ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবধান আজ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সেই ব্যবধানকে আরও সংকীর্ণ করতে হলে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতা যথেষ্ট। বিদ্যালয়-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে হলে নানা অনুষ্ঠান, উৎসব ও শিক্ষার্থীদের বিচিত্র আয়োজন বিশেষ সার্থক। এর ফলে এদের ঘিরে অভিভাবকদের সমাবেশ ঘটতে পারে। এমনি ক'রে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে

পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় হতে পারে। গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ এই তিনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমূহ কল্যাণ আসতে পারে।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তার যথাযথ রূপ দেওয়া সহজ নয়। পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক উভয় প্রকার শিক্ষার যদি সমান মূল্য না দেওয়া যায়, যদি পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা না যায় তবে এ সমস্যা থেকেই যাবে। এখনও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে স্থান না পেলে এই ধরনের কার্যাবলীর কতখানি বাস্তবমূল্য থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষকরা এই সব কার্যাবলীর উপর কিছু গুরুত্ব আরোপ করে, তাহলেও কিছুটা সুফল ফলতে পারে। শিক্ষার্থীদের আচরণ এই সব কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে আর তার মূল্যায়নের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। আজ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের কল্যাণে প্রগতি-পঞ্জীর (Cumulative Record) প্রবর্তন হয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের নানা দিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু মূল্যায়নের পথে বহু অন্তরায়। সংকীর্ণ বিদ্যালয়-পরিবেশে এই সব কিশোরদের আচরণের নানা দিক ধরা পড়ে না। তাই সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয়-জীবনে প্রবর্তিত করা দরকার। কোন কার্যাবলীর মাধ্যমে কি আচরণ লক্ষ্য করা যাবে, কি ভাবে তার মূল্যায়ন হবে এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার অবসর আছে।

বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কাজগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যেমন,

(ক) সাহিত্যমূলক কর্ম;
(খ) শিল্পমূলক কর্ম;
(গ) সমাজনীতিমূলক ও অর্থনীতিমূলক কর্ম;
(ঘ) প্রশাসনিক কর্ম;
(ঙ) প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণমূলক কর্ম;
(চ) সৃষ্টিমূলক কর্ম।

সাহিত্যমূলক কর্ম। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আছে। আমরা চলার পথে যেসব অনুভূতি আহরণ করি সেইসব অনুভূতি রূপ নেয় সাহিত্যে। এই অনুভূতি বা ভাব-সম্পদ জীবনে বিশেষ মূল্যবান। সাহিত্যে একদিকে অনুভূতি, আর একদিকে কল্পনা এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটে। মনের অস্ফুট ভাবগুলিকে কল্পনার রঙ মিশিয়ে স্ফুটতর ক'রে তোলবার প্রয়াস চিত্তের উৎকর্ষ আনে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। বিদ্যালয়ে নানারকম সাহিত্যমূলক কর্মের প্রবর্তন করা যায়, যেমন বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশ, প্রাচীর-পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন রচনার প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ও বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। এই সব প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা যত বেশি অংশ গ্রহণ করবে ততই ভালো। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশের ধারা এগিয়ে যাবে; মনের অবিন্যস্ত চিন্তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার শক্তি জন্মাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, তারা সাহিত্যমূলক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরের সৃষ্টির তাগিদকে তৃপ্ত করতে পারবে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের দুরবস্থার কথা কারও অজানা নেই। কিন্তু এইসব কাজের প্রবর্তন করতে হলে অর্থনৈতিক কারণ খুব বেশি প্রতিবন্ধক হয় না। এখানে চাই মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা, চাই সৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ। পত্রিকা ছাপাবার মতো সঙ্গতি বিদ্যালয়ের না থাকলেও হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই পত্রিকাই শিক্ষার্থীদের নিজেদের লিপি, তাদের আগ্রহের সাক্ষর বহন করবে। কেউ কেউ পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেবে, কেউ তার গঠন-সৌষ্ঠবের, কেউ বা চিত্র-যোজনার। যে যার সাধ্যমতো, রুচিমতো পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করবে। মনে হয়, এরকম হাতের লেখা পত্রিকার উপযোগিতা অনেক বেশি। কারণ, এখানে পারস্পরিক সহযোগিতার অবকাশ অনেকখানি। প্রাচীর-পত্রিকার ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে; তবে প্রাচীর-পত্রিকার প্রকাশ ত্রৈমাসিক হতে পারে। এছাড়া, শ্রেণীকক্ষে মহাপুরুষদের বাণী ও তাদের প্রতিকৃতি রাখবার ভার শিক্ষার্থীরা যদি নিজেরা নেয় তবে তা আরো সুন্দর হয়। প্রতিটি শ্রেণীতে একটি বোর্ড নির্দিষ্ট থাকবে যেখানে তারা নিজের হাতে এইসব প্রতিকৃতি এঁকে বা তাঁদের বাণী লিখে সেখানে যোজনা করতে পারে। প্রত্যেক মাসে

এই বোর্ডে নিত্য নতুন বাণীর সমাবেশ ঘটলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজন-স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রত্যেকেই চাইবে তার আঁকা ছবি বা লেখা বোর্ডে যোজনা করতে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে উপযুক্ত ছবি বা লেখা নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও দেখা দেবে। যাতে তাদের হাতের লেখা আরও ভালো হয়, যাতে তারা বিচিত্র রচনাসম্ভার থেকে প্রখ্যাত লেখকের অমৃতবাণী সংকলন করতে পারে, সেদিকে উৎসাহ জাগানোই শিক্ষকের কর্তব্য। এইভাবে একটা সাহিত্যিক-মনের উন্মেষ ঘটতে পারে। বিতর্ক-সভা সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। এর লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের প্রকাশের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে যুক্তিবাদী মনকে গঠন করা ও সঙ্গে সঙ্গে তথ্যান্বেষী করা। অনেক সময়, বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বিতর্ক-সভার উদ্যোগ করা সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণীগতভাবে শিক্ষকদের নেতৃত্বে ছোট ছোট বিতর্কের ব্যবস্থাও করা যায়। অনেক সময়, পাঠ্যবিষয়কে ভিত্তি ক'রেও অনুরূপ ব্যবস্থা করলে সুফল দেখা যায়। বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হলে অনেক সময় স্থানীয় সাহিত্যিক বা শিক্ষাবিদ্‌দের আমন্ত্রণ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তা করা চলে। এর ফলে এঁদের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট প্রেরণা পায়, তাদের মধ্যে পাঠ্যাতিরিক্ত জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

শিল্পমূলক কর্ম। শিল্পের সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক। তাই শিল্পমূলক কর্ম বলতে অনেক কিছু বোঝায়। একদিকে ললিত-কলাকেও যেমন শিল্প বলা চলে তেমনি যন্ত্রশিল্পও আবার শিল্পের অন্তর্গত। বিদ্যালয়-জীবনে শিল্পমূলক কর্মের যথেষ্ট সুযোগ আছে। কারণ, এমন অনেক বিষয়বস্তু পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত আছে যেগুলি উপভোগ করতে হলে শিল্পমূলক কর্মের যোজনা করা দরকার। যেমন সাহিত্য-পাঠনে শ্রেণীর মধ্যে কোনো ছোট কাহিনীকে ঘিরে অভিনয়-শিল্পের উপযোগিতা আছে, তেমনি বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার পাঠনে ছোট ছোট মডেল তৈরি করারও অবকাশ আছে। এইসব টুকিটাকি জিনিস করতে শিক্ষার্থীরা আনন্দই পাবে অথচ তাদের পুঁথিগত বিদ্যা প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও সম্পূর্ণ হবে। তা হলেই দেখা যায় যে, যে-কোনো বিষয়ে শিল্পমূলক কর্মের বিশেষ স্থান আছে, কারণ কোনো কিছু গ'ড়ে

তোলবার পেছনে যে সৃজনীশক্তির দরকার কাজের মাধ্যমে তারও অনুশীলন হবে। সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞান, সঙ্ঘচেতনা ও অন্তরের শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটবে। এই কাজ যতই বাড়বে ততই শিক্ষা ক্রিয়াকেন্দ্রিক হবে; কিশোরদের যৌনপ্রবৃত্তি, সৃজনাত্মক প্রবৃত্তি ও আত্মপ্রসারের কামনা ততই পরিতৃপ্ত হবে। আসল সমস্যা হ'ল, শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশের অভাব। কোন সহপাঠক্রমিক কার্যধারার মাধ্যমে, কোন ব্যক্তিত্বের দিকটি পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। তবেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পমূলক কর্মের সার্থকতা আসবে।

সমাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক কর্ম। আগেই বলেছি, বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজের একটি ছোটখাট প্রকল্প। তার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ-জীবনে প্রস্তুতি আনা। যাতে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উদার দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই ধরনের কাজের প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। স্বার্থান্ধ, সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। শান্তির অধিকারী হতে হলে নিজেকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করতে হবে; জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিফলিত করতে হবে। আর তারই প্রস্তুতি আনতে হবে বিদ্যালয়-জীবনের শুরু থেকে। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে যাতে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারে এমনি দলগত কাজের প্রবর্তন বিশেষ উপযোগী। বয়েস্ স্কাউট, গার্লস্ গাইড, রেডক্রস, সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি নানাধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী দৈনন্দিন বিদ্যালয়-জীবনের অঙ্গ ক'রে তোলা দরকার। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে আচরণের অনুশীলন হয়। দল, সঙ্ঘ, সভা-সমিতি গ'ড়ে তুলতে সহায়তা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়, যাতে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন (Self-Government) প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশাসনিক কর্ম। এই স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হ'লে একে একে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা অর্জন করবে। এইসব দায়িত্ব দেবার আগে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষমতালিপ্সা শিক্ষার্থী-মনকে উদ্দাম ক'রে

তোলে ও নিজেদের মধ্যে সংঘাতের সূচনা করে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে শিক্ষক যদি কৌশলের সঙ্গে এই দায়িত্ব বণ্টন করেন তবেই মঙ্গল। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এই দায়িত্ব বণ্টন ও পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, বেশিদিনের জন্যে একজনের হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়তো সঙ্গত নয়।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণমূলক কর্ম। প্রকৃতিই অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাছাড়া প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সৃষ্টির বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে ও অনুভূতি জাগায়। কোথাও বা প্রাকৃতিক শোভা, কোথাও ঐতিহাসিক স্মৃতি, কোথাও ভৌগোলিক পরিচয়। নানাভাবে প্রকৃতি জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এমন কি, আমাদের চারদিকে যে তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ, প্রাণিজগৎ আছে সেদিকে ফিরে তাকালে, ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলে, অনেক কিছু জ্ঞানের সন্ধান মেলে। বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষাভ্রমণের একটি বিশেষ স্থান থাকা উচিত। সময়-তালিকায় উদ্যান রচনা ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও আবশ্যিক হ'লে ভাল হয়। আমরা সংকীর্ণ বিদ্যালয়ের পরিবেশে যা করতে পারি না, শিক্ষাভ্রমণের মাধ্যমে অনেক সময় তা করা সম্ভব হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি শিক্ষা-ভ্রমণ বহু শিক্ষার্থীর মনে নির্দিষ্ট বিষয়ে নতুন আগ্রহ জাগিয়েছে; নতুন ক'রে তারা আস্বাদ লাভ করতে শিখেছে। এটা কম কথা নয়। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ভ্রমণের ব্যাপক ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু খুব বেশি দূরে না গিয়েও কাছাকাছি অনেক জায়গায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে তারা তাদের প্রাণ মেলে ধরবে; পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে শিক্ষা সার্থক হবে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে।

দূর থেকে অনেককে বোঝা যায় না, মনের কাছাকাছি এলে ধরা পড়ে। এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা প্রকৃতিতে লাজুক; একটু প্রেরণার অভাবে তাদের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষা-ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আরও নিবিড় ক'রে জানা যায়, তাদের ব্যক্তিত্বের নানান দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিত্ব-বিচারের যথেষ্ট মূল্য আছে।

সেদিক থেকে ভ্রমণের দান অনেকখানি। ভ্রমণের পালা শেষ হলে কাজ শুরু হতে পারে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। কাউকে বলা হবে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে, কাউকে বা সে সম্পর্কে কোনো কিছু আঁকতে বলা যেতে পারে—এমনি আরও কত কি! দুই এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষায় যে প্রোজেক্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে কার্যকরী করতে হলে ভ্রমণের বিশেষ সার্থকতা আছে।

সৃষ্টিমূলক কর্ম। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। সৃষ্টির প্রেরণা সেখানে থাকতে বাধ্য। যতদিন প্রাণের স্পন্দন আছে ততদিনই সৃষ্টির নেশা। মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকে মানুষ এগিয়ে চলেছে তার সৃজনমূলক প্রবৃত্তি নিয়ে। এই আদিম প্রবৃত্তিকে দমন করতে যাওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। নানা কাজের মধ্য দিয়ে এই প্রবৃত্তির যথাযথ রূপ দিতে হবে। বিদ্যালয়ে এমন অনেক কাজ আছে যেখানে সৃজনী-প্রতিভার প্রয়োজন। সাহিত্যের সৃষ্টি, চিত্রকলা ও নতুন কিছু উদ্ভাবনের মধ্যে সৃজনী-শক্তির যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক সময় ছোটখাট কাজের মধ্যে শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা ও সৃজনী-প্রতিভা ধরা পড়ে। তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতিভার অভ্যুদয় না হলে দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দৈন্য আসতে বাধ্য। তাই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

তিন

বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা

পটভূমিকা

কি জাতীয় জীবনে, কি বিদ্যালয়-জীবনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। এই শৃঙ্খলাবোধের প্রকৃত তাৎপর্য কি তা আলোচনার বিষয়বস্তু।

পূর্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচবোধকেই শৃঙ্খলার প্রধান লক্ষণ ব'লে মনে করা হ'ত। তাই শিক্ষকগণের মধ্যে এই প্রকার ধারণার জন্য শিক্ষার স্বাধীন গতি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চারই ছিল শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায়। শাসনব্যবস্থা থেকে শৃঙ্খলা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমন ধারণার পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না। একমাত্র তর্জনের দ্বারা শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করাই নাকি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। যদি তাই হয়, তবে শৃঙ্খলা ও শাসন এই দু'য়ের প্রকৃত অর্থের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপ, তাও ভেবে দেখা দরকার।

পূর্বে শৃঙ্খলা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, ক্রমশ তার পরিবর্তন ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদও লোকচক্ষে ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠল। ফলে, আদর্শবাদের প্রভাব দেখা দিল। একমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চারিত্রিক আকর্ষণের দ্বারাই যে বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা অটুট থাকতে পারে, একথাই তখন মেনে নেওয়া হ'ল। ফলে, শাসনদণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষকদের আত্ম-বিস্তারের প্রয়াস দেখা দিতে থাকল। শিক্ষার্থীরা শাসন-শৃঙ্খলাবোধের নামে নির্যাতনের হাত থেকে পেল মুক্তি এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। শিক্ষার্থীদের ভাবপ্রবণ মনে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগানোই যে সব থেকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একথাই স্বীকার করা হ'ল। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কিছুকালের মধ্যে শুরু হ'ল এই ব্যক্তিত্ববাদের ভাঙ্গন। এই ব্যক্তিত্ববাদ যে ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করবে একথা মেনে নেওয়া হ'ল না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আবার এক নতুন পরিকল্পনা নির্দিষ্ট হ'ল!

মহত্তর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের স্পর্শ যেমন মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অন্যদিকে দুর্বল ও ক্ষীণসত্তাকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মসাৎ ক'রে মধ্যপথে তাকে স্বাতন্ত্র্যহীন বা পথভ্রষ্ট করতে পারে। এই কারণে, শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ টিকতে পারল না। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে পরিকল্পিত হ'ল এক নতুন মতবাদ। ইংরাজীতে একে বলা যায় Emancipation বা "স্ফূর্তিবাদ।" এই মতবাদের পুরোধাদের প্রথম লক্ষ্য হ'ল, মানুষের, বিশেষ ক'রে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে দমন করা কোনো মতেই উচিত নয়। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে নিয়মতান্ত্রিকতা অনেক সময় নিরর্থক হয়। সত্যিকারের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শৃঙ্খলাবোধ আসবে—এঁদের মতে তাই ঠিক। এর বিভিন্ন দিকও চিন্তার বিষয়। প্রথমত, অনেক সময় স্ফূর্তি ও প্রবণতাকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—যা সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, যে অভিজ্ঞতা ও স্ফূর্তিকে ভিত্তি ক'রে এই মতবাদ গ'ড়ে উঠেছে তা অনেক সময় দুঃখবহ হয়। আপন রুচি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে চঞ্চল শিক্ষার্থীর চরম অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা আছে। প্রতিবারই যদি নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যানুভূতির সঞ্চার করা হয়, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা, বংশার্জিত জ্ঞান ও মনীষীদের দানের কোনো মূল্য থাকে না। অক্লান্ত সাধনার ফলে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আজ মানুষের জীবনের পরম সম্পদ, তা উপেক্ষা করা আর সভ্যতার অগ্রগতিকে রোধ করা একই কথা। তাই ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ফূর্তিবাদের সমন্বয়ই বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী ব'লে মনে হয়। আত্মপ্রয়াস ও উদ্দাম গতিবেগকে রুদ্ধ না ক'রে অন্যদিকে চালিয়ে দিলে, বিদ্যালয়-শৃঙ্খলা অটুট অথচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বজায় থাকে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, জীবজগৎ ও জড়জগৎকে কেন্দ্র ক'রেই বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, তাই এদের মধ্যে সম্পর্কও নিবিড়। সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী-চিত্তে আনন্দের সন্ধান মিলবে। ক্রমে শাসনের প্রয়োজনও কমে আসবে।

তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলাবোধকে যে জাগানো যায় তা আজ স্বীকৃতিলাভ করেছে। ইংরাজীতে একে বলে free discipline।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ করা যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব, তেমনি শিক্ষার্থীর মনে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য

মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা সৌন্দর্যের অঙ্গ। জীবনকে ছন্দোময় ক'রে তুলতে শৃঙ্খলার বিশেষ দরকার। কিন্তু শৃঙ্খলার বিকৃত রূপ অনেক সময় মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে ও এক ধরনের সঙ্কোচ ও শঙ্কার ভাব জাগিয়ে দেয়। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির মূলে শৃঙ্খলার দানকে অস্বীকার করা যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অবকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও স্বাধীনতা প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতীক। যেমন স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা স্বীকার ক'রে নেওয়া বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার পথে বিশেষ বাধা, আবার শিক্ষার্থীদের মনের স্বাচ্ছন্দ্য হরণ ক'রে ভয়ের সঞ্চার করাও তেমনি ক্ষতিকর। তাই যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও উন্মোচন, তর্জন ও স্নেহপ্রীতি, হিতৈষণা ও শাসনের দ্বৈতভাব থাকে, সেখানেই প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা আশা করা যায়। একটি ভারসাম্য বজায় রাখা শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ।

কোনোরূপ সঙ্কোচ মনে না এনে অবাধে চপল শিক্ষার্থী আপনার খেয়ালে বিদ্যালয়-জীবন কাটাবে—এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মনোমত ও অভিনব হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এর পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। তাই শৃঙ্খলার সঙ্গে শাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজও আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্বকীয় নীতিকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই শাসন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং বিশেষ গর্হিত আচরণকে বেত্রদণ্ডের আঘাত দিয়েও বন্ধ করতে হয়। তবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যতই সাবলীল ও শাসনমুক্ত হবে, সুফলের আশাও তত বেশি হবে।

শাসনের প্রকারভেদ

শাসন বলতে যে ধারণা হয় অনেক সময়েই তা ভুল প্রমাণিত হয়। কেবল তিরস্কার বা প্রহারের মাধ্যমে শাসনকার্য সাধিত হয় না। মার্জিত অথচ অধিক কার্যকরী প্রয়াসে এই শাসনযন্ত্র অন্য ভাবেও প্রয়োগ করা যায়ঃ

(১) শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা

এই শাসনব্যবস্থা অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে

ও অন্যান্য শাসনের অপেক্ষা বিশেষ কার্যকরী হয়। এর কার্যকারিতা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণী শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে।

(২) পৃথকীকরণ

অন্যান্য সহপাঠী থেকে দোষীকে পৃথক বা একঘরে করলেও অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভবত এর কার্যকারিতা অধিক হয়, কারণ সঙ্গীর অভাবে তাদের মন বেশি বিষণ্ণ হয়।

(৩) শিক্ষকের অসমর্থন

ইঙ্গিতে, আভাসে ও কটাক্ষে বা অন্য উপায়ে দোষীকে অসমর্থন করলে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়।

(৪) মৌখিক অসমর্থন ও তিরস্কার

গোপনে দোষীকে উপদেশ দিয়ে ও সহানুভূতি দেখিয়ে দোষের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে সতর্ক ক'রে দিয়েও এই শাসনকার্যে শুভ ফল পাওয়া যায়।

(৫) পরীক্ষায় দোষীর নম্বর হ্রাস

শ্রেণীতে যে পরীক্ষা হয় তাতে নম্বর কম দিয়েও দোষীকে শাস্তি দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এ ধরনের শাস্তি বিশেষ ভালো নয়।

(৬) কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেও শাসন করা যায়। অবশ্য এই শাস্তি স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(৭) বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও ফলে দোষীর অবমাননা

এই শাস্তির কার্যকারিতা বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশি ফলপ্রদ হয়। আত্মমর্যাদাবোধ তাদের প্রবল ; সেইজন্য বিপন্ন হওয়ার ভয় তাদের বেশি। এই প্রকার শাস্তি দিয়ে অনেক গুরুদোষেরও সংশোধন হয়।

(৮) দৈহিক শাস্তি

গুরুতর অপরাধ ভিন্ন দৈহিক শাস্তিবিধান না করাই ভালো, বিশেষত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে। যখন তাদের জীবনে সংকট-মুহূর্ত আসে তখন এই রকম শাস্তি অনেক সময় দোষ সংশোধনে সাহায্য না ক'রে অবাঞ্ছিত

আচরণের সৃষ্টি করে। আর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাও তিক্ত ক'রে তোলে।

(৯) জরিমানা

জরিমানা শিক্ষার্থীদের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে ও তাদের অপরাধ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ক'রে তোলে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেক-ক্ষেত্রেই এই শাস্তি শিক্ষার্থীদের না হয়ে তাদের অভিভাবকদের বোঝা হয়।

এ ছাড়া, গৃহকার্য বা অতিরিক্ত পড়া ও লেখা দিয়েও দায়িত্বহীন ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের সংশোধন করা যায়।

বিদ্যালয়ের শেষে আরও কিছু সময় দোষীকে ক্লাসে আটকে রাখাও এক শাস্তি। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষকেরও থাকা দরকার। কারণ, তখন শিক্ষার্থীকে দিয়ে তার উপেক্ষিত বিষয় ঠিক ক'রে নেওয়াই হবে তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শত্রুভাব না জাগে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই রকম শাস্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

শাসনের নীতি ও উদ্দেশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাসন বিদ্যালয়ের অবাঞ্ছনীয় অথচ অপরিহার্য অঙ্গ। শৃঙ্খলারক্ষাই এর উদ্দেশ্য। তাই শাসনকে সব সময় সংযম ও গুরুত্ববোধের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করাই উচিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শাস্তিবিধানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত :

(১) অপরাধের গুরুত্ব ;

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ;

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবৃত্তি ;

(৪) অবস্থা বা পরিস্থিতির তারতম্য অর্থাৎ—স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা।

এই বিষয়গুলি মনে রেখে প্রয়োজন হলে শাস্তিবিধান করা উচিত। সাধারণত, শাস্তি দেওয়ার সময় শিক্ষক ভারসাম্য রাখতে পারেন না। ফলে, প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই, অনেক সময় লঘুপাপে গুরুদণ্ড ও অপরাধীর মনে অনুতাপ না হয়ে একটি বিদ্রোহীর ভাব জেগে ওঠে।

শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়-জীবনে শাস্তিবিধানের কতটা সার্থকতা আছে তা সত্যই চিন্তার বিষয়। প্রচলিত মতে শাস্তিবিধানের মূলে পাঁচটি উদ্দেশ্য আছে ;—রক্ষা, নিবারণ, প্রতিশোধ, ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন। অপরাধীর মনে অনুশোচনার সৃষ্টি ক'রে দোষ সংশোধন করা শাসনের একটি উদ্দেশ্য। তাই এই উদ্দেশ্য-সাধনে শাস্তিবিধানই বাঞ্ছনীয়। এছাড়া শাসনের গৌণ উদ্দেশ্য আছে। অনেক সময় ছাত্রগণ এরূপ অপরাধ করে যা অন্য সহপাঠীদের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত হয় ও বিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করে। এরকম ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়ার জন্য শাস্তির দরকার, যাতে ঐরকম অপরাধের গুরুত্ব বুঝে অন্যান্য ছাত্ররা সতর্ক হয়। এই হবে শাস্তির উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চঞ্চলতার জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্রের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য অপরাধীকে বাধ্য করা ও ভবিষ্যতে এরকম উপদ্রব যাতে না হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেওয়াই এই শাস্তির উদ্দেশ্য।

মোটকথা, বিদ্যালয়ের সকল রকম শৃঙ্খলাবিধানই শাসনের চরম লক্ষ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই শৃঙ্খলাকে যেরূপ শাসন ও বিধান দিয়ে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়, সেরূপ সংগঠনমূলক কার্যের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের উপর কিছুটা শাসন-শৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত ক'রেও অনেক সহজে উদ্দেশ্য সাধন হয়।

শৃঙ্খলা ও সংগঠননীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ

স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শাসন অপেক্ষা সংগঠন-নীতির প্রভাব শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেসব শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ঘরে হয়তো অসহিষ্ণুতা, লঘুচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়, তারাই হয়তো খেলার মাঠে, কোনোরূপ সংঘ-অনুষ্ঠানে বা বিবিধ সংগঠন কার্যে নিয়মনিষ্ঠা ও আজ্ঞানুবর্তিতার পরিচয় দেয়। এই আচরণের মূলে লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব দিলে বা সংগঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত করলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য শিক্ষার্থীর চপলতাকে বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে

একটা দিকে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে কোনো সৃজনাত্মক কার্যে নিয়োজিত করতে পারলে সমস্যার সমাধান আশা করা যায়। সৃষ্টির আনন্দও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের গৌরবকে বর্তমান শৃঙ্খলা-সমস্যার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করলে সুফলেরই সম্ভাবনা। তাই, এই কাজে বিশেষ দক্ষতা, চাতুর্য ও সঙ্কোচহীনতার দরকার।

মূলকথা, আত্মানুশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করতে না পারলে প্রকৃত শৃঙ্খলার আশা করা যায় না।

সংগঠনমূলক কার্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

(১) ক্রীড়াকৌতুক ;
(২) বিতর্কসভা ;
(৩) বিদ্যালয়-পত্রিকা সম্পাদনা ;
(৪) সাহিত্য-সভা ;
(৫) আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ;
(৬) বয়েস্ স্কাউট ও গার্লস্ গাইড ;
(৭) নাট্যসংঘ ;
(৮) স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী।

এছাড়া, অন্য অনেক উপায়ও অবলম্বন করা যায় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তাদের হাতে শাসন ও শৃঙ্খলার ভার নিম্নলিখিত উপায়ে আংশিকভাবে দিলে বিদ্যালয়ের মধ্যে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে ; যথা ঃ

(১) শ্রেণী-পরিদর্শনের ভার শিক্ষার্থীগণের দু-একজনের উপর দেওয়া ; (e. g. Monitor system, Prefect system)

(২) কোনো বিশিষ্ট শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষণীয় বিচিত্রানুষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা-সমিতি ও সামাজিকতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করতে পারলে, নানাভাবে আত্মপ্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে দিতে পারলে, তবেই মাধুর্য এবং সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। বিদ্যালয়-জীবনের অবসর সময়কে ভরিয়ে তুলতে হলে, তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হলে চাই এই সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন।

নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একাধারে শিক্ষামূলক ও আনন্দময়। যে যার রুচি অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ করতে পারে। এক একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও এইসব প্রদর্শনী গ'ড়ে উঠতে পারে। ডাক-টিকিট সংগ্রহ ও নানারূপ নমুনা আহরণ করতে শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়।

বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা

বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে। তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই শিক্ষকের নিত্যনতুন আয়োজন। তাই ইট-কাঠ-যন্ত্রপাতির সমারোহকে বাদ দিয়েও প্রাচীন ভারত বাণী-তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে ঘটেছিল মনীষার স্ফূরণ, প্রতিভার অভ্যুদয়।

আজ বিদ্যালয়ের যে রূপ আমরা দেখি, তার মধ্যে একাধিক শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়াও অনেক কিছু আয়োজনের বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু এমন অনেক বিদ্যা-নিকেতন এই ভারতবর্ষে গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে একজন শিক্ষকের চেষ্টা ও সাধনাই ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ফলে, অনেক বিদ্যালয়েই মাত্র একজন শিক্ষক শিক্ষার আয়োজন করতেন, আর তাঁকে ঘিরেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলোকের সন্ধান মিলত। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য যিনি এই গুরুদায়িত্ব নিতেন সেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'ত একথা চিন্তা করলে আজকের দিনে বিস্ময় জাগে। দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও এই একজন গুরুকে কেন্দ্র ক'রেই বহু শিক্ষার্থীর বিদ্যালাভ হ'ত।

আদর্শের কথা বাদ দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে বহু সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত, শিক্ষার মানসিক মান ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক সেখানে এই শ্রেণী-বিভাগ কি ক'রে সম্ভব হয়, এই প্রশ্নই বারংবার মনে জাগে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা অটুট রাখা একজন শিক্ষকের পক্ষে অসুবিধাজনক। তাছাড়া, বিদ্যালয়কে গ'ড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরস্পর সহযোগিতার প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষাদান-কার্য ছাড়াও অনেক

দায়িত্ব আছে। খেলাধুলোর ব্যবস্থা ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয় জীবন নীরস হয়ে পড়ে। আর অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। তা হলেই প্রশ্ন ওঠে যে, একজন শিক্ষকের পক্ষে কোনো বিদ্যালয়-পরিচালনা কি মোটেই সম্ভব নয়? কিন্তু দেখা যায় যে, এককালে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। একথা বলা যায় না যে, সে-সব বিদ্যালয়ে কোনো কিছুই সার্থক হ'ত না।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে-সব শিক্ষক এই সব গুরুভার নিতেন নানা উপায়ে তাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনের যে পরিকল্পনা প্রচলিত হয়েছে তা সেদিনও ছিল। কারণ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এই সব বিদ্যালয়-পরিচালনা সম্ভব হ'ত। বিভিন্ন ভাবে শিক্ষক এই সহযোগিতা কার্যকরী ক'রে তুলতেন। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর শ্রেণী-পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ত এবং তারাই শ্রেণী-পরিচালনার ভার নিত। কেবল তাই নয়; শ্রেণীর পাঠনও কয়েকটি নির্দিষ্ট ভালো শিক্ষার্থীদের দিয়ে সম্ভবপর হ'ত। অনেক সময় শ্রেণীর মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ বা যাদের মধ্যে কিছু নেতৃসুলভ গুণ দেখা দিত, তাদের সহযোগিতায় রক্ষা হ'ত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলা-পদ্ধতির যেমন সুবিধা তেমন অসুবিধাও আছে।

সুবিধা। অনেক সময় এই পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও নেতৃত্বের উন্মেষ হয়।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ, একাধিক শিক্ষককে বেতন দেবার সমস্যা এখানে নেই।

শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবকাশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রচুর।

অসুবিধা। শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকটি শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দেবার ফলে অনেক সময় নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। শ্রেণীর কয়েকটি নেতৃস্থানীয় শিক্ষার্থী একমাত্র শিক্ষকের আজ্ঞাবাহী হয়ে পড়ে, না হয় অনেক সময়

শিক্ষকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে আসে ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এই কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের দলভুক্ত ব'লে মনে করে।

অর্থনৈতিক সুবিধা সত্ত্বেও যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক, সেখানে শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ একজন শিক্ষকের পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, শিক্ষার্থীরা একাধিক শিক্ষকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ সব সময় পায় না।

আবার অনেক সময় শ্রেণীর নেতারা দলে প'ড়ে নানা অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে থাকে।

শিক্ষার্থীর গোষ্ঠী পরিকল্পনা

আজ শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে পাঠচক্র সংগঠন করবার কথা খুব শুনতে পাওয়া যায়। কারণ, এর ফলে পারস্পরিক আলোচনা ও পরস্পরের আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে। জ্ঞানের দৈন্য পরস্পরের সহযোগিতায় দূরে সরে যায় ও সকলের প্রচেষ্টায় যে-কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। তাছাড়া, এই শিক্ষার্থী-গোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পরিকল্পনাও রূপ দেওয়া যায়। কেবল তাই নয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার আবওহাওয়া সৃষ্টি ক'রে সক্রিয় মনোভাব জাগিয়ে দিলে শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এই সব পরিকল্পনাকে গ'ড়ে তুলতে হবে—যেমন, কোনো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, কোনো স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা (Excursion) বা অনুরূপ কোনো শিক্ষামূলক আয়োজন করা, ইত্যাদি। মোটকথা, এই সব পরিকল্পনা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থীদের রুচি অনুযায়ী ভাগ ক'রে দিয়ে এক-একটি ক্রিয়ার ভার তাদের উপর ন্যস্ত করলে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে শিখতে পারে। এইভাবে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে।

শাসনের অন্যদিক

শাসন ও অনুশাসনের সার্থকতা আছে যদি তার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। অনেক সময় শাসন, শৃঙ্খলার পরিপোষক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, অনেকক্ষেত্রে শাস্তির উদ্দেশ্য হয় গৌণ।

মনের উপর রেখাপাত ক'রে অপরাধ থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করাই হ'ল শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তা ভুলে গিয়ে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি নিয়ে যদি দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়, তবে শাসনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। এতে বিপরীত ফল ফলতে পারে।

অপরাধের প্রবৃত্তিকে দমন করাই হ'ল শাসনের অন্যতম লক্ষ্য। কোনো সময়ে বা অপরাধীর ত্রুটি-সংশোধন শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, আবার কখনো বা শাস্তির উদ্দেশ্য হয় উদাহরণ সৃষ্টি করা। শাস্তির উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, যতক্ষণ তা অপরাধীব চিত্তকে স্পর্শ না করছে ততক্ষণ তা কার্যকরী হতে পারে না। এইজন্য বহু রকমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কখনো অপমান, তিরস্কার, কখনো শ্রেণীতে ছুটির পর আটক রাখা, কখনো জরিমানা, কখনো বা দৈহিক শাস্তি।

শাস্তি মনস্তাত্ত্বিক না হলে অপরাধীর মনে শাসকের বিরুদ্ধে আরও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে, অপরাধপ্রবণতাও বেড়ে যায়।

আবার অতিমাত্রায় শাসন করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। দমনের ফলে নানা বিকৃতি ও বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। তাই সে সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

কেবল শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলারক্ষা সম্ভবপর নয়। যে যার রুচি ও অনুরাগ অনুযায়ী যদি কাজ করতে পারে, যদি প্রত্যেকের শক্তি ও উৎসাহ ঠিকভাবে প্রকাশের পথ পায়, তবে দেখা যাবে যে, অপরাধপ্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অভিভাবক ও শিক্ষকের যথাযথ নির্দেশ ও সহানুভূতির অভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে হতাশা ও পরে নানা বিকৃতি দেখা দেয়। তাই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানসিক বিকৃতির জন্যে বেশি দায়ী শিক্ষার্থীর পরিবেশ।

বিদ্যালয় জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্থান

বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মানুষকে এই প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। বাস্তবের এই চিত্র কঠোর হলেও সত্য। তাই শৈশব

থেকেই ভাবী জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্দেহ জাগলেও তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যে যার নিজস্ব যোগ্যতা ও মূল্য অনুযায়ী সমাজে আসন ক'রে নেয়। তাই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এক রকম অসম্ভব।

বিদ্যালয়-জীবনেও এই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঁকি দেয়। সেখানেও ভালো-মন্দ, নির্বোধ-বুদ্ধিমানের পৃথক মর্যাদা দেওয়া হয়। তাছাড়া, বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি এই প্রতিযোগিতাকে পরিপুষ্ট করেছে। কিন্তু সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া ও সমানভাবে দেখা গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা। তবু ও মানুষে মানুষে পার্থক্য না দেখা দিয়ে পারে না। আর এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি ক'রে কেবল বিদ্যালয়ে কেন, সবক্ষেত্রেই মানুষের মূল্য যাচাই করা হয়।

আদর্শের দিক থেকে প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে এর মূল্যকে স্বীকার করতেই হবে। কারণ, প্রতিযোগিতার মনোভাবই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কর্মঠ ক'রে তোলে। বিদ্যালয়েও একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়া থাকলে তা শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা যোগায়, তাকে অধ্যবসায়ী ক'রে তোলে।

কোনো একটি শ্রেণীতেও দেখা যায় যে, কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের উন্নতির জন্যে বিশেষ যত্নবান হয়। প্রতিযোগিতাই কর্মোৎসাহকে উদ্দীপিত করে।

বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ

শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি—(১) বাহ্যিক ও (২) আত্মিক (স্বতঃস্ফূর্ত)। বর্তমানে আত্মিক শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এর ফলে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে। বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একগুঁয়েমি; এ থেকেই সে হ'য়ে ওঠে বিশৃঙ্খল।

শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নানা কারণে—(১) সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব: কদর্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর রুচিরও অবনতি ঘটতে বেশি সময় লাগে

না। দিনের পন দিন সে একে একে স্বাভাবিকতা থেকে দূরে চলে যায় এবং মন ভ'রে যায় কদর্য আকাঙ্খায়।

(২) বিশ্বপরিস্থিতির অবনতি : পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে জটিলতা ও সমস্যা বেড়ে চলেছে। এইসব জটিলতা ও সমস্যার মধ্য থেকেই শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটে।

(৩) গৃহ : সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিবেশ বর্তমানে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়।

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিদ্যালয়-পরিবেশ এই বিশৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শিক্ষার্থীর চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও অপ্রীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

(৫) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেই আংশিকভাবে এর জন্যে দায়ী করা যেতে পারে। সমাজে ধর্মানুষ্ঠানের ক্রম-অপসারণের ফলে নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে অনেকাংশেই অজ্ঞাত থেকে যায়।

(৬) বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষার্থী তিলে তিলে বিশৃঙ্খলার অভ্যাস গ্রহণ করে এবং বিদ্যালয়-জীবনেও সেটি প্রকাশ করে।

(৭) গুরুভার পাঠ্যসূচী—বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৮) ছাত্রসংখ্যার আধিক্যবশত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবহেলিত শিক্ষার্থী অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(৯) বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যায়। কেননা, শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়—শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশি থাকে না।

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ থাকে। তখন শিক্ষার্থী পাঠে না পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক। তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল্যও

এর জন্য দায়ী। শিক্ষার্থী পাঠে আগ্রহ দেখায় না, বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে ; কারণ, শিক্ষালাভ করেও তাকে হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে।

বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সুস্থ পরিবেশে শিক্ষার্থী দেহ ও মনে স্বভাবতই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাস বর্জন করে।

(২) বিদ্যালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় ক'রে তুলতে হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে—তবেই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে নিজের ব'লে সহজে গ্রহণ করতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে নিজেকে সহজেই সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলো, উৎসব, অভিনয়, তর্ক-সভা, আলোচনা-সভা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

(৩) শিক্ষা-পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দূর করতে হবে ; পাঠ্যবস্তুকে সরস ও সুন্দর ক'রে তুলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

(৪) প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে—তবেই প্রত্যেকের প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হবে।

(৫) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

(৬) শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি ও আস্থা প্রদর্শন করতে হবে।

(৭) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব যদি শিক্ষার্থীর উপরে দেওয়া যায় তবে দায়িত্ববোধই তাকে ক্রমশ সুশৃঙ্খল করে তুলবে।

কি উপায়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ?—

শৃঙ্খলাবোধকে জাগ্রত করতে হলে বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, আজ সমাজ সংসারের চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নীতি ও আদর্শের প্রভাব ক্রমশ কমে আসছে। ফলে, বৃহত্তর সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা শিক্ষার্থী-চিত্তের স্থৈর্য ও সামঞ্জস্যবোধকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী-সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হ'ল শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের অভাব। বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষক-সমাজ অন্নসংস্থানের জন্যে এতই উদ্‌ব্যস্ত যে, তাঁদের অনেককে দ্বারে দ্বারে উপশিক্ষকতার জন্যে ঘুরতে হয় ও অন্যান্য অনেক অসম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। ফলে, শিক্ষার্থীর উপর তাঁদের প্রভাব কমে যায়। তৃতীয়ত, উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়; তাদের প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে অবাঞ্ছনীয়ভাবে। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগের অভাব ও ঔদাসীন্য এই বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ।

পাঠ্যবস্তুর প্রতি অনুরাগের অভাবের জন্যে দায়ী কে? শিক্ষক, শিক্ষার্থী, না পরিবেশ? দায়ী যেই হোক না কেন, পাঠ্যবস্তুকে যদি শিক্ষক আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেন তবে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে; এর জন্যে শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিও অধিক দৃষ্টি দিতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, চপল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তির প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট অবকাশের সৃষ্টি করা। কারণ, প্রাণশক্তির অপপ্রয়োগের ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এইজন্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব-বোধকে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। তাদের হাতেই তাদের শাসন-শৃঙ্খলার ভার আংশিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এইজন্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে শিক্ষার্থী-নেতা তৈরি করা ও তার অধীনে একটি ক'রে ছোটখাট সমিতি-গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া, নানা সৃজনাত্মক কাজে তাদের নিয়োজিত করতে পারলে এই কঠিন সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যতদিন একটা নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে না উঠবে ততদিন পূর্ণ শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কম। মোটকথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সবল মন যাতে শৈশব থেকে গ'ড়ে উঠতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হ'লে চাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক, অনুকূল পরিবেশ ও আত্মপ্রকাশের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা।

বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র

সভ্যতার ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে, আজকের অবস্থা একদিনে আসেনি। একক জীবন থেকে দলবদ্ধ জীবনের অবস্থা বহুদিনের আয়াসসাধ্য সাধনার ফল। একদিন সে ঘর বাঁধতে শিখল, আর তাকে ঘিরে সমাজের প্রতিষ্ঠা হ'ল। সেই সমাজের ছায়া পড়ল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমন কি বিদ্যালয়-জীবনেও। বিদ্যালয় হ'ল একটি ছোট্ট সমাজ বা সমাজেরই প্রতিরূপ ; সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলারও প্রয়োজন আছে, আছে শিক্ষানীতির প্রয়োজন। আর তাকে রূপ দেবার দায়িত্ব হ'ল শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জীবনের দায়িত্বই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর এসে পড়ে। তাদের ভাবী জীবনের প্রস্তুতির জন্যে বিদ্যালয়ে বৈচিত্র্যের আয়োজন। কেবল নাগরিক তৈরি করাই নয়, আদর্শ মানুষ তৈরি করাও এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

বিদ্যালয়ে শাসন-প্রণালীর বিবর্তন। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে বিদ্যালয় মুক্ত নয়। তাই বোধ হয়, রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে শাসনপদ্ধতির ইতিহাস সমান্তরালভাবে চলেছে। সব-ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, এমন কি পারিবারিক জীবন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যেন একই সূত্রে বাঁধা। তাই বিদ্যালয়ে শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একদিন ছিল একনায়কত্বের যুগ। রাজতন্ত্রই ছিল সেখানকার একমাত্র ব্যবস্থা। তার আদেশ-নির্দেশ পালন করতেই হবে—এই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। কারও কিছু বলবার ছিল না সেখানে। বিদ্যালয়-জীবনেও শিক্ষকের একনায়কত্ব বহুদিন টিঁকে ছিল। তার একাধিপত্যকে প্রশ্ন করবার মতো কেউ ছিল না। নতমস্তকে প্রধান শিক্ষকের আদেশের অনুবর্তী হওয়াই শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ ছিল।

একে একে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল। বিদ্যালয় যতই বিস্তৃত হতে লাগল, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা ততই ভিড় করতে লাগল। শেষে প্রধান শিক্ষকের শক্তি খানিকটা খর্ব হ'ল। অন্যান্য সব শিক্ষকের উপর আংশিক দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় সহকারী শিক্ষকবৃন্দের

সহযোগিতা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। এই ব্যবস্থা পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও প্রধান শিক্ষকই প্রশাসনের অধিকারী রইলেন। শিক্ষার্থীদের অবস্থার কিন্তু কোনো উন্নতিরই লক্ষণ দেখা গেল না। তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে ঔদাসীন্য রয়েই গেল। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই একটি বয়স্ক ও পড়াশুনায় ভালো শিক্ষার্থী বেছে নিয়ে শ্রেণীকক্ষের শাসন বজায় রাখা ও পড়াশুনা দেখার ভার দেওয়া হ'ত। এই প্রথায় একজন শিক্ষক একসঙ্গে একাধিক শ্রেণীতে তত্ত্বাবধান করতে পারতেন। প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। ইংরাজীতে একে বলা হয় Monitorial system বা 'সর্দার প'ড়ো' ব্যবস্থা। এণ্ড্রু বেল দক্ষিণ ভারত থেকে এই প্রথা শিখে গিয়ে ইংল্যাণ্ডে চালু করেন। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের উপর নানারকম মামুলি ধরনের কর্তব্যের ভার দেওয়া হ'ত। ফলে, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা গণতন্ত্রের আবহাওয়ার সঞ্চার হ'ল। ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ আর্নেণ্ড রাগবি স্কুলে এই Monitorial প্রথার ব্যাপক প্রচলন করেছিলেন এবং তাতে সুফলও হয়েছিল। অনেকে একে আমলাতন্ত্রও বলতে পারেন। কারণ, এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অহেতুক ভেদাভেদ দেখা দিতে থাকে। এই জাতিভেদের ফলে ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দেয়, আর তার পরিণতি হয় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

আজকের দিনে রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের নির্বাসন ঘটেছে ; তার বদলে দেখা দিয়েছে গণতন্ত্র। আর সেই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থাও চলেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী সামগ্রিক বিদ্যালয়-জীবনের কার্যভার দেওয়া এই গণতন্ত্রের লক্ষ্য।

বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিচয় নিলে দেখা যায় যে, এখনও এই গণতান্ত্রিক-পদ্ধতি আমাদের বিদ্যালয়ে ঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। অবশ্য এর কারণও যথেষ্ট আছে। গণতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের জীবনধারার মিল না থাকার জন্যে অনেক সময় বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। চিন্তায় কর্মে গণতন্ত্র এখনও আমাদের কাছে স্বপ্ন। যতদিন এই আদর্শ আমাদের আচরণে প্রতিফলিত না হবে ততদিন বহু সমস্যা থেকেই যাবে।

স্বায়ত্তশাসনের প্রকারভেদ। যে-কোনো সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ধারায় গণতন্ত্রের অন্যতম ধারক স্বায়ত্তশাসন প্রথাকে বিদ্যালয়-জীবনে প্রবর্তিত করা যেতে পারে। যেমন—

(ক) অনির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা (Informal Type);
(খ) নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা (Specific Service Type);
(গ) সরল পরিষদ্ প্রথা (Simple Council Type);
(ঘ) জটিল পরিষদ্ প্রথা (Complex Council Type);
(ঙ) বিদ্যালয়-নগরপদ্ধতি প্রথা (School City Type)।

এই প্রথাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন শিক্ষাবিদ্ P. W. Terry। তাঁর মতে উপরোক্ত পাঁচটি প্রথায় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োগ ঘটলে তা বেশ কার্যকরী হতে পারে। এই প্রথাগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

(ক) অনির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা। অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বেছে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজে লাগান, যেমন—পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বার্ষিক খেলাধুলো, রবীন্দ্র-জয়ন্তী ইত্যাদি। এই নির্বাচন অনেক সময় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিদ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া, এইরূপ নির্বাচনের ফলে নানা পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা কমে যায় এবং সবার উপরে শিক্ষকের কর্তৃত্ব বজায় থাকবার জন্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব গ'ড়ে উঠতে পারে না। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে এই প্রথার তাই বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তবে প্রধান শিক্ষকের স্বৈরশাসনের চেয়ে এই প্রথার প্রয়োগমূল্য যে খানিকটা বেশি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(খ) নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা। এই প্রথার মধ্যে স্থায়ী ধরনের নির্বাচন বেশি কাজ করে। যেমন—পাঠাগার পরিচালনা, বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশের সম্পাদনা ইত্যাদি স্থায়ী ধরনের কাজের ভার অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই নিয়মিত সাহায্যের আহ্বানে সকলে সাড়া দিলেও তার মর্যাদা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে অনুরূপ কাজের সংখ্যা খুবই নির্দিষ্ট।

(গ) সরল পরিষদ্ প্রথা। শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের উপর ভিত্তি

ক'রে কোনো স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে না। সেইজন্যে শিক্ষার্থী-পরিষদ্ গঠনের প্রশ্ন আজ এসেছে। নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে কাজ ক'রে যাওয়া ও নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের প্রয়োগ করাই এইসব শিক্ষার্থী-পরিষদের একটি কাজ। এই শিক্ষার্থী-পরিষদ্ কয়েকটি উপসমিতির উপর কাজের দায়িত্ব বণ্টন ক'রে দেবেন আর এই উপসমিতি-গুলির মধ্যে যোগাযোগ থাকবে কেন্দ্রীয় পরিষদের মাধ্যমে। এইভাবে বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্য-নিরপেক্ষ কাজ ক'রে যাওয়ার ফলে অনেক সময় একই ধরনের কাজের অযথা পুনরাবৃত্তি হয় ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে। সেইজন্য এই শাসন-প্রথা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশেষ ফলপ্রসূ নয়।

(ঘ) **জটিল পরিষদ্ প্রথা**। আজকের দিনে শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেকে অনেকদূর তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান। শুধু পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ না রেখে বিদ্যালয় পরিচালনার সব কিছু ভারই তাঁরা শিক্ষার্থী-পরিষদের উপর ন্যস্ত করতে চান। তাঁদের মতে দুইটি শ্রেণীপরিষদ্ গঠন করা যেতে পারে—এক, বিচার-পরিষদ্; দুই, কর্মপরিষদ্। বিদ্যালয়-পরিচালনায় আইন-কানুন থেকে শুরু ক'রে সবকিছু খুঁটিনাটি কাজ করিয়ে নেবার দায়িত্ব এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এই পরিষদ্‌কে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—আপার হাউস ও লোয়ার হাউস। কাজের সুবিধের জন্যে এই দুটি পরিষদের পত্তন করা হলেও এর মধ্যে অনেক জটিলতা এসে পড়ে। ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই জটিল পরিষদ্ প্রথা প্রয়োগ কতটা সম্ভব তা বিবেচ্য।

(ঙ) **বিদ্যালয়-নগরপদ্ধতি প্রথা**। বিদ্যালয় যেন একটি মহানগর, সেখানে সবকিছুরই দায়িত্ব রয়েছে। এই শিক্ষালয়-রূপ নগরের যে পৌরসভা তার পরিচালনার ভার থাকবে শিক্ষার্থীদের উপর। এতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আসবে। বাস্তবের মুখোমুখী হতে শিখবে শিক্ষার্থীরা ও ভবিষ্যতে পৌরসভার সমুদয় দায়িত্বভার তারা গ্রহণ করবে। বিদ্যালয় থেকেই আদর্শ নাগরিক গ'ড়ে উঠবে। সেখানেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পত্তন হবে। হয়তো ভুলত্রুটি কিছু হবে কিন্তু সেই ভুলের মধ্য দিয়েই ভুলের

সংশোধন হবে। এই প্রথাটির পরিকল্পনার মধ্যে গণতন্ত্রের একটা পরিণতি ঘটেছে একথা বলতেই হবে। এর মূলে আছে কয়েকটি চিন্তা। সবক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী-গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে। আর তার ফলও মোটামুটি সন্তোষজনক বলতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় কিছু কিছু গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উইলিয়ম আর. জর্জ এই পরিকল্পনায় এমন একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে শিক্ষার্থী-পরিষদের হাতে সবকিছু ক্ষমতাই একে একে ন্যস্ত হ'ল। যদিও কতকগুলি অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই জুনিয়ার রিপাবলিক বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তবুও দেখা গেল যে, পরিশেষে অপরাধ-প্রবণ শিক্ষার্থীদের আচরণে সমূহ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মানুষের মধ্যে যে সৎ বৃত্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন, আর সে স্বপ্ন তিনি সার্থকও করেছিলেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান বিদ্যালয়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি শিক্ষায়তনে অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নানারকম মানসিক বিকৃতি ও বৈক্লব্য এই সব শিক্ষার্থীর জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? মানুষ যখন প্রথম জন্ম নেয় তখন সে পবিত্র। তারপর পরিবেশ ও শিক্ষা তার মনের গড়নকে রূপায়িত করে। এই অপরাধপ্রবণতা যে আজ বেড়ে চলেছে এর মূলে আছে পরিবেশের অভাব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটেছে। তারা জানে না, তাদের ভবিষ্যৎ কি? তার উপর শিক্ষালয়ের কোনো সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ নির্দেশ নেই। চারিদিকে সংঘাত ও সংঘর্ষ; আদর্শের অভাব। এর ফলে দুষ্ট ব্যাধির মতো আমাদের সমাজে অপরাধপ্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিয়মনিষ্ঠা, সমাজচেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ, আত্মসংযম ও মানবপ্রীতির বীজ শৈশব থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে না ছড়াতে না পারলে এই সমস্যা সমাধানের আশা সুদূরপরাহত।

চার

বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক

শিক্ষায় স্বাধীনতা

শিক্ষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আজ অনেক নতুন চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে। শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছে। তাই চলেছে গতানুগতিক শিক্ষারীতির মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের প্রচেষ্টা। যাতে আনন্দ ও স্ফূর্তির সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না ঘটে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি এখন সজাগ। সহানুভূতি ও সমবেদনা শিক্ষাকে সহজ ক'রে তোলে, শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমিয়ে আনে।

স্বাধীনতা বলতে এখানে স্বেচ্ছাচার বোঝায় না, বোঝায় প্রাণের সহজ স্ফূর্তি। যে যার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে—এই হ'চ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনতার মূলকথা। যাঁরা এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাঁদের মতে—স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হ'লে বিকাশ হবে ব্যাহত, শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ বিশ্বাসের পিছনে অনেক মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে। ফ্রয়েবল শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণায় স্বাধীনতার ফলাফল প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। এঁর মতো অন্যান্য মনীষীদের গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। তাঁদের মতে শিক্ষার্থীর চল-চপল চিত্তকে শাসন-শৃঙ্খলার চাপে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুদের প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ ক'রে না দিয়ে তাকে নানা খাতে বইয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষায় আত্মপ্রকাশ

নানাভাবে শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রকাশের পথে সহায়তা করতে হবে। তাই সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থাও করবার প্রয়োজন।

বিদ্যালয়-জীবনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাকে আনন্দের বস্তু ক'রে তুলতে পারলে, তবেই সুফল ফলবে। চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করাই হবে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ নানাভাবে দেওয়া যায়।

পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা ও প্রকাশ, চারুশিল্পের প্রদর্শনী, বিতর্ক-সভার আয়োজন, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, অভিনয়, পত্রিকা-সম্পাদনা ও নানারূপ সংগঠনমূলক কার্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আজকের শিক্ষায় যা-কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে রসের কার্পণ্য দেখা দিয়েছে। ফলে, শিক্ষা আনন্দময় না হ'য়ে—হ'য়ে ওঠে গতানুগতিক ও প্রাণহীন। তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীর মতে শিক্ষার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ পরিবেশন করা উচিত। কারণ মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির প্রেরণা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়া বা কোনোরূপ কার্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক, ছন্দোময়। বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই।

কাজে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে ওঠা উচিত। সহপাঠীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ও হৃদ্যতাই শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলবে। তবেই হবে মানব-প্রীতির উদ্বোধন, তবেই জাগবে বিশ্ব-প্রীতির মহান্ আদর্শ।

বিদ্যালয়-জীবনের সামাজিক দিক

বিদ্যালয়ের শ্রেণীর বাইরে নানারূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক চেতনার উন্মেষ সাধন করা একান্ত কাম্য। শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যাতে সমাজকে ও দেশকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলবার জন্যে এই আয়োজন। এই বিরাট দায়িত্বের অংশ বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। পল্লী-উন্নয়নের কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, জনসেবার আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত করা ও "স্কাউটিং" বা একসাথে কোথাও গিয়ে তাঁবুতে বাস করা বা কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের কাজ কেবল শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। কিভাবে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের মৌলিকতার উপর। নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর মনকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

খেলা। সুস্থ শিক্ষার্থীদের খেলা স্বাভাবিক ধর্ম। খেলায় তারা আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশি, তাই খেলতে তারা ভালোবাসে। খেলায় দৌড়, লাফ প্রভৃতি প্রধান দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাদের শরীর সুগঠিত হয় ও তারা শক্তিমান হয়। খেলার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় এবং নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। কাজেই খেলা সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক। সততা, সংযম, নিশ্চয়তা, ক্ষিপ্রতা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্রগঠনের আবশ্যক গুণগুলি খেলাতে দরকার হয়। খেলার ভেতর দিয়ে এসব অভ্যাসে পরিণত হয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। সুতরাং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্যে খেলার ব্যবস্থা অপরিহার্য।

খেলাকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি বড় রকমের খেলা। আর যে-সব খেলাতে কম জায়গা দরকার, নিয়মাবলী অতি সরল বা উপকরণও খুব সংক্ষিপ্ত, সেই সব খেলাকে ছোট খেলা বলা যেতে পারে। খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে শিক্ষার্থীদের কাছে তার আকর্ষণ বেশি। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাতে শিক্ষার্থীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে শেখে। তারা বুঝতে পারে যে, দলকে বিজয়ী করতে হ'লে একজনের দ্বারা তা সম্ভব নয়। খেলার মাধ্যমে তারা শেখে সহযোগিতা। আত্ম-প্রাধান্য দেখাবার চেষ্টা না ক'রে দলের জন্যে প্রত্যেকে তার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য করতে অভ্যস্ত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্যে আন্তঃবিদ্যালয় খেলা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রতিযোগিতার মধ্যেই যদি বিদ্যালয়ের খেলার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে, তা হ'লে অন্য সব শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। যাতে বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী খেলায় অংশ গ্রহণ ক'রতে পারে, কার্য-তালিকা সেরূপ হওয়া উচিত। সকল শিক্ষার্থীর মঙ্গল-বিধানই বিদ্যালয়ের কাম্য। প্রতিযোগিতার ভাব বজায় রেখে বিদ্যালয়ে খেলার ব্যবস্থা করতে হ'লে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণকে এমনভাবে ভাগ করতে হয় যাতে একই বয়স ও শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বিদ্যালয়কে প্রথমত কয়েকটি 'হাউস'এ বিভক্ত করা। বয়স, উচ্চতা, ওজন বিবেচনা ক'রে প্রত্যেক হাউস 'সিনিয়র', 'ইন্টারমিডিয়েট' ও 'জুনিয়র' এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হয়। এতে প্রত্যেক 'হাউসের' প্রত্যেক

শাখা পরস্পর বয়সানুযায়ী খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। প্রত্যেক 'হাউস'ই একজন শিক্ষকের অধীনে থাকবে ; তিনি হবেন 'হাউস মাষ্টার'। খেলা যাতে সুপরিচালিত হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাতে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রেষারেষি, প্রতিহিংসার ভাব না জাগে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। 'হাউস'গুলির নাম আমাদের দেশের মনীষীদের নাম অনুযায়ী হ'লে ভালো হয়। ঋতু অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হাডুডু, হিন্দুস্থান বল, হকি প্রভৃতি খেলাতে আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বড় (সিনিয়াররা) বড়দের সঙ্গে, মাঝারী (ইণ্টারমিডিয়েট) এবং ছোট (জুনিয়ার) যথাক্রমে মাঝারী এবং ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। প্রত্যেক খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ হবে। বৎসরান্তে অধিকসংখ্যক 'পয়েণ্ট' অর্জনকারী 'হাউসকে' চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে হবে।

মজলিস, মেলা, এক্সকারশন। শিক্ষার্থীদের অনেকের ভিতরই কোনো-না-কোনো বিষয়ে বেশ শক্তি-সামর্থ্য থাকে। তাদের সেই সব সামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। মজলিসে তারা সেই সুযোগ পায়। কাজেই বিদ্যালয়ের কার্য-তালিকায় ক্যাম্পিং-এর স্থান থাকা যুক্তি-যুক্ত। ক্যাম্প বা মজলিস হবে উন্মুক্ত স্থানে এবং দু'একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চালিত হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গান, আবৃত্তি, অভিনয়, কৌতুকাভিনয় বা কৌতুকপ্রদ খেলা করে। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এতে অংশ গ্রহণ করবে। এতেও কাজের মান অনুযায়ী পয়েণ্ট দেবার ব্যবস্থা থাকবে। কোন 'হাউস' কি দেখাবে বা কি বলবে তার একটি তালিকা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে দেবে। শিক্ষক মহাশয় তা থেকে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয় অনুমোদন করবেন। নির্দিষ্ট দিনে সব শিক্ষার্থী মাঠে 'হাউস' হিসাবে অর্ধ-গোলাকৃতি হ'য়ে বসবে। শিক্ষক মহাশয় পূর্ব-তালিকা অনুযায়ী এক এক 'হাউস'কে পর পর তাদের অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করবেন। এতে ছেলেরা শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পায় ও প্রচুর আনন্দ ভোগ করে। যাতে একঘেয়ে বা ক্লান্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে এঁদের দিয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান করাবেন বা কিছু খেলতে দেবেন।

প্রতি বছরে একবার স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা দরকার। এই সপ্তাহে থাকবে প্রদর্শনী বা মেলা। তাতে পোষ্টার, মডেল প্রভৃতির দ্বারা নানা কাজ দেখানো যেতে পারে। সোজা দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি বা দাঁড়াবার দোষে যে রকম দেখায় সেগুলির ছবি কিংবা মডেলের সার্থকতা আছে। উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ছবি ও মডেলের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু ফিল্মও দেখানো দরকার। বিশেষজ্ঞদের এক এক বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখবে। তাদের উপর নানা কাজের ভার থাকবে। কর্মকর্তাও তাদের থেকে নির্বাচিত হবে। প্রতি বিষয়ে এক একজন শিক্ষক-তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি 'হাউসে' স্বাস্থ্য-ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার্থীরাই এই ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন 'হাউস মাষ্টার' বা 'ক্লাস মাষ্টার'। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা এ সম্বন্ধে কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা কিরূপ পরিবেশে বাস করে সেগুলো স্বচক্ষে দেখা ও তার সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, চিকিৎসা-কেন্দ্র, জলসরবাহ স্থান, গ্রামের কুপ, বাজার প্রভৃতি স্থান দেখলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। কোন অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তারও একটা ধারণা জন্মাবে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের এ-সব স্থান দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন কোন প্রতিষ্ঠান কিরূপ কাজ করছে সে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে রেড ক্রস সোসাইটির স্বাস্থ্য-বিভাগ, কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ প্রভৃতি পরিদর্শন করা কর্তব্য।

আনন্দ উৎসব। বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। বিচিত্রানুষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা-সমিতি ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্তশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। নানাভাবে আত্ম-প্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে

দিতে পারলে তবেই তাদের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। বিদ্যালয়-জীবনের অবসর-মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলতে হ'লে, তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হ'লে, চাই এই সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন, চাই নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা যা একাধারে শিক্ষামূলক ও আনন্দময়। যে যার রুচি অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ করতে পারে। এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও এই সব প্রদর্শনী গ'ড়ে উঠতে পারে। ডাক-টিকিট-সংগ্রহ ও নানারূপ নমুনা আহরণ করতে শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়।

গোষ্ঠীজীবন ও বিদ্যালয়

বিদ্যালয়কে জনশিক্ষা বিস্তারের একটা বিশেষ কেন্দ্র বলা চলে। দেশের অধোগতির মূলে রয়েছে সাধারণের অজ্ঞতা। তাই এখন জনশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর সমাজই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। জনসাধারণ সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশের অন্যতম অংশরূপে শিক্ষার্থীকে ঘিরে রয়েছে। শিক্ষার ফলে জনসাধারণ যদি রুচিবান্, ন্যায়পরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাহ'লে তার একটা সামগ্রিক প্রভাব শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করবে।

জনশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ যাতে অনুকূল হয়, যাতে সামগ্রিক উন্নতি সহজ হয়ে ওঠে, সেটাই হবে লক্ষ্য। একদল স্বার্থবুদ্ধিহীন সেবাব্রতী গ্রামে গ্রামে বিদ্যাবিতরণ ক'রে ও নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদির সাহায্যে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে প্রচার ক'রে বেড়াবে। এই দায়িত্ব শিক্ষকদেরই গ্রহণ করতে হবে।

অবসর সময়ে আলোকচিত্র, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে গোষ্ঠীজীবনে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সঞ্চারিত করা যায়। শহরাঞ্চলেও একইভাবে স্বাস্থ্য-সমস্যা ও সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করা যেতে পারে।

যে যে বিদ্যালয়ে কৃষিশাখার প্রবর্তন করা হয়েছে, সেই সব বিদ্যালয়ে সমাজগোষ্ঠীকে কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা সহজ। তাছাড়া স্বতন্ত্র কেন্দ্র হিসেবেও সমাজ-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবার

জন্য বিদ্যালয়গুলো সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করতে পারেন। কিরূপে দলগতভাবে যৌথপ্রক্রিয়ায় এই কাজ সম্ভব হতে পারে, তা স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভাবন করতে হবে। এইভাবে বিদ্যালয়ই হয়ে উঠবে সমাজের প্রাণ-কেন্দ্র।

জনশিক্ষার প্রসারের জন্য এই বিদ্যালয়গুলোতেই নৈশ শিক্ষা-ব্যবস্থা করা সম্ভব। নৈশবিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করবেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং তাঁদের সহযোগিতা করবে বয়স্ক শিক্ষার্থীরা। এইভাবে শিক্ষকদের নেতৃত্বে, বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জনশিক্ষার কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না পড়ে তার জন্য সমাজের যেসব মূল কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক দিক আছে, সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করবার জন্য তাদের সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তোলা দরকার। নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ক'রে তোলা, কিছু কিছু সাহিত্যবোধ জন্মানো, অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চার সম্বন্ধেও অনেক কিছু করবার আছে। কতকগুলো বিষয় বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সমাজ-শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করেছে। তাদের কাজগুলো যাতে সম্প্রসারিত হয়, তার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। খেলাধুলো ও কৃষিবিষয়ে নানারূপ প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবস্থা ক'রে ও প্রদর্শনী বিভাগ খুলে সমাজবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়। অবসর-বিনোদনের জন্য বিদ্যালয়ের হলঘরে নাটকাদির অভিনয় ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা ক'রে সমাজবাসীকে রুচিসম্মতভাবে সুস্থ জীবনযাত্রার অভ্যাস গঠনে সাহায্য করলে সুফল হয়। যৌথ কাজকর্মের মাধ্যমে বর্তমান সমস্যাগুলোর নিরসনের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলে বা সমবায় প্রথায় অন্যান্য দ্রব্যাদির উৎপাদনে এবং ধর্ম-গোলা পরিচালনায় অভ্যস্ত করা যায়। এইসব করতে গেলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রথমে অভিভাবক এবং অন্যান্য সমাজকর্মীদের সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হ'তে হয়। সুতরাং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেই উদ্যোগী হয়ে অভিভাবক সমিতি ও সমাজকর্মী সমিতি গঠন ক'রে তাদের বিভিন্ন আলোচনায় যোগদানের ব্যবস্থা ক'রে নতুন পথের সন্ধান দেবেন।

শ্রেণীবিন্যাস

শিক্ষায় শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন আছে কি না এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথা যা আজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তা হ'ল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শক্তির অপচয়। দেখা যায় যে, একই শ্রেণীতে বহু ধরনের ছাত্রছাত্রী এসে ভিড় করে। তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বিশেষ ক'রে শ্রেণীর মধ্যে যখন বিভিন্ন বুদ্ধিস্তরের শিক্ষার্থীদের দেখা যায় তখন সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কেউ বা জড়বুদ্ধি। তারা যদি একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থী হয় তবে সেখানে শিক্ষকের কর্তব্য কি হবে? এইসব নানা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে আজকের শিক্ষাব্যবস্থায়। বুদ্ধি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের নানাদিক কখনও কখনও এত প্রকট হয়ে ওঠে যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এজন্য বহুদিন থেকে বিভিন্ন দেশে শ্রেণীবিন্যাসের প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও এর পূর্ণ সমাধান হয়নি। কারণ, আর একটি দিক এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সেটি হচ্ছে মানবিক দিক। যাঁরা বুদ্ধির দিক থেকে কিছুটা বঞ্চিত তাদের একঘ'রে ক'রে রাখবার যৌক্তিকতা আছে কি না? অনেকেই বলবেন যে, শিক্ষায় গণতান্ত্রিক লক্ষ্য যদি পালন করতে হয় তবে সকলকেই তার ব্যক্তিগত মর্যাদা দিতে হবে, সকলকেই নিয়ে পরিপূরক শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ কিছু ভালো শিক্ষার্থীর সঙ্গে কিছু নিম্নমানের শিক্ষার্থীর যোগাযোগ করলে নিম্নমানের উপকার হতে পারে। এই ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষাদান চলতে পারে, এই হ'ল এক দলের যুক্তি। এ যুক্তির পেছনে মহান্ আদর্শ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই দেখা দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে, যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা কেন অগ্রগামীদের পেছনে টানবে? তাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করার কোনো মানবিক অধিকার তাদের আছে কি না,—এই ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ছাড়াও একটা সামাজিক প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। যারা মেধাবী, যাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি লুকিয়ে আছে তাদের আরও এগিয়ে দিতে হবে—যাতে তারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। তাই পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমাদের যেমন সমস্যা, তেমনি সমস্যা হ'ল যারা প্রতিভাবান তাদের নিয়েও। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠন ও শিক্ষাধারা

এই দুই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কারও বিশেষ উপযোগী হয় না। অথচ তাদের জন্যে কোন পৃথক শিক্ষাব্যবস্থাও আমাদের দেশে নেই। যা সাধারণ শিক্ষার্থী-সমাজের জন্য প্রচলিত তাও ত্রুটিপূর্ণ। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ব্যক্তিত্বের সমস্যা। কিভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিককে বিকশিত করা যায়, কিভাবে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো যায়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তার কতটুকু আয়োজন করেছে, এমনি নানা প্রশ্ন স্বতই মনে আসে। তারপর যখন আমাদের দেশের স্থানীয় সমাজ, আর্থিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা মনে হয়, তখন বোঝা যায় যে, এই বিরাট দেশে সমস্যাও বিরাট। এজন্যে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যকে বিসর্জন না দিয়েও শিক্ষাব্যবস্থায় একটা সামঞ্জস্য আনা যায় কি না ভেবে দেখতে হবে। তাই শ্রেণী-বিন্যাসের সার্থকতা আছে বলে মনে হয়। কিভাবে এই শ্রেণীবিন্যাসে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তা ভাববার কথা।

শ্রেণীবিন্যাসের রীতি। শ্রেণীবিন্যাসের রীতি আলোচনা করার আগে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা দরকার। আগেই বলেছি যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়াই শ্রেণী-বিন্যাসের লক্ষ্য। এজন্য শিক্ষার্থীদের কোনো-না-কোনো ভিত্তিতে একই শ্রেণীর ভিন্নধারায় ভাগ ক'রে ফেলার প্রয়োজন। কেবল শ্রেণীপাঠনই নয়; সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে তাদের শিক্ষামূলক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করা যায় সেটাও ভাববার কথা। উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে আসে তাদের কেবল বুদ্ধিগত পার্থক্যই বড় নয়, তাদের রুচি, গৃহ-পরিবেশ একেবারেই বিভিন্ন। তাই একই শ্রেণীতে এইসব শিক্ষার্থীকে সমবেত করলেও নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন, সামাজিক জীবনে শিক্ষার্থীরা মেলা-মেশার ফলে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু এই মেলা-মেশার মাধ্যমে যদি হৃদ্যতা গ'ড়ে না ওঠে, তবে একটা পারস্পরিক ব্যবধানের সূচনা হয় ও সেটা দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এটি একটি বিশেষ সমস্যা সন্দেহ নেই। এছাড়া, বুদ্ধির স্তরের দিক থেকেও বিচার করলে দেখা যায়, শ্রেণীবিন্যাসে নানা সমস্যা এসে পড়ে। তাই প্রধান শিক্ষকের পক্ষে এটি

একটি বিরাট সমস্যা। "Clas-ification, though a necessity, is one of the big difficulties which beset the thorny path of the headmaster."

নানাভাবে শ্রেণীবিন্যাস সম্ভবপর হয়, যেমন—বয়স অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা ধারায় বিভক্ত করা। কখনো বা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী, আবার কখনো পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতি সবক্ষেত্রে উপযোগী, একথা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। সাধারণত, ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। তবে বর্তমানে অনেকেরই ধারণা যে বয়স অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা আজ কমে এসেছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রায় সমবয়সী ছাত্রছাত্রী একই শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এর ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া, বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি, আবেগ ও অনুভূতির যে সমান বিকাশ হয় তাও নয়। তাই বয়সের ভিত্তিকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলা চলে না। বরং বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভিত্তি ক'রে শ্রেণীবিভাগ করলে যে সংহতি ও পারস্পরিক নৈকট্য আসবে তা বয়সের ভিত্তিতে নাও আসতে পারে। তবে শ্রেণীতে একই বুদ্ধির স্তরের সব শিক্ষার্থী থাকলেও তাদের মধ্যে অন্য দিক থেকে ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন—আবেগময় জীবনের দিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার দিক, ইত্যাদি।

অনেকে আবার এই সব ভিত্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রেই শ্রেণীবিভাগ করবার পরামর্শ দেন। সবচেয়ে ভালো ছেলেরা একটি শ্রেণীতে থাকবে, আর যাদের পরীক্ষার ফল খারাপ তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী থাকবে। এই হ'ল তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু এই প্রণালীকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ সমাজে সবরকম লোকেরই সমন্বয় ঘটেছে। ভালো-মন্দ, বুদ্ধিমান-অল্পবুদ্ধি প্রত্যেক রকমের লোক নিয়ে সমাজ। তাই একদলকে প্রাধান্য দিয়ে আর একদলকে বর্জন করা বর্তমান গণতান্ত্রিক নীতির কতটা সমর্থন পাবে তা বিবেচ্য। বরং যার যেটুকু ভালো আছে, যার যেটুকু ঘাটতি

আছে তার সবকিছু সমন্বয়ের ফলে যে সাধারণ মানের সৃষ্টি হবে তা কোনো কোনো দিক থেকে বাঞ্ছনীয়।

দেখা যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রেও আজ এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। কারণ, অন্য যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাক না কেন তাতে মানুষে মানুষে ব্যবধান বেড়েই চলবে। ভবিষ্যৎ সমাজের কথা চিন্তা ক'রে তাই বিদ্যালয়ের শুরু থেকে এই শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর খাড়া করার কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। আজকের দিনে streaming-এর প্রশ্ন নিয়ে বৃটেনে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে। শেষে দেখা গেছে যে, সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এক এক দল এক এক মতকে সমর্থন করেন। যাঁদের মধ্যে মানবিক দৃষ্টি উজ্জ্বল তাঁরা মনে করেন যে, পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রত্যেক মানুষেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, ভালো-মন্দ আছে। তাই সহযোগিতার ভিত্তিতে সকলকে নিয়ে গণ-উন্নয়নের কাজে ব্রতী হওয়া দরকার। আর তা শুরু হবে বিদ্যালয়-জীবন থেকে। সবদিক থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর এই শ্রেণীবিন্যাসের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের ভাবী জীবনের সাফল্যের উপর। কেবল পরীক্ষায় ফলাফলটা একমাত্র মাপকাঠি হবে না। সত্যিকারের নাগরিক হিসাবে তারা যোগ্যতা কতখানি অর্জন করল সেটাও দেখতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী তৈরী করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, সামাজিক জীবনের উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন

সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী

বর্তমানে অনেকে Examination কথাটি তুলে দিয়ে Evaluation কথাটি প্রবর্তিত করার পক্ষপাতী। কারণ পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর প্রতিটি কর্মের মূল্য নির্ধারণ করা এবং সেগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা যাতে তার প্রতিটি দিকেরই ঠিক মূল্য আমরা দিতে পারি। পরীক্ষায় আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কতকগুলি দিকের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তার সামগ্রিক

পরিচয় পাই না। বর্তমানে আবার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের প্রশ্নটি বেশ গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। সেই ব্যক্তিত্ব-নিরূপণ কখনও কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যায় না। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সম্ভাবনাকে জানা এবং তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করাই বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বর্তমানে Evaluation-এর প্রশ্নটি বেশ প্রকট। Evaluation programme-এর চারটি স্তর থাকবে:

(১) মূল্যায়নের কোনো পরিকল্পনা করার আগে সেই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিক করতে হবে, এবং সেই লক্ষ্য যাতে বর্তমান যুগের সামাজিক পরিবেশকেই উন্নততর করে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে যে ধরনের শিক্ষার পরিবেশ রচিত হওয়া উচিত তার জন্যে চেষ্টারও প্রয়োজন আছে।

(৩) প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা, আচরণের পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করা এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তার পরিচয় রাখতে হবে।

(৪) নির্ধারিত লক্ষ্যে কতদূর শিক্ষার্থীরা পৌঁছেছে তা জানবার জন্যে উপযুক্ত অভীক্ষা (Test) ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। বর্তমানে চারদিকে নব নব পরিকল্পনা চলেছে। তাতে নতুন নতুন লক্ষ্যে পৌঁছবার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, এবং তার জন্যে নানারকম উপায়ও উদ্ভাবিত করা হয়েছে। যেমন, বর্তমানে শিক্ষায় নতুন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে Multipurpose পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ্য ও প্রবণতার পরিচয় পাবার জন্য নানারকম Test-এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অভাব এখনও মিটছে না।

বর্তমানে শিক্ষাগত নির্দেশ ও বৃত্তিগত নির্দেশের প্রয়োজন আমাদের দেশে প্রকট হয়েছে, একথা দেশের সমস্ত চিন্তানায়কেরা উপলব্ধি করেছেন।

কিন্তু এই নির্দেশকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে চাই ছাত্রকে জানা, প্রতিটি পরিবেশেই ছাত্রের আচরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা। সেই জন্যেই Cumulative Record Cards বা সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী একান্ত

প্রয়োজনীয়। শিক্ষার পরিবেশ কতটা উন্নত হয়েছে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে ঐ পরিবেশ কতখানি অনুকূল তার উপর বার বার জোর দিয়েছে মুদালিয়ার কমিশন।

"But neither the external examination nor the internal examination, singly or together, can give a correct and complete picture of a pupil's all-round progress at any particular stage of his education, yet it is important for us to assess this, in order to determine his future course of study or his future vocation. For this purpose a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him in the school from day to day, month to month, term to term and year to year."

সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রগতির মূল্যায়নের জন্য এই Record Card হবে একটি দর্পণ। এই কার্ড শিক্ষার্থীর মনের প্রতিটি দিকের পরিচয় বহন করবে।

(ক) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর একক সাহায্যের জন্য তাকে ব্যক্তিগত-ভাবে লক্ষ্য করা এবং ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা। তাই এই Record Card-এ যে শিক্ষার্থীর বিবরণ লিখিত হবে সেই শিক্ষার্থীকে এককভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিগত পদ্ধতি। এটিও তারই একটি দিক। এই তথ্যলিপিটি হবে confidential বা গোপনীয়। এটি গোপনীয় এই অর্থে যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

(খ) শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি দিকেরই পরিচয় এতে থাকবে। প্রত্যেকটি বিবরণ সংগ্রহ করার পর ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ও তাকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ব'লে জেনে নিয়ে তবে পত্রে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের এই বিবরণ বিদ্যালয়-জীবনের স্থিতিকাল ধরে চলবে।

(গ) এই প্রগতি-পঞ্জীর বিবরণগুলি অত্যন্ত সহজ হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি বিবরণ নিখুঁত ও সত্য হয়। স্থান অপূর্ণ থাকলে ক্ষতি

নেই; কিন্তু কোনো অসত্য বা সংশয়জনক বিবরণ যেন এতে স্থান না পায়। তবেই এটিকে জীবন্ত ও প্রকৃত লিপিচিত্র ব'লে মেনে নেওয়া যাবে।

(ঘ) এতকাল ধ'রে বিবরণী-পত্র বলতে কেবলমাত্র পরীক্ষার নম্বরের বিবরণই বোঝা যেত, কিন্তু প্রগতি-পঞ্জী তা থেকে আলাদা। তা ব'লে এতে যে পরীক্ষার নম্বর থাকবে না, তা নয়। কারণ পরীক্ষার নম্বরের মধ্য দিয়েও আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। এই বিবরণীতে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বিষয়-জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে না, তার সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যাবে। এতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক, চারিত্রিক বৃত্তি, বিষয়-জ্ঞান, পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়ে অনুরাগ প্রভৃতির জীবন্ত লিপিচিত্র পাওয়া যাবে।

(ঙ) শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে জানতে পারে, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, নিজের উন্নতির পথ তৈরি করতে পারে, এর লক্ষ্য হচ্ছে তার জন্যে সহায়তা করা। তাছাড়াও যাতে সে নিজের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে যাচাই ক'রে নিতে পারে তার একটি অপূর্ব সুযোগ ঘটে এই প্রগতি-পঞ্জীর মাধ্যমে।

Record Card-এর জন্য তথ্যসংগ্রহ

তথ্যসংগ্রহের সময় কি কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) এই প্রগতি-পঞ্জীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে জানা ও জানানো। অতএব কোনো বাঁধাধরা নিয়মে ব'লে দেওয়া যায় না কোন কোন তথ্য গ্রহণ করা উচিত, আর কোন কোন তথ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে যে ঘটনা বা যে তথ্য ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই সমস্ত ঘটনাই লিপিবদ্ধ করা উচিত। বৃদ্ধি ও বিকাশ বলতে শারীরিক, বৌদ্ধিক, আনুভূতিক, ব্যক্তিত্বমূলক প্রভৃতি সমস্ত দিকের কথাই আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

(২) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বা আনুভূতিক বা সামাজিক সত্তার পরিচয় পাওয়ার জন্য যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব-ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার। সুতরাং সেই তথ্যগুলিই গ্রহণ করা উচিত যেগুলি তার ব্যবহারে লাগবে।

প্রগতি-পঞ্জীর মধ্যে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

(ক) সাধারণ বিবরণজ্ঞাপক (General Data)—এই বিভাগে পড়ে স্কুলের নাম ও ঠিকানা, ছাত্রের বা ছাত্রীর নাম ও ঠিকানা, পিতার নাম, ভর্তি হওয়ার তারিখ ইত্যাদি। যদি কেউ অন্য বিদ্যালয় থেকে আসে তবে সেই বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা, জন্মতারিখ, শ্রেণী, সেকশন (বিভাগ), অভিভাবকের বৃত্তি ও গুণাবলী, ইত্যাদি নানাপ্রকারের তথ্য এতে সংগৃহীত হয়।

(খ) পরিবেশগত এবং পটভূমিকাগত বিবরণ (Environmental and Background Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর গৃহের পরিচয়, পরিবারে তার স্থান, অন্যান্য ভাইবোনের সংখ্যা, পিতামাতার গুণ, পিতামাতার বৃত্তি, প্রতিবেশীর বা পাড়ার পরিচয়, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, পরিবারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি শিক্ষার্থীর আনুভূতিক বা প্রক্ষোভসূচক সম্পর্ক বা প্রতিক্রিয়া, পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা ও শিক্ষার্থীর এবং মাতা ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সমস্ত বিষয় তার বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(গ) মানসিক বিবরণ (Mental Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির বিবরণ। সাধারণত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু তাছাড়াও, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া, আলোচনাচক্রে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া এই সমস্ত তথ্য থেকেও তার বিষয়োন্নতির বিবরণ পাওয়া যেতে পারে।

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ (Psychological Data)—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণাবলী বা উপাদান। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক ও তার আগ্রহ, ঝোঁক, সামর্থ্য, প্রেরণা, প্রক্ষোভ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি—এই সমস্ত তথ্য এই পর্যায়ভুক্ত।

(ঙ) সামাজিক বিবরণ (Social Data)—শিক্ষার্থী নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে কি ভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে, তার বন্ধুবান্ধব কি ধরনের, তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক

কর্মে সে কি ভাবে অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মে সে যোগদান করেছে কি না, সে কোন কোন খেলাধূলোয় অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন খেলাধুলোয় তার অবস্থা কি, অন্য কোনো সংগঠনে অথবা সমাজোন্নয়ন-মূলক কর্মে সে যোগদান করে কি না—এই সমস্ত তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে।

(চ) অন্যান্য বিবরণ (Other Data)—বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষার্থীর একটি বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তার শিক্ষাগত কোনো কাজ, বৃত্তি-নির্বাচনকারী কোনো কাজ, কাজকর্ম করার আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা, তার পড়াশুনা করার একাগ্রতা ও ইচ্ছা, তার বিভিন্ন অভ্যাস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্যদের কর্তৃপক্ষ যে Record Card চালু করেছেন, তাতে যা যা স্থান পেয়েছে তা নিচে দেওয়া হ'ল :—

(১) স্বাস্থ্য-জ্ঞাপক বিবরণ (Health Record) ;

(২) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কি কি দায়িত্বশীল কর্মে নিযুক্ত হয়েছে ও তার কোনো পারিতোষিক প্রাপ্তির বিবরণ (Position of responsibility held in school and awards obtained) ;

(৩) আগ্রহ-জ্ঞাপক তথ্য (Interest) ;

(৪) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠোন্নতির বিবরণ (School Achievements) ;

(৫) পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কার্যাবলী (Co-curricular Activities);

(৬) ব্যক্তিত্ব-জ্ঞাপক বিবরণ (Personality) ;

(৭) অন্যান্য বিবরণ (Other Information)।

মনে হয় এই সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা ফটোও সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) **স্বাস্থ্য-জ্ঞাপক বিবরণ**—এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে যাতে নিয়মিতভাবে Medical Inspection বা স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিদর্শন হয় তারও ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে Medical Inspection-এর ব্যবস্থা শুধু যে অপ্রচুর তা নয়, চাহিদার তুলনায় নিতান্ত সামান্য। যতক্ষণ না এই ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়ের

একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের কোনো সার্থক এবং সঠিক স্বাস্থ্যনির্ণায়ক বিবরণী পাওয়া যেতে পারে না। আমাদের দেশের অগণ্য পল্লীগ্রামে এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে কালেভদ্রেও ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যাঁদের পাওয়া যায় তাঁরা হয়তো নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করা। আমাদের দেশে যে সমস্ত ডাক্তার বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁরাও কালেভদ্রে বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন। তার ফলে তাঁদের দ্বারা বিদ্যালয় কোনোদিনই উপকৃত হয় না। এর জন্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত ডাক্তারদের জন্যে যদি কোনো বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা তাঁদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে এই উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে।

(২) **দায়িত্বশীল কার্যে অংশ গ্রহণ**—এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া। বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে যেসব শিক্ষার্থী কোনো দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বা নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেছে (যেমন, যারা মনিটার বা ক্যাপ্টেন পদে আছে) তাদের মধ্যে আমরা দায়িত্বজ্ঞান বা নেতৃত্ব প্রভৃতি কতকগুলো গুণের পরিচয় পাই। তাছাড়া, কোনো সামাজিক উৎসবে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে কোনো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিলেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, এইরকম দায়িত্বশীল পদে খুব অল্প শিক্ষার্থীই অধিষ্ঠিত থাকে। তাই এই বিষয়টি খুব অল্প শিক্ষার্থীর প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু যদি নানাপ্রকারের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে এই সব পদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তার ফলে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীরই দায়িত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হবে।

(৩) **আগ্রহ-জ্ঞাপক তথ্য**—এইটির সঙ্গে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশের সমস্ত সমস্যা নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই শিক্ষার্থীর আগ্রহ জানার জন্যে বিদ্যালয়ে নানারকমের কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যেমন—

(ক) ভাষাগত (Linguistic): বিদ্যালয়ে প্রাচীর-পত্রিকা, মুদ্রিত বিদ্যালয়-পত্রিকা, সাহিত্য-সমালোচনাচক্র ও বাসর, বিতর্ক প্রতিযোগিতা,

সাহিত্য-সঙ্ঘ, পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীর পঠিত পুস্তকের বিবরণ, সাহিত্য শিক্ষকের অভিমত—এই সমস্ত থেকে শিক্ষার্থীর ভাষাগত আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) বৈজ্ঞানিক (Scientific) : ছাত্রছাত্রীর এই বিষয়ে পরীক্ষার বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে ল্যাবরেটরি। ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিভাবে অংশ গ্রহণ করছে, তা থেকে তাদের আগ্রহ জানা যেতে পারে। তাছাড়া, পারিপার্শ্বিক জিনিসের প্রতি তাদের অনুসন্ধিৎসা থেকেও বৈজ্ঞানিক আগ্রহ জানা যায়।

(গ) যান্ত্রিক (Technical) : যার আগ্রহ কোনো কিছু টুকিটাকি জিনিস তৈরি করার দিকে, তার আগ্রহ যান্ত্রিক ব'লে মনে হয়। এই আগ্রহ জানার জন্য বিদ্যালয়ে শুধু যে Technical Branch থাকবে তা নয়, নানারকম জিনিস তৈরি করার এবং জানার সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার্থীদের সকলকেই দিতে হবে। যেমন—নানারকম কাঠের কাজ, চরকার কাজ, নানারকম যন্ত্র—যথা Motor, Wheel, Lathe প্রভৃতি রাখা যেতে পারে। ইলেকট্রিক বেল তৈরি, ইলেকট্রিক আলো, ফ্যান, রেডিও, লাইনিং ইত্যাদি কাজের প্রতি ঝোঁক থেকে যান্ত্রিক আগ্রহ বোঝা যায়।

(ঘ) অঙ্কনবিষয়ক (Artistic) : এর জন্যে বিদ্যালয়ে আঁকার সাজসরঞ্জাম, তুলি ও রং-এর সেট, নানারকম জিনিস তৈরি করা—যেমন, কাগজের ফুল, মালা, চক্র বা মূর্তি তৈরি, মাটির কাজ, মাটির নানাপ্রকারের ফল, আকার, মূর্তি প্রভৃতি তৈরি করার জন্যে সাজসরঞ্জাম ও প্রচুর সুযোগ থাকা দরকার।

(ঙ) সঙ্গীতবিষয়ক (Musical) : এতে আগ্রহ প্রায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীরই থাকে এবং তারা নিজেরাই অনেকাংশে উদ্যোগী হয়। এর জন্যে নানাপ্রকার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। কণ্ঠ-সংগীত ছাড়াও, যন্ত্র-সংগীতের জন্যেও তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি নানাপ্রকার সরঞ্জাম বিদ্যালয়ে থাকলে ভালো হয়। আর এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও প্রয়োজন।

(চ) কৃষিবিষয়ক (Agricultural) : পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। সারা ভারতও তাই। সুতরাং প্রায় সব রাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই কৃষি-বিষয়ে একটা আগ্রহ দেখা যায়। সেইজন্য বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কিছুটা জমি এবং নানাপ্রকারের ফসল উৎপন্ন করার জন্য উন্নত স্তরের যন্ত্রপাতি থাকা

উচিত। একজন অভিজ্ঞ কৃষি-শিক্ষকের পরিচালনায় কয়েকজন শিক্ষার্থী ফসল উৎপাদন, বাগান ইত্যাদি তৈরি করবে। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কৃষিবিষয়ক আগ্রহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারব।

(ছ) বাণিজ্যিক (Commercial) ঃ Type-writing, Short-hand, বাণিজ্যিক ভূগোল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য থেকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জানা যায়।

(জ) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Home Science) ঃ গার্হস্থ্য কর্ম ও পরিচালনায় আগ্রহ (Interest in household work and management) ঃ গার্হস্থ্য-কর্মে আগ্রহ সাধারণত ছাত্রীদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

(ঝ) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আগ্রহ (Any other noted interests) ঃ উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি কোনো শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো আগ্রহ থাকলে তাও উল্লেখযোগ্য।

(৪) **পাঠোন্নতির বিবরণ**—বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির বিবরণ যেমন এতে লিখিত থাকবে, তেমনি একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনা, তার প্রাপ্ত নম্বরের গড়, তার শ্রেণীগত অবস্থান প্রভৃতি শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির একটি পূর্ণ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। তার বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির বিবরণ নম্বরের সাহায্যে না দিয়ে অন্য কোনো গুণগত হিসাবেও ধার্য করা যেতে পারে।

(৫) **পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যাবলী**—এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত তা হচ্ছে—

(ক) খেলাধূলাজনিত ঃ খেলাধুলোর মূল উদ্দেশ্য অবসর বিনোদন হলেও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনেক গুণের বিকাশ হয়, যেমন—ধৈর্য, সহনশীলতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ইত্যাদি। কোন শিক্ষার্থী কতবার কি খেলায় অংশ নিয়েছে, খেলায় তার কৃতকার্যতা সে কি ভাবে গ্রহণ করেছে—এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(খ) সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক ঃ এই পর্যায়ে পড়ে বিতর্ক সভায় অংশ গ্রহণ, প্রাচীর-পত্রিকায় লেখা, বিদ্যালয়-পত্রিকা পরিচালনা করা, সাহিত্য আলোচনা-চক্র গ'ড়ে তোলা, ছবির সাহায্যে গল্প তৈরি করা, কথা নিয়ে

খেলা, ইত্যাদি। এইগুলো থেকে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, সাহিত্য-রসবোধ, বিশ্লেষণশক্তি প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

(গ) অবসরবিনোদনসূচক: যা শরীর ও মনের কর্মক্ষমতা যোগায় ও উদ্দীপনা আনে, যেমন—ভ্রমণ, বাগান তৈরি, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, পিকনিক, ইত্যাদি কার্যকলাপকে এই পর্যায়ে ফেলা চলে।

(ঘ) সামাজিক: এই পর্যায়ে পড়ে সমাজোন্নয়নমূলক কোনো কাজ, দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা, আর্তদের সেবা, পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা, বিদ্যালয় পরিচালনা, বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা, ইত্যাদি।

(৬) **ব্যক্তিত্ব-জ্ঞাপক বিবরণ**—এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ। ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের সমস্ত কর্মের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। সেইগুলি শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে লিখে রাখতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে—

(ক) কার্যোদ্যম (Initiative): যে গুণের জোরে কেউ কোনো কাজে দায়িত্ব নেবার জন্যে এগিয়ে যায়, তাই হ'ল কার্যোদ্যম। নিজের থেকে কোনো শিক্ষার্থী কোনো কাজের ঝুঁকি নিতে চায় কি না এটি হ'ল দ্রষ্টব্য। আর এর উল্টো দিকটা হচ্ছে কোনো কাজ ঘাড়ে এলে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়া, গতানুগতিক অন্যপ্রদর্শিত পন্থায় কাজ করা, নতুন কিছু উদ্ভাবন না করা। কার্যোদ্যমের পরিচয় আমরা পাই বিদ্যালয়ের কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালনায়, কোনো খেলার পরিচালনায়, শ্রেণীর কোনো কাজে।

(খ) অধ্যবসায় (Industry): এটি ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই গুণটিই শিক্ষার্থীকে পরিশ্রমী ক'রে তোলে। কোনো নতুন কাজে সাহস এনে দেয় এই গুণ; এতে আসে আগ্রহ ও প্রেরণা। সাধারণত যেসমস্ত কাজে বেশি সময়, ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাতে অধ্যবসায় বিশেষ কাজে লাগে।

(গ) দায়িত্ববোধ (Responsibility): এই গুণটির সঙ্গে কার্যোদ্যমের সম্পর্ক রয়েছে। কার্যোদ্যম অনেকের থাকতে পারে, কিন্তু দায়িত্ববোধ থেকে আসে সাহস এবং কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। যাদের এই

গুণটি থাকে তারা সাধারণত বিদ্যালয়ের কোনো উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। এই গুণটি না থাকলে আসে যত্নহীনতা, মনোযোগহীনতা, অন্যমনস্কতা, ইত্যাদি।

(ঘ) দলবদ্ধতা (Co-operativeness): শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে এই গুণটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারুর সঙ্গে মিলে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা, সকলের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে উৎসাহ দেওয়া—এই হ'ল গুণটির বৈশিষ্ট্য। বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা দিয়েও এই গুণটির গুরুত্ব মাপা যায়। নাগরিক জীবনের প্রস্তুতির পথে এটি একটি বিশেষ গুণ। এটিকে বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠু এবং নাগরিকতাবোধ গ'ড়ে তোলা যায় না।

(ঙ) প্রক্ষোভগত সাম্য (Emotional balance): যে শিক্ষার্থী সহজে মেজাজ হারিয়ে ফেলে না, তারই এ গুণটি আছে। আচরণে ধীরতা এবং অপরিবর্তনশীলতা হ'ল এর লক্ষণ। এর বিপরীত লক্ষণ হচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ, সুস্থমস্তিষ্কে ধীরভাবে আত্ম-সমালোচনা শুনতে না পারা। যার মনে প্রক্ষোভগত সাম্য নেই, সে মানসিক দ্বন্দ্বে কষ্ট পায়, অপরে তার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করে এই রকম মনে করে। বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে, শিক্ষকের প্রশংসা ও নিন্দার প্রতিক্রিয়া থেকে তার মনের প্রক্ষোভকালীন অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

(চ) আত্মবিশ্বাস (Self-confidence): আত্মবিশ্বাস এমন একটি গুণ যার সঙ্গে অন্যান্য অনেক গুণের মিল রয়েছে। তাই একে আলাদা ক'রে দেখা মুস্কিল। তবুও কোনো শিক্ষার্থীর কাজ করবার ধরন দেখে বোঝা যায় তার আত্মবিশ্বাস কতটা। যার আত্মবিশ্বাস আছে সে খুব দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করে। এ গুণ যাদের নেই তারা যে কোনো কাজে সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

(ছ) কাজ করার অভ্যাস (Work habits)—প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলো বিশেষ অভ্যাস থাকে। অভ্যাসের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতাবোধ, যত্ন প্রভৃতি গুণগুলি থাকলেই শিক্ষার্থীর আচরণে সেগুলি প্রতিফলিত হয়। বাড়ির কাজ, হাতের লেখা, বই ও খাতাপত্রের ব্যবহার, পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কাজে যোগদান, প্রাচীর-পত্রিকায় লিপি-প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়।

(জ) অন্যান্য গুণাবলী (Any other trait)—অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে পড়ে, অধ্যবসায় (Persistence), উচ্চাকাঙ্ক্ষা (Aspiration), ক্ষিপ্রতা (Fluency) প্রভৃতি।

(৭) **অন্যান্য বিবরণ**—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থী-জীবনের নানা সমস্যা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ অহঙ্কারী, কেউ তা নয়, কেউ বেশ উদ্যমী, কেউ বা বেশ ধীর-স্থির। শিক্ষার্থী আবার অনেক সময় অপরাধপ্রবণ হয়, যেমন—স্বার্থপর, বঞ্চক, সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। আবার কারুর মধ্যে দেখা যায় অস্বাভাবিক দক্ষতা।

সমস্ত দিকের কথা মনে রেখে যে বৃত্তিটি শিক্ষার্থীর জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রকট তার একটা ইঙ্গিত থাকার দরকার।

আমাদের আলোচ্য Recordটি Three-Point Scale-এর, অর্থাৎ প্রতিটি গুণকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি পর্যায়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে, যেমন—below average, average এবং above average। তারপর শিক্ষার্থীকে যে কোনো একটি পর্যায়ে ফেলতে হবে।

যদিও শ্রেণী-শিক্ষক নিজের শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিষয়ে rating বা মূল্যায়ন করবেন তবুও সমস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে সমস্ত শিক্ষার্থীর বিষয়ে মতামত নেওয়া উচিত। শিক্ষকদের বৈঠকে শ্রেণী-শিক্ষকেরা আপন আপন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অন্যান্য সকলের কাছ থেকে জেনে নিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবেন। এর জন্যে প্রত্যেক শিক্ষককে একটি পকেট বই রাখতে হবে। অবশ্য তিনি file-ও রাখতে পারেন। কোনো স্থানের কোনো ঘটনা বা কোনো কিছু note তিনি কোনো শিক্ষার্থীর নামের তলায় লিখে রাখবেন আর সেই শিক্ষার্থীর শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবেন। পকেট বইয়ে দুটি ক'রে বা তিনটি ক'রে পৃষ্ঠা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদাভাবে রাখা যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে শ্রেণী-শিক্ষক তাঁর খাতায় note তুলে রাখবেন। Rating-এর সময় অন্যান্য সকলের অভিমত নিয়ে তিনি সেটি সারা বছরে একবার মাত্র পূরণ করবেন। তিনটি পর্যায়ের মধ্যে শিক্ষার্থী যে পর্যায়ে পড়ে সেই ঘরে তিনি একটি (✓) দাগ দেবেন।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা

বর্তমান শিক্ষাজগতে যে বিষয়টি আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের কাছে প্রধান আলোচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটি হ'ল পরীক্ষা-ব্যবস্থা।

১৯৪৮ সালের রাধাকৃষ্ণান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তদন্ত করবার জন্যে সুপারিশ করেন :

"We are convinced that if we are to suggest one single reform in university education, it should be that of the examinations......"

তথাকথিত এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা সমস্যা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, সমগ্র দেশের, সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতিতেও ঐ একই সমস্যা। ১৯৫২ সালের মুদালিয়ার কমিশন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার তদন্ত ক'রে ঐ সুরেই সুর মিলিয়েছেন। এই কমিশন বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার মুখোশটি খুলে তার রূপটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন :

"That the examinations today dictate the curriculum instead of following it. Present experimentation hampers the proper treatment of subjects and sound methods of teachings, foster a dull uniformity rather than originality, encourage the average people to concentrate too rigidly upon too narrow a field and thus help him to develop wrong values in education."

শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষকদের শিক্ষাদানকে কেমন কোণঠাসা ক'রে রেখেছে তা বোধ হয় এই কমিশনের মতো আর কোনো কমিশনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়নি—

"They (the teachers) are forced to attend to what can be examined and to do that with success they have often to 'spoon-feed' their pupils rather than encourage habits of independent study......"

সুতরাং আমাদের পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন আজ সকলকেই বিব্রত ক'রে তুলেছে।

তাহ'লে আমাদের এখন দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় :

(ক) আমাদের পরীক্ষা-ব্যবস্থাটি কি ?

(খ) কি ভাবে তার সংস্কার করতে হবে ?

প্রথমে আমরা সমস্যার আলোচনা করব। আমাদের পরীক্ষা-ব্যবস্থাটি হচ্ছে প্রবন্ধ-ধর্মী। এই ধরনের পরীক্ষায় লিখতে হয় প্রচুর। প্রশ্ন দেখতে ছোট কিন্তু বিরাট উত্তর দিতে হয়। তাই ঠিক কতটা উত্তর কোন প্রশ্নের হবে এ বিষয়ে কেউ একমত নন। তাই এর নাম Subjective। Subjective কথাটির মানে হচ্ছে ব্যক্তিমুখী, অর্থাৎ ব্যক্তির উপর যা নির্ভরশীল। কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক কি ও কতটা হবে তার বাঁধাধরা কোনো মাপ নেই। Subjective type নামকরণের সার্থকতা এইখানেই।

Subjective পরীক্ষায় উত্তরের বিভিন্নতার জন্য নম্বরও Subjective অর্থাৎ পরীক্ষকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল।

আরও একটা দিক আছে এই Subjectivity-র। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী হয়তো সিলেবাস সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ। কিন্তু তার রচনাশক্তি ভালো নয়, বা গুছিয়ে লিখতে পারে না, বা হাতের লেখা দুর্বোধ্য। ফলে, বিষয়বস্তু জানলেও শিক্ষার্থীর উত্তর তার দুর্বল রচনাশক্তির উপর নির্ভরশীল। রচনাশক্তির অভাব বা গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা নেই ব'লে ইতিহাস পুরোপুরি জেনেও ইতিহাসে সে অজ্ঞ ব'লে পরিচিত হয়। এর কারণ হ'ল, আমরা কি পরীক্ষা করতে চাই, তার কোনো মাপকাঠি নেই। এমন তো প্রায়ই হয়। কোনো শিক্ষার্থী হয়তো ঐতিহাসিক ঘটনা ভালো জানে না, অথচ গুছিয়ে সুন্দর ক'রে লিখে সে পাশ ক'রে গেল। তাহলে পরীক্ষাটা কি জন্যে? বিষয়ের পরীক্ষা না অন্য কিছুর? প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষা-পত্রেই দেখা যায় রচনাশক্তির পরীক্ষা। তাহলে পড়ানোর উদ্দেশ্য আর পরীক্ষার উদ্দেশ্য—দুটোর মিল কোথায়?

এবার আমরা পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের দিকটি আলোচনা করব। ঐ সংস্কারের জন্য যে ধরনের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে তার নাম Objective। একটি ব্যক্তিমুখী, অপরটি নৈর্ব্যক্তিক। Objective পরীক্ষায় উত্তরটা হবে সম্পূর্ণ বাঁধাধরা—তার নড়চড় হবার জো নেই। তাই এর মূল্যায়ন পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে না।

কিন্তু এই অভীক্ষায় (Test) প্রকাশভঙ্গির কোনো পরিচয়ই মেলে না। এটি ভালো লক্ষণ নয়, কারণ প্রকাশভঙ্গি সমগ্র মানুষটির পরিচয় দেয়। তার চিন্তাশক্তির ছাপ, বর্তমান জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা, ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা—এই দিকগুলোর পরিচয় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্রে বিশেষ পাওয়া যায় না। প্রকাশই হ'ল মানুষের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ এই ধরনের পরীক্ষায় মোটেই সম্ভব হয় না।

অবশ্য এর নাম objective হ'লেও এর মধ্যে subjectivity যে নেই একথা বলা চলে না। উপরন্তু এতে subjectivity-র যথেষ্ট অবকাশ আছে। এর subjectivity হচ্ছে প্রশ্নপত্রের প্রণয়নে—যেমন, ইতিহাস থেকে প্রশ্নরচনায় কেউ হয়তো শতকরা ২৫ নম্বর দিলেন ঘটনামূলক প্রশ্নে, শতকরা ৫০ নম্বর বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিতে আর শতকরা ২৫ ঐতিহাসিক ঘটনায়। আবার কেউ বা ঐতিহাসিক ঘটনায় দেবেন শতকরা ৫০ নম্বর, আর সিদ্ধান্ত অবলম্বনে দেবেন শতকরা ২০ নম্বর, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতিতে শতকরা ১৫ নম্বর আর ঐতিহাসিক বিচারমূলক প্রশ্নে শতকরা ১৫ নম্বর। সুতরাং কোনো পরীক্ষার্থীকে এই দুটো প্রশ্নপত্র উত্তর করতে বললে তার প্রাপ্ত নম্বরের কোনো পার্থক্য হবে না কি? তাই এতেও subjectivity-র প্রশ্ন ওঠে।

Objective Test প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয় মনে রাখা উচিত:

(১) পরীক্ষক যার পরীক্ষা করতে চান, সত্যি সত্যিই অভীক্ষাপত্র তার পরীক্ষা করছে কি?

(২) পরীক্ষকের কাছে কি প্রশ্নপত্র বাস্তব মনে হয়?

(৩) যে শ্রেণীর জন্য অভীক্ষাপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে প্রশ্নপত্রের ভাষা সেই শ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য নয়তো?

(৪) প্রশ্নপত্রে কি অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এবং লক্ষ্যহীন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

(৫) প্রশ্নে কি এমন কোনো অপ্রাসঙ্গিক তথ্য আছে যার সঠিক উত্তর শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

(৬) প্রশ্নপত্রে যে বিষয়ের যা জ্ঞান চাওয়া হচ্ছে তা কি সাধারণ ছাত্রের আয়ত্তের বাইরে ?

(৭) প্রশ্নগুলি কি ছাত্রদের সামনে কোনো সমস্যার রূপ তুলে ধরেছে ?

(৮) প্রত্যেকটি প্রশ্ন দ্ব্যর্থকতা থেকে মুক্ত কি ?

(৯) সমস্যাগুলি শুধু পরিষ্কারভাবে নয়, সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্নপত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কি ?

(১০) কোথাও যদি কোনো নাস্ত্যর্থক প্রশ্ন থাকে, তাহলে নাস্ত্যর্থ-বোধক পদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কি ?

(১১) অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে তুলনায় সম্ভাব্য উত্তরগুলি শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধের উদ্দীপক কি না ?

(১২) নির্দেশ বেশ সোজা ভাষায় দেওয়া আছে কি ?

(১৩) প্রশ্নপত্রে যতিচিহ্নের ব্যবহার যথাযথ করা হয়েছে তো ?

আমাদের দেশের পরীক্ষা-ব্যবস্থায় মূলত external বা বহিঃপরীক্ষা বেশি। শুধু বেশিই নয় ; যে পদ্ধতিটি আমাদের দেশে সবচেয়ে মারাত্মক সেটি হচ্ছে বহিঃপরীক্ষার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ। কোনো শিক্ষার্থী হয়তো স্কুলের সমস্ত পরীক্ষাতেই ভালো ক'রে এসেছে। কিন্তু External Examinations-এ খারাপ করার জন্য সেইটাই হবে তার ফলের পরিচায়ক। তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমাতে এবং আন্তঃপরীক্ষা বা Internal Examination-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই আন্তঃপরীক্ষার আওতায় কি কি পড়ে তা দেখা দরকার :

(ক) স্কুলের বিভিন্ন পর্যায়ান্তিক পরীক্ষা : স্কুলে যে সমস্ত Terminal Examinations হয় তার একটি বিবরণ থাকা উচিত এবং পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল বার করার সময় সেই পরীক্ষার ফলের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(খ) Tutorial work : বর্তমানে কোথাও কোথাও Tutorial system শুরু হয়ে গেছে। ক্লাসে অনেক শিক্ষার্থী থাকায় শিক্ষক তাদের মূল সমস্যাগুলো জানতে পারেন না। যদি একজন শিক্ষকের কাছে এক সময়ে মাত্র আট বা দশজন শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পায় তবে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুবিধা-অসুবিধা বুঝে তাদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাতে পারেন

এবং তার একটি বিবরণ রাখতে পারেন। চূড়ান্ত ফল বেরোনোর সময় তার থেকেও শতকরা কিছু নম্বর শিক্ষার্থীর প্রাপ্য।

(গ) বাড়ির কাজ (Home Assignment) : শ্রেণীশিক্ষক বাড়ির কাজের খাতা দেখবেন এবং তার একটি বিবরণ রাখবেন। সেই বিবরণ থেকেও কিছু নম্বর থাকার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বহিঃপরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা না ক'রে এমন দু' একটি বিষয় থাকা উচিত যার পরীক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে বিদ্যালয়ে শেষ হয়ে যাবে এবং সেই নম্বরই তার চূড়ান্ত নম্বর ব'লে ধার্য করা হবে।

(ঙ) এর পর আসে শিক্ষার্থীর আচরণের ইতিহাস, যা জানা যাবে তার Cumulative Record Card বা সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ থেকে।

আন্তঃপরীক্ষার উপর জোর দিতে গেলে আমাদের নিম্নলিখিত নীতি গ্রহণ করতে হবে :

(১) প্রতিটি শিক্ষকই শিক্ষার্থীর প্রকৃত গুণাবলীর অনুসন্ধানে তৎপর হবেন। তাঁকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে তাঁর অনুসন্ধান রচনা করবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের পথ।

(২) কোনো আন্তঃপরীক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে তাকে নির্ভরযোগ্য ব'লে প্রমাণ দিতে হবে এবং তখনই তা নির্ভরযোগ্য হবে যখন দেখা যাবে যে শিক্ষার্থী নিজের সামর্থ্যানুযায়ী এবং জ্ঞানানুযায়ী এগিয়ে চলেছে।

মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "The promotion of a child should depend not only on the result of the Annual Final Examination, but also on the results of the Periodic Tests and progress shown in the school record." পরীক্ষায় সম্পূর্ণ Objective Test-এর প্রয়োগ বোধ হয় ঠিক হবে না। Objective Test-এর দোষ-ত্রুটির কিছু আলোচনা হয়েছে। এর প্রধান দোষ, প্রকাশভঙ্গির কোনো সুযোগ-সুবিধা এতে নেই—এটাই এর বিরাট অসুবিধা। তাই Objective Test-এর সঙ্গে Subjective Test প্রচলিত করা উচিত। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কে পুরোপুরি Objective Test প্রচলিত হতে পারে, কিন্তু বাকি বিষয়ে অর্ধেক Subjective এবং অর্ধেক

Objective-এর স্থান থাকা উচিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ প্রতি বিষয়েই শতকরা ২০ ভাগ নম্বর Objective-এর জন্য স্থির করেছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

ইংলণ্ডে এক সময় নিয়ম হ'ল যে, পরিদর্শকরা এসে স্কুলে ছাত্রদের পরীক্ষা নেবেন, আর সেই পরীক্ষার ফলের উপর স্কুলগুলোর মান নির্ভর করবে। তখন ফলাফলের উপরই স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য পাওয়া নির্ভর করত। কালক্রমে এ-ব্যবস্থা উঠে যায়। ইংলণ্ডে এখনকার দিনে পরিদর্শকের কাজ হচ্ছে স্কুলের কার্যাবলীর উপর নজর রাখা যাতে স্কুলের মান নিম্নগামী না হয়। স্কুল-গৃহ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, স্কুল-রেকর্ড প্রভৃতি ঠিক থাকে কি না, সে সম্বন্ধে পরিদর্শকরা সচেতন থাকেন।

আমাদের দেশে এখন বিদ্যালয়ের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি। সেই তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা কম অর্থাৎ যে পরিমাণে বিদ্যালয় বেড়েছে সেই অনুপাতে শিক্ষাবিভাগের কাজের পরিধিও বেড়ে গেছে। পরিদর্শকের সংখ্যা কিন্তু সে পরিমাণে বাড়ানো হয়নি। ফলে, পরিদর্শনের কাজও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না ; কারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজের চাপও যথেষ্ট বেড়েছে। আমেরিকাতে পরিদর্শকদের শ্রমবিভাগ করা হয়েছে। সেখানে অধীক্ষকরা (Superintendent) বিদ্যালয়ের শুধু সংগঠন-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেন অবেক্ষক (Supervisor)। তবে এ-ব্যবস্থা সবদেশেই চলে না। কারণ, প্রথমত, আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে এ-ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি না হলে এ-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশে পরিদর্শকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাঁদের, প্রথমত, বিদ্যালয়-রেকর্ড, বিদ্যালয়-গৃহ, আসবাব, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখতে হয়। এ-ছাড়া বিদ্যালয়-তহবিলের বণ্টন, শিক্ষকদের যোগ্যতা নিরূপণ, ভবিষ্যতের উন্নততর শিক্ষাপ্রণালীর জন্য পরিকল্পনাও তাঁদের করতে হয়। সময়-সংক্ষেপের ফলে তাঁদের দ্বারা কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না।

পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকখানি। প্রত্যেক পরিদর্শকেরই

শিক্ষা ও শিক্ষণ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। তাঁর অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিকে সেই নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করার জন্য তাঁকে চেষ্টা করতে হয়। সেজন্য বিদ্যালয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংগঠনের বহু সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

পরিদর্শনের নানা পর্যায়

সংশোধনাত্মক (Corrective Type)—এই ধরনের পরিদর্শনে সাধারণত পরিদর্শক বিদ্যালয়-ব্যবস্থার দোষ-ক্রটি খুঁজতে যান, এবং তাতে পরিদর্শন স্বতই একদেশদর্শী হয়। ফলে, পরিদর্শনের শেষে দোষ-ক্রটিরই দীর্ঘ তালিকা এসে পড়ে। এতে পরিদর্শক এবং শিক্ষক কেউই খুশি হন না। তাই এতে ফল ভালো হয় না। যদি দোষ-ক্রটির দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহ'লে কারুরই কাজে উৎসাহ থাকবে না। তাই পরিদর্শক দোষ-ক্রটির তালিকা যেমন করবেন তেমনি কেমন ক'রে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে বিধানও দেবেন। আবার কোনো ভালো কাজের প্রশংসা ক'রে তিনি শিক্ষকদের উৎসাহিতও করবেন। তাঁর মনে বিদ্যালয়-সম্পর্কে উচ্চাশা থাকবে। কাজের অগ্রগতি নির্ভর করে যুগপৎ দোষ-ক্রটি প্রদর্শনের এবং ভালো কাজে উৎসাহদানের উপর।

নিবারণাত্মক (Preventive Type)—এই ব্যবস্থায় পরিদর্শক সংবেদনশীল মন নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতির জন্য শিক্ষকরা কতখানি দায়ী, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন। শিক্ষকরা কতখানি প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করেন সে-বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষকরা নিজেদের সম্মান বজায় রেখে ভালোভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারেন।

সৃজনাত্মক (Creative Type)—এই ব্যবস্থায় পরিদর্শকরা শিক্ষকদের প্রচুর উৎসাহ দেবেন। শিক্ষকদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বিদ্যালয়-ব্যবস্থার উন্নতি করাটা তাঁদের নিজেদেরই দায়িত্ব। এতে তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। তার ফলে শিক্ষকরা দায়িত্বশীল হবেন এবং ভালো কাজ দেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এর ফলে কেবল-মাত্র একে অন্যের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে তাঁরা ব'সে থাকবেন না।

পরিদর্শন নীতি

পরিদর্শকের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ করা নয়। একথা যদি সব সময় তাঁর মনে হয় যে ক্ষমতা থাকলেই তা প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে কোনো কাজই হয় না। সংস্কারের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে তাঁকে সহকর্মীদের মতামত নিতে হবে। জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে হয়তো পরিদর্শক তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু সেটা হবে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। স্বতঃস্ফূর্ত কাজ পেতে হলে পরিদর্শককে যথেচ্ছাচারী হলে চলবে না। পরিদর্শকের পরিকল্পনা সহকর্মীদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে তাঁরা ঐসব কাজের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন।

ভারতবর্ষে পরিদর্শকরা সাধারণত বিদ্যালয়ের সংগঠন ও আর্থিক ব্যাপারেই বেশি দৃষ্টি দেন। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিদর্শনে যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নীত করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেখানে অন্য কোনো বিষয়ে পরিদর্শককে মন দিতে হলে কাজ ভালো হয় না।

পরিদর্শক হবেন নিরপেক্ষ। যদি কোনো দোষ বা গুণ তাঁর নজরে আসে তবে তিনি সরাসরি তার উল্লেখ করবেন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই তিনি ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে শিক্ষকদের বিব্রত করবেন না।

পরিদর্শনের সময়ে স্থানীয় অবস্থার কথা পরিদর্শক অবশ্যই বিবেচনা করবেন। তিনি যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন সেই বিদ্যালয়টি সেই পরিবেশে কতখানি অগ্রসর হতে পারে সেকথা তিনি প্রথমেই চিন্তা করবেন। কারণ, অগ্রগতি একদিনেই হয় না, তা সময়সাপেক্ষ। তাই প্রথম কয়েক মাস পরিদর্শক কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। এ-সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করবেন না। পরবর্তী কয়েক মাস বড়রকমের ত্রুটিগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এরপর শিক্ষকদের কাছে তিনি এই ত্রুটিগুলি জানাবেন এবং তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করবেন। পরিদর্শকের ত্রুটি-তালিকা হয়তো দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু তাঁকে একসঙ্গে সব কাজ করতে হলে বিপত্তিই বাড়বে। তাই পরিদর্শককে একে একে কাজ আরম্ভ করতে হবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজে এগুতে হবে।

পরিদর্শকদের সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা একান্ত কাম্য। কখনো কখনো পরিদর্শকরা শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়েই তাঁদের কাছে ভালো কাজ দাবি করেন। যদিও পরিদর্শকরা বিদ্যালয়ের মানের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দেবেন, তবুও তাঁরা মানবিকতা-বর্জিত হবেন না। যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ চালাতে হয়, সেটা তাঁরা অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

পরিদর্শকের পরিদর্শন শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেন অপ্রীতিকর না হয়। পরিদর্শন শিক্ষকদের প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে। পরিদর্শকের দৃষ্টি হবে সদাজাগ্রত সমালোচকের দৃষ্টি, কিন্তু তার পেছনে থাকবে সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়। হঠাৎ শ্রেণীকক্ষে গিয়েই হয়তো পরিদর্শকের চোখে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ল, এবং তিনি তখনই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন! পরিদর্শকের পক্ষে এরূপ হঠকারিতা অত্যন্ত ভ্রান্ত হবে। দু-পাঁচ মিনিটের পরিদর্শনে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করা যায় না। শিক্ষকের মান-বিচারে সময় ও সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। পরিদর্শক নিজে একদিন আদর্শ পাঠ দিতে পারেন। আবার পত্র-পত্রিকা দিয়ে তিনি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সাহায্যও করতে পারেন।

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ অচ্ছেদ্য। পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের দিকেও যথেষ্ট জোর দেবেন।

পরিদর্শক কেবলমাত্র সময়তালিকা, আসবাব, বিদ্যালয়-গৃহ, মন্ত্রণাকক্ষ বিদ্যালয়-রেকর্ড প্রস্তুতি প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হবেন না। প্রথমত, শিক্ষকদের কাজ ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার মূল্য তিনি নিরূপণ করবেন। দ্বিতীয়ত, বর্তমান অবস্থার উন্নতি কি ক'রে করা যায় সেটা তিনি দেখবেন। এতে প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে এভাবে পরিদর্শন-ব্যবস্থা চালু করা সময়সাপেক্ষ। নিম্নলিখিত উপায়ে পরিদর্শকের কাজে সুবিধা হ'তে পারে :

(ক) একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে সাধারণত পরিদর্শক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, বিদ্যালয়ের ত্রুটি ও নূতন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

(খ) মূল আদর্শে পৌঁছোনোর জন্য পরিদর্শকের নিয়মনিষ্ঠ প্রচেষ্টার প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অস্বীকার্য।

(গ) পরিদর্শকের সুপরিকল্পনা সমগ্র বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়।

প্রথমত, উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার সূত্রগুলো দেওয়া থাকবে। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার সাফল্য নিরূপণের জন্য কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেকটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে হলে শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই তা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সুষ্ঠু রূপায়ণের উপরই পরিকল্পনা গ্রহণের সবকিছু নির্ভর করে।

পর্যায় ২

পদ্ধতি

পাঁচ

শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা

শিশুদের জীবনে অনুভূতির মূল্য ও প্রভাব খুব বেশি। তাই তার শিক্ষাপদ্ধতিতেও থাকবে অনুরূপ আয়োজন। স্বাধীনভাবে যাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে শিক্ষালাভ করতে পারে, সেজন্যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুর জীবনের শুরু থেকেই নানাভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হ'ল আত্মপ্রকাশের জন্যে সংগ্রাম। চঞ্চল তাদের মন, আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর। তাই, শিশুর এই চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শুরু করতে হবে তার শিক্ষা-ব্যবস্থা।

শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে করতে হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক। খেলা-ধূলো, নানারূপ সৃষ্টির কাজ, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে। এখানে হাতের কাজ হবে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম; আনন্দই হবে প্রধান উপকরণ। কাজ ও খেলা—এ দুটি হবে পরস্পরের সম্পূরক। একটির সাহায্যে অপরটি সার্থক হবে। শিশু যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। মায়ের কোল ছাড়া হয়ে সে এই প্রথম বাইরের জগতে পদার্পণ করে। তাই শিশুর মন থেকে অপরিচয়ের শঙ্কা তাড়াতাড়ি যাতে দূর হয়ে যায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর শক্তি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সবরকম সুযোগ দেওয়া। তদনুযায়ী পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা করতে গেলে শিশুমনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, শিশু হ'ল কর্মপ্রবণ ও সৃজনধর্মী। তাই বিদ্যালয়-পরিবেশকে শিশুর এই প্রয়োজন মেটাবার অনুকূল ক'রে তুলতে হবে। ছেলেবেলা থেকে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর অভ্যাস গঠন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গণতন্ত্রের আদর্শ।

পাঠ্যবিষয়

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলো ; (২) সৃজনাত্মক কার্য ও কারুশিল্প ; (৩) ভাষা ও সাহিত্য ; (৪) পরিবেশ-পরিচিতি (৫) শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শিশু শ্রোতা হতে চায় না, হতে চায় কর্মী। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও আগ্রহের সংবাদ সংগ্রহ করাই হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের প্রধান কাজ। কাজ ক'রে হাতে-কলমে শেখানোই হবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষককে থাকতে হবে নেপথ্যে—শিশুরাই সবকিছু হাতে কলমে শিখবে, ভাঙবে, গড়বে। কেবল কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষক বন্ধু হিসেবে তাদের সাহায্য করবেন। তাই তাঁকে হতে হবে ধৈর্যশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও দরদী। কখনো দরদী বন্ধুর আসন নিয়ে, আবার কখনো স্নেহশীলা মায়ের বাৎসল্য নিয়ে, শিশুর মন বুঝে তাঁকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে। বিষয়বস্তুর চেয়ে শিশুকে জানবার প্রয়োজন তাঁর অনেক বেশি।

শিক্ষা-প্রণালী

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কোনো বইএর প্রয়োজন নেই। কেবল তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয়। তার আত্ম-প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে হবে যাতে তার কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ পরিণতি লাভ করতে পারে। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষককে ধৈর্যসহকারে শিক্ষা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিশুর কাছে কর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই।

নানা সৃজনাত্মক কাজ শিশুর ভালো লাগে। ছবি আঁকা ইত্যাদি নানা কাজের ভেতর দিয়ে তারা মনের ভাবাবেগকে ভাষা দেয়। এই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য শিক্ষক তাদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন। মোটকথা, শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে হলে চাই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি আর দরদী মন।

একদিকে যেমন শিক্ষাকে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি এই পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে খাপ

খাওয়ানোর পথেও শিক্ষককে সহায়তা করতে হবে। এজন্যে চাই শিক্ষকের পরিপূর্ণ শিক্ষা। পরিবেশ বলতে বোঝায় বিদ্যালয়-পরিবেশ, গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ। এই সব পরিবেশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিশুর শিক্ষার উপাদান। কোথাও প্রকৃতি-রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও বা মানুষের স্পর্শ। শৈশবে শিশু প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমেই সব কিছু শিখবে, আর শিক্ষকের কাজ হবে এই দুইএর মধ্যে যোগসূত্র রচনা।

ভাষা-শিক্ষা

ভাষা-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের প্রয়োজন কম নয়। পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই প্রথমেই শিশুদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাক্য সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়ে দিতে হবে। বাক্য থেকে ক্রমশ শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়াই আধুনিক রীতিসম্মত। বাক্যগুলি এমনভাবে একে একে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে বাক্যের মধ্য থেকে সে একটা অর্থ খুঁজে পায়। তার কাছে যা অর্থহীন, যা তার অভিজ্ঞতার বাইরে, তা শেখা তার পক্ষে সহজ নয়। ক্রমশ পরিচিত শব্দের মধ্যে দু'-একটি ক'রে নতুন শব্দ দিয়ে জানা থেকে অজানার দিকে শিশুর যাত্রা শুরু করতে হবে। আদর্শ পাঠ দিয়ে শিশুর পঠনে উৎসাহ জাগাতে হবে। এর জন্য শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে গোড়া থেকে নজর দিয়ে তাদের কথার জড়তা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। প্রথমে শিশুরা স্বভাবত বানান ক'রে পড়ে। পরে, অভ্যাস গঠনের পর তারা একসাথে সমস্ত শব্দটিই পড়তে পারে। একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে শিশুর দেরি হয়। সেজন্য শিক্ষককে ধৈর্যহীন হলে চলবে না।

প্রথমে পরিচিত শব্দসমষ্টিকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষা শুরু হবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম লেখা কার্ড থেকে নাম পড়তে শিখবে। কোনো শিশুর যদি এই অবস্থাতে আগ্রহ না মেটে, তবে তাকে আরও পড়তে দিতে হবে।

পড়ানোর কোনো নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

যেভাবে যে শিশু আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে, সেইভাবে তার পড়া শুরু করা উচিত। তবে শিশুর আগ্রহ সাধারণত বাক্যের দিকে, খণ্ড খণ্ড পদের দিকে নয়। তাই বোধ হয় বাক্যকেন্দ্রিক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। নিম্নলিখিত প্রণালীতে শিক্ষা শুরু করতে হবে ঃ

(১) বাক্য দিয়ে পড়া শুরু করতে হবে ;
(২) শব্দগুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় ;
(৩) পাঠে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকবে না ;
(৪) পুনরাবৃত্তির জন্যে শব্দগুলির পুনরুল্লেখ থাকবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বর্ণমালা না শিখে কিভাবে শিশু প্রথমেই বাক্য শিখবে। কিন্তু শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অনুসারে শিক্ষা দিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলির সঙ্গে তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিচয় ঘটে। বাক্য ও বর্ণ নিয়ে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। উদ্দেশ্য হবে বাক্য ও শব্দ-পরিচয়। ভাষা-শিক্ষার পথে গল্প ও ছড়ার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে ক্রমে শিশুদের ভাষা-শিক্ষার আগ্রহ জাগবে।

শিশুরা যখন প্রথম স্বাধীনভাবে পড়তে পারে, সেই সময় তাদের হাতে উপযুক্ত বই তুলে দিতে হবে। বইগুলির ভাষা সহজ হওয়া উচিত। বইগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন, যাতে তা শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক হয়।

দর্শনেন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে শিশু আহরণ করবে জ্ঞানের পাথেয়। তাই এই সময় মৌখিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। তবেই সম্ভব হবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ।

এই স্তরে শিক্ষার মোটামুটি লক্ষ্য হবে ঃ

(১) আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া ;
(২) সৃজনীশক্তির বিকাশ ;
(৩) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ;
(৪) আত্মনির্ভরতা জাগানো ;
(৫) সমাজ-চেতনার উন্মেষ ;
(৬) ব্যক্তিগত সদভ্যাস গঠন (যেমন বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্বজ্ঞান, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি)।

পড়া ও লেখা শেখানোর পদ্ধতি

পড়াশোনা করাবার আগে শিশুর মনকে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করা চাই। অনেকের ধারণা, লেখার আগে পড়া শেখানো উচিত। শিশু স্বভাবতই কাজ চায়, তাই লিখতেও সে ভালোবাসে।

শিশুকে লিখতে শেখাবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

(১) লেখা শেখাবার আগে শিশুদের হাত ও আঙ্গুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি তাদের আয়ত্তে আসা চাই, যাতে তারা রেখার মাধ্যমে সহজে কোনো পরিচিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে।

(২) যে শব্দ শিশুরা শিখবে, তার রূপের সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। লেখার কাজকে সুগম করতে হলে বহু অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই অনেক সময় বালির উপর কাঠের টুকরো দিয়ে আঁচড় কাটতে দেওয়া বা শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে হিজিবিজি কাটা শিশুর লিখতে শেখায় পূর্ব-প্রস্তুতির কাজ করে। প্রথমে হিজিবিজি কাটতে কাটতে যখন অক্ষরের আকৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা জন্মাবে, তখন তাকে অক্ষরে পরিণত করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে।

প্রথম প্রথম অক্ষরগুলি শিশুর কাছে এক একটি ছবি ব'লে মনে হবে। কিন্তু পরে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়বে। এই সময় শিশুকে বালির কাগজ দিয়ে তৈরি অক্ষর দিয়ে তার উপর হাত বোলাতে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলির নামও শিশু উচ্চারণ করতে শিখবে। ফলে, অক্ষরগুলির স্মৃতি শিশুমনে নানারূপে জেগে থাকবে। তাছাড়া, কার্ডবোর্ডের উপর নানারঙে অক্ষরগুলো লিখে শিশুর সামনে একে একে সাজিয়ে দিয়ে সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে শিশু তা আনন্দের সঙ্গেই শিখবে। ফলে, লেখা ও পড়া শেখা এক সঙ্গে চলতে থাকবে। আবার কোন কোন অক্ষরগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেদিকেও শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। যেমন—ব র ক ধ ঝ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে একটি আকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য শিশুদের পড়া-শেখার কাজে এই লিপির পরিচয় প্রথমে না করানোই ভালো।

পাঠকে উপভোগ্য ক'রে তুলতে হলে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, তার আঙ্গিককেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলা প্রয়োজন। বই-এর ছাপা থেকে শুরু ক'রে মলাট পর্যন্ত সবকিছু লোভনীয় হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে শিশুদের জন্যে যে বই লেখা হবে তার পাতায় পাতায় রঙিন ছবি থাকবে আর ছাপার অক্ষরগুলিও বেশ বড় বড় ও সুদৃশ্য হবে।

যদি শ্রেণীতে শ্রুতিলিপি দেওয়া যায় তবে লেখা ও পড়া দুটি বিষয়েই সাহায্য হয়। শ্রুতিলিপি যে শুধু শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় ও মাংসপেশীর মধ্যে সংহতি স্থাপন করে তা নয়, পড়তেও সহায়তা করে। নিজের লেখা দেখে ও প'ড়ে সে নিজেই আনন্দ পায়। ভাবে, কি ক'রে শব্দকে সে রেখায় রূপ দিল। তবে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতদিন না শিশুরা তা অনায়াসে পারে, ততদিন যেন প্রথমে বেশ কয়েকটি কথা একমনে শুনে তার পরে লিখতে চেষ্টা করে। লেখার সৌষ্ঠবের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। একে একে সে আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে। যেসব গল্প ও রূপকথা সে শুনবে সেগুলি তার মনে কল্পনার রঙ লাগাবে ও পাঠ-সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে। ক্রমশ সে নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করবে।

শিশু যখন আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে তখন তার অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনো রূপ-কথার গল্প, কখনো পৌরাণিক আখ্যান, কখনো ছড়া, কখনো কবিতা, কখনও বা ছোটখাট নাটকের অংশ প্রস্তুতীকরণ হিসেবেই উপস্থাপিত করা যায়। এতে শিশুর কল্পনার প্রসার হয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ক্রমশ তার দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করা ও তাকে আরও বাস্তবের উপযোগী ক'রে তোলবার প্রয়োজন আছে।

গণিত-শিক্ষা

গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। কিন্তু এই দুই শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যৎ। বাস্তব জীবনে হিসেব-নিকেশের প্রয়োজন আছে। গণিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুর কার্য-কারণ বোধ জন্মায়, আত্মবিশ্লেষণের দিকেও শিক্ষার্থী সজাগ হয়ে ওঠে।

প্রাত্যহিক জীবনে গণিতের প্রয়োজন অস্বীকার করবে কে! গৃহ ও বিদ্যালয়ের কাজে হিসেব-নিকেশের মূল্য কম নয়।

গণিত শেখানোর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মনে আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময় ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরতে হবে। মুদ্রা পরিচয়, রৈখিক পরিমাপ, সংখ্যা গণনা প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহ ও সুযোগ দিতে হবে।

ছড়া ও খেলার সাহায্যে গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। একে একে শিশুকে দিন-পঞ্জীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলে সে সংখ্যাগুলি সানন্দে বলবে। মোটকথা, সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশুকে যেমন বুঝিয়ে দিতে হবে, তেমনি তার দলগত অর্থও তাকে বোঝাতে হবে।

এজন্যে নানারকমের সংখ্যা চিহ্নিত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে। তেঁতুল বিচি, কড়ি বা কুঁচ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার অর্থ যেমন শিশুমনে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া যায়, তেমনি পুঁতির মালা দিয়ে সংখ্যার দলগত অর্থও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ক্রমশ যোগ, বিয়োগ ও সমান চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার প্রথম সোপান নির্মিত হবে। দোকানে দোকানে খেলার জিনিস দেখা ও খেলার সাহায্যে, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে, গণিত-শিক্ষা অগ্রসর হবে।

সংখ্যা-গণনা, যোগবিয়োগ-শিক্ষা সম্পর্কে Abacusএর ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রসূ। এইজন্যে পুঁতির মালা ও অনুরূপ কোনো জিনিসের ব্যবহার করা যেতে পারে। চৌকো আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে দশটি তার লাগানো থাকে এবং প্রত্যেকটি তারে দশটি ক'রে ছিদ্রযুক্ত বিভিন্ন রঙ করা বল লাগানো থাকে। সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে শিশুরা গুণতে শিখতে পারে। হাতের কাজ ও অঙ্ক শিক্ষা এবং বিশেষ ক'রে গণনা এক সঙ্গে চলতে পারে।

যখন সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে, তখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্ধভাবে তাদের যোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না ব'লে শিশুকে লিখিত কার্ডের সাহায্য নিতে বললে ভালো হয়। আর এই কার্ডগুলি শিক্ষককেই তৈরি ক'রে দিতে হবে। যোগ-বিয়োগের সঙ্গে গুণ-ভাগের সম্পর্কও শিশুমনে প্রথমেই স্পষ্ট

ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই স্তরে শিক্ষকের ধৈর্য হারালে চলবে না। কারণ, সমস্ত গণিত-শিক্ষার ভিত্তি এই যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা

প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তারই মাঝে লুকিয়ে আছে শিক্ষার সামগ্রী। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা কিছু লুকিয়ে আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কাজ।

একে একে শিশুর দৃষ্টি ফিরবে পরিবেশের দিকে, মানুষের সৃষ্টির দিকে, সমাজের দিকে। ক্রমশ সে বুঝতে শিখবে, অতীত থেকেই বর্তমানের জন্ম। ফেলে-আসা দিনের কথা জানতে শিশু কৌতূহলী হবে। অতীতের কাহিনী, দেশবিদেশের কথা, পুরোনো দিনের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি জানবার আগ্রহ কার না জাগে!

গ্রামের ভাঙ্গা মন্দির, প্রাচীন দেবালয় প্রভৃতি কেন্দ্র ক'রে শুরু হবে শিশুর ইতিহাস-শিক্ষা। কালের অমোঘ প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটে, তা শিশু-মনকে কল্পনালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

ইতিহাস-শিক্ষার গতানুগতিক পুরোনো পদ্ধতি আর যাই হোক মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই শিশুর অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে ভিত্তি ক'রে গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন কাহিনী ও সেকালের কথা পরিবেশন করলে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ হয়। ইতিহাস-পাঠনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে,
(খ) নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে, এবং
(গ) কাজের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের কাহিনী শিশুমনে রেখাপাত করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অসংলগ্ন কাহিনীর পরিবেশন বিশেষ সার্থক হয়ে ওঠে না। তাই যখন কোনো কাহিনী পরিবেশন করা হবে তখন পরিবেশকের প্রধান লক্ষ্য হবে ঘটনার ক্রমবিকাশের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা।

নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস শেখাতে গেলে দুই ভাবে তা সম্ভবপর হতে পারে :

সমাজের ঘটনাক্রম অনুসারে বিষয় নির্বাচন করা ছাড়াও প্রসঙ্গ নির্বাচন ক'রেও তা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় শিক্ষককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইতিহাস শেখানোর নতুন পদ্ধতি হ'ল ক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। কাজের ভেতর থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে তাই হবে ইতিহাস শেখার মূল উপাদান।

পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর দৃষ্টি প্রসারিত হবে। ফলে, ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করবার পথ হবে প্রশস্ত। পল্লী বা নগরের পরিক্রমাকে কেন্দ্র ক'রে মানচিত্র রচনায়, নানারূপ তথ্যমূলক ছবি ও লিপি সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে এইভাবে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করা।

প্রথম শৈশবে গতানুগতিক ইতিহাস শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় না। তথ্যের চাপে তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই দেশ-বিদেশের আবিষ্কার ও ভ্রমণ-কাহিনী শিশুদের কাছে পরিবেশন করতে হবে। নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা সহজ ও সরস হয়ে ওঠে। নয় বছর পর্যন্ত ইতিহাস শেখা এইভাবে চলবে। তারপর নানা উপায়ে ইতিহাস শেখা আরম্ভ হতে পারে। পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে, স্থানীয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলি দেখে ও বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষার্থীর পক্ষে ইতিহাস শেখা খুবই সুগম হয়।

কোনো পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ক'রেও ইতিহাস শেখানো সার্থক হয়ে ওঠে। ইংরাজীতে একে বলা হয় Project Method। অভিনয় ও বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে তাই একে "কার্য-সমস্যা পদ্ধতি" বলা হয়। এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী।

মোটকথা, আজ ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে। ইতিহাস কেবল যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণীই নয়; তার মধ্যে আছে সাধারণ মানুষের কান্না-হাসির কাহিনী, সমাজ-সংসারের চিত্র। মানুষের পদক্ষেপকে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস-পাঠন বাঞ্ছনীয়।

ভূগোল শেখানোর পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ হবে। কারণ, কেবল জল-স্থলের বিবরণই ভূগোল নয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কিভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রছে, কিভাবে মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে অনুকূল ক'রে তুলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল শেখাতে হবে।

ভূগোল-শিক্ষা আজ মানবকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে ভূগোল-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিজের বাসস্থান ও পল্লীকে ঘিরে শুরু হবে ভূগোল-শিক্ষা। আর ঋতু, আবহাওয়া, সূর্যের উদয়-অস্ত—এসব দিকে একে একে শিশুর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গ্রামের কাছাকাছি নদী, হ্রদ, পাহাড় ও জঙ্গল থাকলে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে শিশুর দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। রাতের তারাভরা আকাশের দিকে, বেলাশেষের আলোছায়ার দিকে, ঋতু-পরিবর্তনের দিকে একে একে শিশুকে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। ক্রমশ তার দৃষ্টি হবে প্রসারিত—পল্লী থেকে নগরীর দিকে, প্রান্তর থেকে মরুর দিকে, দীঘি থেকে হ্রদের দিকে, স্তূপ থেকে পাহাড়ের দিকে।

সাধারণ বিজ্ঞান-পাঠন

পাঠ্যতালিকার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-পাঠের উদ্দেশ্য হবে—(ক) শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশে সাহায্য করা ; (খ) ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা ; ও (গ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলা।

প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা আছে। কারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ঘিরেই শুরু হবে তার বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা। বিজ্ঞান-পাঠনের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ

(ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—হাতে-কলমে সবকিছু পরীক্ষার দ্বারা প্রকৃতিরাজ্যে পর্যবেক্ষণ ক'রে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তা হ'ল তার বিজ্ঞান-শিক্ষার পরম পাথেয়। ক্রমশ জীব ও জড় জগতের দিকে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে পড়বে।

(খ) বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমে—শ্রেণীতে, বিশেষ ক'রে নানা আয়োজনের মাধ্যমে, বিজ্ঞান-শিক্ষা দিলে অনেক সময় তা অধিক ফলপ্রসূ হয়। ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আনন্দই পাবে।

অবশ্য শিক্ষার্থীকে নানা উপকরণ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে —যেমন, জলঘড়ি, বায়ুর গতিপথের নির্দেশক, ছোটখাট যন্ত্র ইত্যাদি। মোটকথা, শিক্ষকের মৌলিকতার উপর শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ে অনুরাগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

স্থানীয় নমুনা সংগ্রহ থেকে শুরু ক'রে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পর্যন্ত তৈরি করবার নানা নমুনা সংগ্রহ করবার জন্যে তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা পদ্ধতি

মানুষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হ'ল ভাষা। মনের ভাব প্রকাশের জন্যে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে মানুষের প্রকাশের সাধনা। আর তাই গ'ড়ে উঠেছে সাহিত্য, ছন্দ, অলঙ্কার। যা কিছু সুন্দর মানুষের মন তাকে স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছে অক্ষরের মাধ্যমে।

ভাষা ভাবের বাহকমাত্র; সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার সার্থক রূপায়ণ। তাই কেবল ভাষা শেখানোর পদ্ধতির চেয়ে সাহিত্য শিক্ষা-পদ্ধতি আরও দুরূহ।

কোনো মনীষী বলেছেন, রচনাভঙ্গির মাধ্যমেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। তাই সাহিত্য-পাঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে লেখকের অনুভূতিকে মূর্ত ক'রে তোলা। আর এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে শিক্ষণের বৈচিত্র্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

ভাষা শিক্ষা হ'ল মূলত অভ্যাসমূলক। তবে প্রত্যেক ভাষা-শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। কেবল প্রকাশের শুদ্ধিই সব নয়। প্রকাশের সৌন্দর্যকেও সামনে রাখতে হবে।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হওয়া উচিত। শিক্ষাপদ্ধতিকে বাঁধাধরা ছাঁচে ফেললে ভুল করা হবে।

ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য তাই আজ প্রসারিত হয়েছে; সে কেবল শব্দ ও বাক্যবিন্যাসেই আবদ্ধ নয়। ভাষা ভাবরাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান বাহক। তাই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কোনো স্পষ্ট সীমারেখা না রেখে প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভালো।

প্রথম প্রশ্ন হ'ল, মাতৃভাষা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? কারণ, এই

প্রশ্নের মীমাংসা না হলে তার পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা সার্থক হবে না।

মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। মাতৃভাষাকে তাই শিক্ষার প্রধান সহায়ক ব'লে ভাবতে হবে। ভাব ও ভাবনা, কল্পনা ও চিন্তা মাতৃভাষাকে আশ্রয় ক'রেই পরিপুষ্ট হয়। তাই মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা জানা দরকার ঃ

(ক) শিক্ষার্থীজীবনের বিকাশ ;

(খ) ভাবের উন্মেষ-সাধন ;

(গ) প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি, জাতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগবৃদ্ধি ;

(ঘ) আত্মপ্রকাশে সহায়তা করা ;

(ঙ) মার্জিত রুচি, সাহিত্যপ্রীতি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির উন্মেষ।

ভাষা-শিক্ষার ভিন্ন স্তর—বিশ্বের সঙ্গে নিত্যনূতন পরিচয়ে তিলে তিলে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হতে থাকে। আর সেই অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে। এই অভিজ্ঞতাকে শুধু কোনোমতে বর্ণনা করাই নয়, তার শুদ্ধ ও সংহত প্রকাশ ভাষা-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই ভাষা-শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আসে আর তা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার পথে সহায়তা করে।

ভাষায় রূপায়ণের আগেই অভিজ্ঞতার ক্রমবিন্যাসের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা অর্জন, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণ ও সেই সম্বন্ধকে অন্য নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার শক্তি প্রকাশের পেছনে থাকা চাই। তারপর প্রকাশের কথা। কি প্রকাশ করব ও কিভাবে প্রকাশ করব ?

কি প্রকাশ করব ?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয় যে, যাকে প্রকাশ করতে চাই তা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আবার অনেক সময় অনুভূতি-জাত। কিন্তু যাই প্রকাশ করতে চাই না কেন, বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে না জানলে প্রকাশের দৈন্য এসে যায়। তাই বিষয়ের সম্যকজ্ঞান ও বোধের স্পষ্টতা ভাষা-শিক্ষার পথে বিশেষ উপাদান।

কি ভাবে প্রকাশ করব ?—ভাষা-শিক্ষায় মূলত শব্দ-সম্পদ ও তার অর্থবোধ, শব্দের যোজনা, বাক্যবিন্যাস ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ, রসবোধ ও কল্পনার প্রয়োজন হয়।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতি বড়ই জটিল। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর পদ্ধতিও তাই বিভিন্ন। আর এই পদ্ধতি নির্ভর করে লক্ষ্যের উপর। তাই আগে উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে। যদি প্রকাশের শুদ্ধিই ভাষার একমাত্র লক্ষ্য হয় সে এক কথা, আর যদি ব্যঞ্জনা, কল্পনা, মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় তবে তার আয়োজন হবে স্বতন্ত্র।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও চিত্তবৃত্তিকে ভুলে গিয়ে শিক্ষা দিলে তা কোনোদিনই কার্যকরী হয় না। তাই শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ধারা নির্ধারিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) শ্রেণী, বয়স ও চিত্তবৃত্তির কথা ভেবে শব্দসম্পদের সঙ্গে পরিচয় করানো ;
(২) শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণের শক্তি জন্মানো ;
(৩) শব্দ ও শব্দচিত্রের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রচনা করা ;
(৪) শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের দিকে সজাগ করা ;
(৫) বিষয়বস্তুর সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে দেওয়া ;
(৬) ভাববিন্যাস ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ;
(৭) রসবোধ ও কল্পনাকে প্রকাশের মাধ্যমে রূপ দিতে সহায়তা করা।

সংক্ষেপে ভাষা ও সাহিত্য শিখবার পথে যেসব স্তর অতিক্রম করতে হয় সেগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীকে বিশেষ প্রস্তুতি করিয়ে দিতে হবে।

প্রথমেই ভাষাতত্ত্বের কথা আসে। প্রকাশের শুদ্ধি ও সংহতি এর মূল লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচিতি—বানান, অর্থবোধ সব কিছুরই সার্থকতা আছে। তারপর আসে শব্দ-প্রয়োগ ও প্রকাশের কথা। যখন প্রকাশের শুদ্ধি আসে তখন তাকে সহজ ও সুষ্ঠু করবার জন্যে বাক্য-সম্প্রসারণ ও ছোট ছোট রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাখ্যা,

ভাব-সংক্ষিপ্তকরণ, সম্প্রসারণ, প্রবন্ধরচনা একে একে ভাষা-শিক্ষণের সহায়ক হয়ে ওঠে।

ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য ও বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত হবার পরে আসবে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা।

ভাষা-শিক্ষার ক্রম: বলা, পড়া, লেখা। পড়ার আগেই কথা বলা শুরু হয়। তাই মাতৃভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হয়। শুদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণ করতে করতে শিশু ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর হয়। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কথোপকথনের মূল্য সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এর উপযোগিতা যথেষ্ট।

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ দু-রকমের পড়া প্রচলিত আছে—একটি বিস্তারিত, আর একটি ব্যাপক। শ্রেণী-পাঠনায় বিস্তারিত পাঠের সার্থকতা থাকবেই। তবে ব্যাপক পাঠেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। যাতে সাহিত্যে ও ভাষায় অনুরাগ জন্মায়, যাতে পাঠ্যসূচীর বাইরেও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্পৃহা বাড়তে থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণের অভ্যাসের প্রয়োজন। এজন্যে নানা উপায়ে পাঠে অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়ে দিতে হবে। নানা বিষয়ের বই পড়তে পড়তে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়ে যাবে এবং পরোক্ষভাবেও তার মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে বলবার ও শিখবার অবকাশ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই আত্মপ্রকাশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি আসবে। ক্রমশ কথা, লেখা ও পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শব্দ-পরিচিতি হবে। কিন্তু পড়ার মাধ্যমে যে শব্দ-পরিচিতি হবে তার সক্রিয় প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। তাই অনেক সময়ে শব্দ-পরিচয় হলেও সেগুলি সক্রিয় শব্দ-সম্পদে (Active Vocabulary) পরিণত হয় না। শব্দ, ধ্বনি ও বস্তুর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই শব্দের প্রয়োগ করলে তবেই শব্দ-সম্পদ প্রকৃত সম্পদ ব'লে পরিগণিত হতে পারে। ভাষা যে চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একথা আজ মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন। তাই চিন্তাকে ব্যক্ত ভাষা থেকে ভিন্ন বলা যায়। অনেক সময় চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ব্যবধান খুবই সূক্ষ্ম হয়। চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে

শব্দের পৃথক সত্তা স্বীকৃত নয়। প্রকাশের পথে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। যাদের অভিজ্ঞতা অল্প, তাদের কাছে কেবল শব্দ-পরিচিতির মূল্য বেশি নয়।

একদিকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অপরদিকে প্রকাশের জন্যে শব্দ-সম্পদ—এই দুই-এর সংহতি না হলে ভাষাকে আয়ত্তে আনা কঠিন। আবার ভাষার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু বিন্যাস ও সংহতি আসে। প্রকাশ করতে হবে বলেই অনেক সময় অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করবার প্রয়োজন হয়।

শব্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তাই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে, যাতে চিন্তা ও বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হ'ল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রকাশ করতে বা বুঝতে সহায়তা করা। শব্দসম্পদ কেবল সেই প্রকাশের পথে সহায়তা করবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, কি ক'রে স্বাধীন প্রকাশকে ও উপলব্ধিকে পরিপুষ্ট করা যায়? প্রকাশের মাধ্যম অনেকগুলি। ভাষণে শুদ্ধ উচ্চারণের একান্ত প্রয়োজন। তাই গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি কথাকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মানুষের মন খণ্ডছিন্নকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না। একটি সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে ধারণা জন্মালে তারপর খণ্ডছিন্ন অংশগুলির সার্থকতা হয় ও পারস্পরিক সম্পর্কবোধ সহজ হয়ে আসে। এজন্যে সাম্প্রতিককালে পৃথকভাবে শব্দের সঙ্গে পরিচিত না করিয়ে বাক্যের মাধ্যমে শব্দ-পরিচিতির দিকে লক্ষ্য পড়েছে। শিক্ষাদান শুরু করা উচিত কথন-স্তর থেকেই। কথন ও কাজ এই দুইএর মধ্যে সংহতি সাধন করা দরকার। মোটকথা, শিক্ষার্থীর জন্যে এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যা অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। এইভাবে শিক্ষার্থীমন পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। কথা, কাজ ও খেলার স্তর থেকে ক্রমশ তার মন উন্নীত হবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে। তার এই উদ্দেশ্যাত্মক আচরণই শিক্ষকের লক্ষ্য হবে। মোটকথা, কথন, পঠন, লিখন এই ত্রিধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিযান হবে, এবং তার শুরু হবে বাক্য থেকে; ক্রমে বাক্য থেকে শব্দে এবং শব্দ থেকে বর্ণে তার উত্তরণ হবে। শব্দ-পরিচিতির সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ জড়িত, আর শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগের সঙ্গে উচ্চারণ ও বানানের প্রশ্ন জড়িত।

বলা, লেখা, পড়া এই তিনটিরই প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রতীকের সঙ্গে পরিচিতি। আর বানানের কাজ হ'ল প্রতীককে ঠিকমতো ব্যবহার করা। ঠিকমতো বানান শেখার পথে শুদ্ধ উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়, স্মৃতি ও স্নায়ুশক্তির উপর বানানের শুদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তাই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, লেখা চাই, শোনা চাই।

বানান ভুলের দ্বিতীয় কারণ শিক্ষার্থীদের অসতর্কতা। তাই যখনই সে কোনো কিছু পড়বে বা দেখবে তখনই সে তা ভালো ক'রে দেখবে। লেখবার সময়েও তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন।

পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের চোখ পংক্তির উপর স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে না। অনেক সময় পরিচিত শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা পড়ি না। শব্দের সামগ্রিক রূপই আমাদের মনে শব্দ-বোধ আনে। আবার কখনো কখনো আমাদের চোখ শব্দের একটি বিশেষ অংশে নিবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক অক্ষর অগোচরে রয়ে যায়। অনেক সময় চোখের চলাচলে ব্যাঘাতও ঘটে। এই সব কারণে বানান অশুদ্ধ থেকে যায়।

তাই যাতে শৈশব থেকে প্রত্যেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে, যাতে অক্ষরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থী পড়া অভ্যাস করে ও সতর্ক দৃষ্টি দেয়, সেজন্যে তাদের উৎসাহিত করার প্রয়োজন। খুব তাড়াতাড়ি পড়তে গিয়েও অনেক সময় অক্ষর বাদ প'ড়ে যায়। তাই কোন শিক্ষার্থী কিভাবে পড়ার অভ্যাস করে, তাদের দৃষ্টি বানানের দিকে সজাগ কি না, সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষককে বানান ভুলের নানা প্রতিরোধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে।

বানানকে যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন। এর জন্যে নানা তালিকা ও শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়তার সুযোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা ক'রে নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডারকে একে একে সামনে তুলে ধরতে হবে। বয়স অনুপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা স্থির ক'রে নিয়ে কাজে এগুনো দরকার। ক্রমশ এই শব্দ-পরিচিতি যতই ব্যাপক হবে ততই তার অনুশীলনের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থী কি কি শিখবে?

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ; (খ) কাব্য ও সাহিত্য; (গ) ছন্দ ও অলঙ্কার।

ছয়

শিক্ষণ-প্রণালী

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর দুটি দিক আছে। ইংরাজীতে তাই একে বলা হয়েছে "Bipolar process"। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার একটি 'pole' হ'ল শিক্ষার্থী, আর একটি শিক্ষক। এই দুই-এর মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ফলে শিক্ষার সঞ্চার হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, এর মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির স্থান কোথায়? শিক্ষক যখন কোনো কিছু অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে দিতে চাইবেন তখন তিনি তা নানাভাবে দিতে পারেন। কিভাবে এই শিক্ষা দিলে তা কার্যকরী হবে, শিক্ষাপদ্ধতি সেই কথাই ব'লে দেয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষা দেবার কোনো বাঁধাধরা পথ নেই। কারণ, 'Teaching is both an art as well as a science' —এখানে যেমন কলাকৌশলের দরকার তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে কেউ কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু তাতেই যে তাঁর সাফল্য আসবে এমন কোনো কথা নেই; কারণ শিক্ষার artএর দিকটা আয়ত্ত করা সহজ নয়।

অনেকে ব'লে থাকেন যে, Teachers are born and not made। এঁরা অবশ্য চরমপন্থী। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষণের কোনো উন্নতি হতে পারে। তবে একথা সত্য যে, এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা বিশেষ কোনো training বা অনুশীলন ছাড়াও শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জোগাতে পারেন বা তাদের মনে দোলা দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। একবার বৃটেনের এক শিক্ষা-অধিবেশনে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যখন পুরোমাত্রায় আলোচনা চলেছে, তখন তার মধ্যে থেকে এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ব'লে উঠলেন, 'আমরা Method সম্পর্কে বেশি মাথা ঘামাচ্ছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি Teaching is mainly an inspiration।' মনে হয়, অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর এই কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকিয়ে আছে।

শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, আগে শিক্ষকের শিক্ষার্থী সম্পর্কে জ্ঞান ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকার দরকার। এই দুটি পাথেয় না নিয়ে শিক্ষণের পথে এগিয়ে যাওয়া বিড়ম্বনা। এ না থাকলে কোনো শিক্ষাপদ্ধতিই কার্যকরী হবে না।

শিক্ষাপদ্ধতির মূল নীতি

একথা আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, বিষয়জ্ঞান থাকলেই শিক্ষা দেওয়া যায় না ; বিষয়বস্তুকে কিভাবে তুলে ধরতে হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষকের তাও জানা চাই। তাই শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি মূল নীতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতেই হবে। প্রথমত, যে কোনো শিক্ষণের কাজে মনে রাখতে হবে যে, জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়াই হচ্ছে শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যা জানে, যে অভিজ্ঞতা তার আছে, তাকে কেন্দ্র ক'রে নতুন অভিজ্ঞতা দেবার প্রয়াসে শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। এজন্যে ক্রমশ সরল থেকে জটিল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষকের কর্তব্য। সহজ থেকে কঠিনের, কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয়ের অবতারণা ক'রে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরিবেশন করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগাতে পারলে শিক্ষণ অনেকখানি সহজ হয়। তাই শিক্ষার্থী যা জানে, যা পারে সেখান থেকে শুরু করতে দিলে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। ক্রমে সে চলার নেশায় মেতে ওঠে। তখন তার সরল অভিজ্ঞতাগুলোকে অবলম্বন ক'রে জটিল বিষয়ের অবতারণা করলেও সে তাকে গ্রহণ করতে পারে। এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রে হার্বার্ট আয়োজন, উপস্থাপন ও অভিযোজন এই তিনটি স্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ পাঠটীকার এই যে সোপান থেকে সোপানে পৌঁছোবার নীতি তার মূলেও আছে একই চিন্তা, একই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি।

অনেকে বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বিমুক্ত জ্ঞানে পরিক্রমণ শিক্ষানীতির দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণা করার শক্তি জন্মায় না। এজন্য অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত

জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'রে প্রাথমিক স্তরে এই নীতি অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজন। যেমন গণিতে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের বিমূর্ত জ্ঞান পরিবেশন করবার আগে পাথরের নুড়ি, তেঁতুলের বিচি, কাঠের ব্লক, ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর জিনিস দিয়ে যোগ-বিয়োগের তথ্যটি বোঝানো সহজ। মণ্টেসরি, ফ্রয়েবল্ প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌দের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এই মূলনীতি অনুসৃত হয়েছে।

যে কোনো জটিল বিষয় বোঝাতে গেলে প্রথমেই তাকে বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন হয়। বিষয়টি বিশ্লেষণ ক'রে তাকে খণ্ডখণ্ড ভাবে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে তার কাছে বিষয়টির নানাদিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। এবার সেই বিচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোজনের দরকার হয়। তা না হলে খণ্ডখণ্ড অভিজ্ঞতা কোনো কাজে আসে না। একটা সামগ্রিক রূপ যদি ফুটিয়ে তোলা যায়, তবে শিক্ষার পক্ষে তার মূল্য অনেকখানি। তাহলেই দেখা যায় যে, প্রথমে বিশ্লেষণ ও তারপর সংযোজন বা সংশ্লেষণ—এই দুই-এর মধ্যে সমন্বয় করলে শিক্ষা-প্রক্রিয়া পূর্ণ হয়।

কোনো জ্ঞানই শিশুর কাছে প্রথমে স্পষ্ট হয়ে আসে না। একটা অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা ধারণা প্রথমে তার মনে উঁকি দেয়। এই ধারণাকে পাঠের মাধ্যমে স্পষ্ট ক'রে তোলার প্রয়োজন। অনির্দিষ্ট জ্ঞান থেকে নির্দিষ্ট জ্ঞানে যেতে হলে নানা উদাহরণ ও শিক্ষার উপকরণের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এই যে অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাত্রা (from indefinite to definite), এরই ফলে অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়।

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে অংশের জ্ঞানের দিকে ক্রমশ যাওয়াই সমীচীন। প্রথমে শিশুর কাছে বস্তুর একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধ'রে সে সম্পর্কে তাকে একটা ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন। তারপর জ্ঞান যত গভীর হয় ততই সমগ্রের খণ্ডগুলি সম্বন্ধে তার ধারণা জন্মায়। এতে শিক্ষা অর্থপূর্ণ হয় ও শিক্ষার্থীমনের একটা প্রেরণা বজায় থাকে।

অভিজ্ঞতাই শিক্ষার মূল উপাদান। সেই অভিজ্ঞতাকে ঘিরে মানুষের আরও সূক্ষ্মবুদ্ধির উন্মেষ করাই বাঞ্ছনীয়। প্রথমে শিশু যে অভিজ্ঞতা

লাভ করে, তার মধ্যে কোনো বিচার-বিবেচনা বা যুক্তির স্পর্শ থাকে না। তাই প্রথমেই যুক্তিনিষ্ঠভাবে কিছু শেখাতে গেলে শিশু সহজে তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে শেখাতে হবে। এইভাবে একে একে শিশু-মনের বিকাশ হবে; তার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্মেষ হবে। মোটকথা, মনস্তত্ত্ব-নির্ভর পথ থেকে যুক্তিসিদ্ধ পথে (from psychological to logical) যাওয়াই সুবিধাজনক, কারণ তা হবে শিশুমনের চাহিদা অনুযায়ী। যেমন, শিশুর অক্ষর পরিচয়ে যুক্তিসিদ্ধ পথ হ'ল আগে বর্ণমালা শিক্ষা ও পরে শব্দ-শিক্ষা; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক পথ হ'ল আগেই শব্দ শিখে পরে বর্ণে যাওয়া।

অনেক সময় বিশেষ থেকে সাধারণে (from particular to general) গেলে শিশুর কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ, বিশেষ বিশেষ উদাহরণ থেকে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করবে, সেগুলোকে একত্র ক'রে তার মধ্যে থেকে একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা তার পক্ষে সহজ হয়।

এইগুলি হ'ল শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতি। অবশ্য এমন কোনো কথা নেই যে, এই নীতিগুলি সবক্ষেত্রে সবসময়ে প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে এগুলোর একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে ব'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান এদের প্রয়োগকে ব্যাহত করতে পারে না।

শিক্ষাদানের কৌশল

বহুদিন থেকে শিক্ষাদান কথাটি প্রচলিত। সত্যই কি আমরা শিক্ষা দিতে পারি? শিক্ষা কি দেওয়া-নেওয়ার বস্তু?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। আজ সকলেই বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষা হ'ল শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তির উদ্‌ঘাটন, তার সম্ভাবনার বিকাশ, এবং শিক্ষক সেখানে সহায়ক মাত্র। এই বিকাশের কাজে, এই আত্ম-উদ্বোধনের পথে, শিক্ষক কিভাবে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারেন এটাই আমাদের আলোচ্য।

প্রথমে, শিশুমনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হলে আগে শিশুকে জানতে হবে। আগে তার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হতে

হবে। তারপর কয়েকটি শিক্ষার সূত্র বেছে নিতে হবে যা অবলম্বন করলে শিশুর আত্মবিকাশ সহজ হবে। এরজন্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজন। কোন বিষয় কি ভাবে তুলে ধরলে শিশু তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই শ্রেণীপাঠনের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। শিক্ষাদানের কৌশল হিসেবে যে কয়েকটি রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে, তাদের মধ্যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, উত্তর দেওয়া, দৃষ্টান্ত দেওয়া, শিক্ষার উপকরণ প্রয়োগ করা ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীপাঠনের কৌশলের নাম করা যেতে পারে। এছাড়া আলোচনা, প্রজেক্ট-পদ্ধতি ইত্যাদি আরও কয়েকটি পদ্ধতিও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজ্য।

শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মূল্য যথেষ্ট। কারণ প্রশ্নের মাধ্যমেই শিশুমনকে বিষয়াভিমুখী করা যায়। অর্থাৎ জানা থেকে অজানার দিকে নিয়ে যেতে হলে আগে তার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে। একে একে ছোট ছোট প্রশ্ন ক'রে তার মনে কৌতূহল জাগাতে হবে। পাঠদানে এই কৌতূহল-সৃষ্টি একটি বিশেষ কাজ।

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদানের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিক্ষার যে তিনটি উপায় প্রাচীন ভারতে নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে পরিপ্রশ্নের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে ("প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া")। প্রাচীন গ্রীসেও দেখা যায় যে, সক্রেটিস প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন ও ক্রমশ তাকে শিক্ষার পথে নিয়ে যেতেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে এই প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতির উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন।

প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি বহুদিন থেকে প্রচলিত, আর তার উপযোগিতাও সর্বক্ষেত্রেই স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কার্যকরী। শিক্ষক কেবল বক্তৃতা দিয়ে যাবেন আর শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতা হয়ে তা শুনবে—এই প্রক্রিয়ায় মনে কোনো আন্দোলন হয় না। বরঞ্চ শিক্ষক যদি প্রশ্ন ক'রে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে

পারেন, মনকে সপ্রতিভ ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে শিক্ষার কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীদের তথ্য পরিবেশন করাই কেবল নয়, কৌশলের সঙ্গে তাদের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোজন সাধন করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। আর এই কাজটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুগম হয়। শিক্ষণ মানেই হ'ল এমন প্রশ্ন করা যার ফলে শিক্ষার্থীর মন নাড়া পাবে, সে যথানির্দিষ্ট প্রণালীতে চিন্তা করতে শিখবে। অবশ্য ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে উপযুক্ত প্রশ্ন প্রণয়ন করা খুব সহজ নয়। এই কাজে একটা কৌশল ও উচ্চশ্রেণীর শিল্প-প্রতিভা দরকার।

প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের খবর জানবেন, তার আগ্রহ উদ্দীপিত করবেন এবং নতুন জ্ঞাতব্য বিষয়টি যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন করবেন। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ভালো প্রশ্ন রচনা করতে গেলে প্রশ্নকর্তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। প্রশ্ন হবে একান্তভাবে মৌলিক, বিষয়াভিমুখী, সুনির্দিষ্ট ও ভাবোদ্দীপক। যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তার সবদিক পরিক্রমা করতে হ'লে প্রশ্নের বৈচিত্র্যের প্রয়োজন সন্দেহ নেই। আলোচ্য বিষয়ের নানাদিকে আলোকপাত করবার উদ্দেশ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন রচনা করা যায়, তার মূল সূত্রটি একটি ইংরাজী প্রবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়—

"I keep six honest serving men :
They taught me all I know :
Their names are what and why, when
And how and where and who."

অর্থাৎ কি, কে, কোথায়, কেমন ক'রে, কখন, কেন, এই ছটি দিক থেকে প্রশ্ন করলে যে কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়। আসল উদ্দেশ্য হ'ল যে, কোনো একটি বিষয়কে সামনে রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর চিন্তাকে একমুখী করা। এই যে উভয়ের চিন্তার মিলন, এটাই শিক্ষার বড় কথা। একদিক থেকে শিক্ষক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বিষয়টির দিকে এগিয়ে চলেছেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর উত্তরের মধ্য দিয়ে তার মন বিষয়াভিমুখী হচ্ছে—এই যে যৌথ প্রক্রিয়া, একে ইংরাজীতে বলা হয় "Intercourse"। বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায় যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে, আর সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) ছাত্র কতটা শিখেছে সে সম্পর্কে ধারণা করবার জন্যে ;
(২) শিক্ষকের পাঠদান শিক্ষার্থীর উপযোগী হচ্ছে কি না জানবার জন্যে ;
(৩) শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মাবার জন্যে ;
(৪) তার চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে ;
(৫) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর অমনোযোগ নিবারণ করবার জন্যে ;
(৬) শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ;
(৭) শ্রেণীতে যা শেখানো হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির জন্যে।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

(১) পাঠ্যবিষয়ের প্রাসঙ্গিক পূর্ব অভিজ্ঞতার সন্ধান নেওয়া ;
(২) নতুন বিষয় উপস্থাপনের জন্যে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগানো ;
(৩) নতুন পাঠ শিক্ষার্থী কতটা আয়ত্ত করতে পারল তার সন্ধান নেওয়া।

প্রশ্নগুলির ধরন কেমন হবে সে সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই দেখতে হবে, এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে যেন প্রশ্নগুলি করা হয়। সেজন্য প্রশ্নগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে করা উচিত। অবশ্য প্রশ্নের ধরন অনেকখানি নির্ভর করবে তার উদ্দেশ্যের উপর। এমন অনেক প্রশ্ন করতে হবে যেগুলি পাঠ্যবস্তুকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ইংরাজীতে এদের বলা হয় Developing questions।

অনেক প্রশ্ন হয় যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বোধের পরীক্ষা করা। যা পড়ানো হয়েছে এমন কোনো বাস্তব ঘটনার উপর প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হয় না। আর এক রকমের প্রশ্ন হতে পারে যা তুলনামূলক প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নে শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। আবার কোনো কোনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা পরীক্ষা করা। সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের বিশেষ সার্থকতা আছে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, অধীত বিষয়ের বোধ, তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রবিশেষে রসাস্বাদন-শক্তির পরীক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রশ্নের অবকাশ আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ, সরল ও স্পষ্ট। যতদূর সম্ভব পাঠ্যপুস্তকের ভাষাকে অনুকরণ না ক'রে চলাই উচিত। তাছাড়া, অকারণ বাক্যবিন্যাসদ্বারা প্রশ্নকে জটিল ক'রে তোলার কোনো সার্থকতা নেই। বিকল্প উত্তর হতে পারে এমন প্রশ্ন না করাই উচিত। আর শুধু হ্যাঁ বা না—এই দুটি কথা দিয়ে যে ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে সে ধরনের প্রশ্নেরও কোনো উপযোগিতা নেই। আবার প্রশ্ন এমনভাবেও করা উচিত নয় যাতে তার উত্তর দীর্ঘ হয়। অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত নয়, আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিও বিশেষ দূষণীয়। একথা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষক যখন প্রশ্ন করবেন তার আগে থেকেই শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন পাবার জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। একটা প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে এই প্রশ্নবাণগুলি প্রয়োগ করতে হবে। তা হলেই দেখা যাবে, একটি প্রশ্নের একবারের বেশি পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রশ্ন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, প্রশ্নগুলি যেন অপ্রাসঙ্গিক না হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যেন একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং তা ক্রমপরিণতির দিকে চলতে থাকে।

কেবল প্রশ্ন করলেই হবে না, কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তাও জানা দরকার। অর্থাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আঙ্গিক (technique) সম্পর্কেও কয়েকটি রীতি পালন করার প্রয়োজন আছে।

কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীকে উপলক্ষ্য না ক'রে সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্থীর উদ্দেশে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর উত্তরটি ভাববার জন্যে অল্প একটু সময় দেওয়ার প্রয়োজন ; কারণ, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চাওয়া অর্থহীন। আর একটা বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো শিক্ষক প্রস্তুত না হয়েই শ্রেণীপাঠনের জন্যে উদ্যোগী হন। এতে পাঠনের কোনো গতি থাকে না। ফলে, শিক্ষার্থীর প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর পরবর্তী প্রশ্নটি ঠিক করার জন্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা অনেক সময় নেন। এতে পাঠ একেবারে প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

আরও কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা দরকার। তাঁকে দেখতে হবে যেন কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী উত্তরের ব্যাপারে আধিপত্য না করে, সব শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন ক'রে দেখতে হবে কারা উত্তর দিতে চায়। কিন্তু তাদের মধ্যেই প্রশ্ন সীমায়িত রাখলে চলবে না। প্রশ্ন সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। শ্রেণীর কোনো বিশেষ ধারা অনুসারে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করাই সমীচীন। যাতে একসঙ্গে শিক্ষার্থীরা একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা না করে সেজন্য শিক্ষকের আগে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া উচিত। যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে বেশি দেরি ক'রে বা ভুল উত্তর দেয়, তাহ'লে তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা না ক'রে শিক্ষক পরবর্তী শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন।

শিক্ষক শ্রেণীতে কিভাবে পাঠ দেবেন ও প্রশ্ন করবেন? অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষক এক জায়গায় হয় নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, নয়তো অনবরত পায়চারি করতে থাকেন। এর কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। চেয়ারে ব'সে পড়ানো শিক্ষকের পক্ষে উচিত নয়। কারণ তাতে শ্রেণীকক্ষ থেকে সব শিক্ষার্থীকে তিনি দেখতে পান না ও ফলে তাঁর শিক্ষণও কার্যকরী হয় না। আরও কয়েকটি নীতি পালন করা শিক্ষকের কর্তব্য। যেমন—প্রশ্ন করার সময় সমস্ত শ্রেণীর উপর শিক্ষকের নজর দেওয়া এবং কোন শিক্ষার্থী প্রশ্নটি কি ভাবে গ্রহণ করছে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। প্রশ্ন করবার সময়ে কোনো কোনো শিক্ষক আঙ্গুল দেখিয়ে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে বলেন; কিন্তু এতে ফল ভালো হয় না। সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে আনন্দময় পরিবেশ গ'ড়ে তোলা ও শ্রেণী-পরিবেশকে মুখর ও কর্মময় ক'রে তোলাই প্রধান উদ্দেশ্য।

মৌখিক শিক্ষাদানের রীতি—শিক্ষণ-কৌশল বলতে কেবল কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র বোঝায় না। শিক্ষকের আত্মপ্রকাশের শক্তির উপর তা অনেকটা নির্ভরশীল। শিক্ষাদানের মধ্যে কয়েকটি রীতির বিশেষ সার্থকতা আছে। শুধু প্রশ্নোত্তরই যথেষ্ট নয়, যে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যে কথন, বর্ণন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্থান উল্লেখযোগ্য।

কোনো কোনো বিষয়কে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হলে প্রথমেই সরস কথনের প্রয়োজন। কথনের উদ্দেশ্য হ'ল, সাধারণ গল্পের আকারে খুব সহজভাবে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর মনের কাছাকাছি নিয়ে আসা। তাই, কথনের নৈপুণ্যের উপর উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে।

শিক্ষকের বাচনভঙ্গি, ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যিক দৃষ্টি ও রসবোধ—এইসব কথনকে উপভোগ্য ক'রে তোলে। কথনের ভাব ও ভাষা শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী হওয়া দরকার। তাছাড়া, যে বিষয়টি কেন্দ্র ক'রে শিক্ষক কিছু বলবেন তার প্রতি বক্তার মমত্ববোধ বা অনুরাগ থাকা চাই। কখনও কখনও নিজস্ব অভিজ্ঞতা মিশিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরলে তা আরও রসসিক্ত হয়।

কথন ও বর্ণনের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকলেও মূলত তারা প্রকাশের দুটি দিক। বর্ণনের মধ্যে আছে একটি বিষয়কে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরবার একটা চেষ্টা। বর্ণনের মাধুর্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ের উপর অনুরাগ জন্মায় আর সেই অনুরাগ তাকে বিষয়ের মুখোমুখী করে। এতে যা প্রথমে অস্পষ্ট ব'লে মনে হয়, তা একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃষ্টি-প্রদীপের আলোয় বিষয়ের আঙ্গিনা উদ্ভাসিত হয়। তখন শিক্ষার্থীর মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। তাই বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই বৈচিত্র্য শুধু তথ্য-পরিবেশনের দিক থেকেই নয়, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, আবেগ ও অনুভূতি—এগুলোও বৈচিত্র্যসাধনে সাহায্য করে। বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না। বর্ণন যেন প্রাসঙ্গিক হয়, সবসময়ই সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি বর্ণনের কাল দীর্ঘ হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে। সেজন্য যতদূর সম্ভব তাকে সংক্ষিপ্ত করার দরকার। অবশ্য কোনো প্রদীপনের সাহায্য (Visual aids) নিলে দীর্ঘ বর্ণনও সরস হয়ে ওঠে।

শ্রেণী-পাঠনের সময় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এমন কোনো কথা নেই যে, শুধু প্রশ্নোত্তরই শিক্ষকের একমাত্র অবলম্বন হবে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে কখনও প্রশ্ন করতে হবে, কখনও ব্যাখ্যা করতে হবে।

যদি বিষয়বস্তু জটিল হয় তাহ'লে এই ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিক্ষককে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বোধের পথে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। ভাষা বা ভাবের দিক দিয়ে বিষয়ের কাঠিন্য দূর করতে হলে এই পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকার করতেই হবে।

আগেই বলেছি যে, বিষয়ভেদে পাঠনপদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে হবে, আর সে বৈচিত্র্য আনতে হলে শিক্ষকের প্রস্তুতির প্রয়োজন। মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে, কারণ এই ইন্দ্রিয়টি বোধের পথে বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু তা ব'লে শিক্ষায় অন্য ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য নেব না, এমন কোনো কথা নেই। বরং ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে যে অভিজ্ঞতার আলো মনের প্রকোষ্ঠে গিয়ে পৌঁছোয়, তার যথেষ্ট মূল্য আছে। তাই শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে কি ভাবে তিনি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীর মনে কতই না তুফান তোলে। রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবীর বুকে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের গোচরে রয়েছে, শিক্ষার্থী তাকে পেতে চায়, এবং এমনি ক'রেই তার শিক্ষা পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়। একদিকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাব-জগৎ, আর একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ। এই দুই-এর মধ্যে মিলনের প্রয়াস শিক্ষারই কাজ। শিক্ষক সেই মিলনযজ্ঞের হোতা মাত্র।

শিক্ষাদানের উপকরণ—আজকাল শিক্ষাদানের উপকরণের উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। সাজ-সরঞ্জাম-সমারোহের দিকে তাদের দৃষ্টি। অনেকে মনে করেন, এটা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। ভারতের শিক্ষার পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌রা জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর অন্তর্বৃত্তির উপর। ধ্যান-ধারণা, মনন, এগুলি ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। স্বামীজিও এই মতবাদের প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা হচ্ছে মূলত স্নায়ু-সংযোগ প্রতিষ্ঠা (Nervous association)। কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষায় এই association-এর বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অন্তর্জগৎ ও বস্তুজগতের মিলন ঘটে এরই মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে এই সংযোগ সাধন করা সহজ? একথা ঠিক যে, জীবনে মনন ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকলের পক্ষে তা কতোখানি

সম্ভব! বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে, যখন প্রতি পদে চিত্তবিক্ষেপ ঘটছে, তখন চপলমতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা কতটুকু আশা করতে পারি! তাই মনে হয় শিক্ষাদানে উপকরণের সার্থকতা হয়তো আছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, উপকরণের প্রাচুর্য যেন শিক্ষার্থীকে দিক্‌ভ্রষ্ট না করে, যেন উপকরণই তার কাছে বড় হয়ে না দাঁড়ায়।

শিক্ষার যেসব উপকরণ সাধারণত ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ব্ল্যাক-বোর্ডই প্রধান। ব্ল্যাক-বোর্ডের সহায়তায় অনেক বিমূর্ত আলোচনা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই ব্ল্যাক-বোর্ডকে বলা হয় Mirror of the teacher's mind। শিক্ষক যখন যে বিষয় পরিস্ফুট করতে চান সে সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু ছবি ও নকশা আঁকতে পারেন তাহ'লে বিষয়বস্তু বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অবশ্য সব শিক্ষকের পক্ষে ছবি আঁকা সম্ভব হয় না, তবে বিষয়টির সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্যও তিনি যদি কিছু কিছু সাধারণ নকশা বা রেখাচিত্র তুলে ধরেন তাতেও কার্যকারিতা অনেকখানি বাড়ে। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক রঙিন চক ব্যবহার করতে পারেন।

এছাড়া অনুকৃতি (Model) ও নমুনার প্রয়োগও পাঠনে ফলপ্রসূ হয়। যেসব বিষয় জ্ঞানমুখী (Knowledge Subjective) সেগুলি স্পষ্ট ক'রতে হলে মডেলের মতো আর কিছু নেই। কারণ ছবি বা নকশায় আমরা দুটি মাত্রা দেখাতে পারি, কিন্তু মডেলের তিনটি মাত্রা (Three Dimensions) আছে। তাই মডেল অনেকখানি বাস্তব।

পাঠ-পরিচালনাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হলে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। নমুনা-সংগ্রহের জন্যে বিদ্যালয়ে একটি ছোটখাট মিউজিয়াম তৈরি করতে পারলে ভালো হয়। সেখানে নানাজাতীয় বস্তু সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলিকে ভালোভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা বিষয়ের বোধে সহায়ক হয়। যেমন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার জন্যে গাছের পাতা, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়। প্রাণীবিদ্যা শিক্ষার জন্যে কীটপতঙ্গ, ছোটখাট প্রাণী পোষা যায়। ভূগোল-শিক্ষার জন্যে নানাজাতীয় পাথরের টুকরো, খাদ্যশস্য ইত্যাদি রাখা যায়। ইতিহাস-শিক্ষার জন্য নানাদেশের ও নানাকালের মুদ্রা, প্রাচীন হস্তলিপি বা ঐতিহাসিক ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

শিক্ষায় চার্ট্ ও নকশা বিশেষ প্রদীপকের কাজ করে। অবশ্য এজন্যে শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন। এই চার্ট্ ও নকশার সাহায্যে বিষয়টি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ্ Weber-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'Verbal description aided by diagrammatic representation appears to be more effective than verbal description used alone'। শিক্ষায় সাধারণত প্রদীপক ব্যবহার করা হয়। একটি চাক্ষুষ (Visual), অপরটি শ্রুতিনির্ভর (Audio)।

চাক্ষুষ প্রদীপন—চাক্ষুষ প্রদীপকের মধ্যে চার্ট, নকশা ও মডেল ছাড়া ম্যাজিক লণ্ঠনের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শিক্ষার এই উপকরণটি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে কত সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়, সেকথা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে নানারকম স্লাইড তৈরি ক'রে নিতে হয়। আবার নানারকম শিক্ষামূলক স্লাইড কিনতেও পাওয়া যায়। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে পড়ানোর কৌশলটি শিক্ষককে আগে আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে। ছবির সংখ্যা বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অল্পসংখ্যক এবং একান্ত প্রাসঙ্গিক ছবি পর্দার উপর ফেলে শিক্ষক প্রতিটি ছবিকে কেন্দ্র ক'রে বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করবেন। এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সঞ্চার হবে, পাঠ সার্থক হবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের প্রচলন খুব বেশি হয়নি। অর্থনৈতিক কারণের চেয়ে উৎসাহের অভাবই এই মূল্যবান প্রদীপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় ব'লে মনে হয়।

ম্যাজিক লণ্ঠনের উন্নত সংস্করণ হ'ল এপিডায়োস্কোপ। স্লাইডের পরিবর্তে যে কোনো কাগজ বা বইএর ছবি এর সাহায্যে বড় ক'রে পর্দায় ফেলা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই এর উপযোগিতা যথেষ্ট। কারণ এখানে স্লাইডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইচ্ছামতো বইএর যে কোনো ছবি, নকশা ও লেখা এর সাহায্যে প্রতিফলিত করা যায়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই মূল্যবান প্রদীপক রাখবার অর্থসংগতি নেই। তাই যাতে এর সুলভ সংস্করণ পল্লী অঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছতে পারে, সে দিকে শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সুযোগ দেওয়া দরকার।

আর একটি প্রদীপকের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সেটি হ'ল ফিল্ম প্রোজেক্টার। এই যন্ত্রের সাহায্যে ছবিগুলিকে চলন্ত অবস্থায় দেখা যায় ; ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিল্ম প্রোজেক্টারের উপযোগিতা অপরিসীম। পাশ্চাত্যে বহু বিদ্যালয়ে ফিল্ম প্রোজেক্টার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দেশের সরকারী প্রচার বিভাগ তথ্যপূর্ণ ফিল্ম তুলে ফিল্ম লাইব্রেরির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলে সেগুলিকে বণ্টন করেন। ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা পরিবেশন করবার সুযোগ ঘটে। আমাদের দেশে সরকারী কৃপাদৃষ্টির ফলে মুষ্টিমেয় শিক্ষায়তনে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে। যদি সরকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যমূলক চলচ্চিত্র দেখাবার জন্যে চলমান ইউনিটের ব্যবস্থা করেন, তবে মাঝে মাঝে সেই চলমান কেন্দ্র বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র পরিবেশন করতে পারে। শহরের কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলগুলি এইভাবে উপকৃত হতে পারে। অবশ্য এর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন—শ্রুতিনির্ভর প্রদীপনের মধ্যে গ্রামোফোন, টেপ-রের্কডার ও রেডিওর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে পল্লী অঞ্চলে, গ্রামোফোনের উপযোগিতা অনেক বেশি। গ্রামোফোনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা উচ্চারণ-সম্বন্ধীয় রেকর্ড বাজানো যেতে পারে। অবশ্য এই ধরনের রেকর্ড আমাদের দেশে খুবই কম। এই দিক থেকে রেডিওর মূল্য যথেষ্ট। কারণ, শিক্ষার্থীরা প্রাত্যহিক খবরাখবরের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা, ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, আবৃত্তি সবকিছুই অবসর সময়ে শুনতে পারে। আমাদের দেশেও আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী বেতার-সূচীর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে শ্রেণীপাঠ্য বিষয়গুলিকে নিয়ে সরস বর্ণনা বা আলোচনার ব্যবস্থা আছে। রেডিওর মাধ্যমে সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশের পথে কাজে লাগানো যায়। টেপ-রেকর্ডারও একটি বিশেষ কার্যকরী প্রদীপক। শিক্ষক প্রয়োজনমতো এর সাহায্যে বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি টেপ-রেকর্ডে ধ'রে রাখতে পারেন। এমন কি, শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি, ভাষণ ইত্যাদির অংশ রেকর্ড ক'রে তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। উচ্চারণ ও ভাষা শেখাবার জন্যে এর প্রচলন খুবই কার্যকরী।

পাঠটীকা প্রণয়ন

বর্তমানে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে, শিশুকে কেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এ নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে। তাই শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্যও বেড়ে গেছে, আর শ্রেণীতে পাঠনের অভিনব আয়োজনও আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এর জন্যে শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতির কথা ওঠে। তাঁকে আগে থাকতে স্থির ক'রে নিতে হবে তিনি কোন বিষয়ে পাঠ দেবেন—শিক্ষার পদ্ধতি ও উপকরণ কি হবে, ইত্যাদি। অর্থাৎ তার পাঠনের পেছনে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা চাই। বিষয়ভেদে এই পরিকল্পনার পার্থক্য ঘটলেও একটা সাধারণ রীতি এবিষয়ে অনুসরণ করা যেতে পারে। কি ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে তাঁর পরিকল্পনায় এগোনো যায়, সে সম্পর্কে হার্বার্টের মত উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পিত পাঠন-পদ্ধতির ছকটিকে পাঠটীকা বলা হয়।

শ্রেণীপাঠনায় এই পাঠটীকা কতখানি কার্যকরী হতে পারে? পাঠটীকা অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় কি না? এক কথায় এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিক্ষক যে পাঠটীকার প্রণয়ন করবেন তাঁকে কেবলমাত্র একটি সাধারণ নির্দেশক হিসেবে নেওয়াই সংগত। অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিস্থিতি অনুযায়ী পাঠটীকা থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে; তাতে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। লক্ষ্য হ'ল পাঠনের সাফল্য, পাঠটীকার পূর্ণ অনুসরণ নয়। সার্থক পাঠনের পথে এটি একটি সহায়ক মাত্র।

হার্বার্ট যে ভিত্তিতে পাঠটীকার রূপ দিতে চেয়েছেন তা মূলত মনস্তাত্ত্বিক। তাঁর মতে, জন্মমুহূর্ত থেকেই শিশু যে বিচিত্র অনুভূতি আহরণ করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা মিলেমিশে একটা ভাব-জটের সৃষ্টি হয়। ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া যায় "Apperceptive Mass"। এই ভাব-জট-তত্ত্বটি হ'ল হার্বার্টীয় শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। শিশুকে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা দিতে হলে তার এই পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে এগোতে হবে। তাছাড়া, কি ক'রে বিমূর্ত ভাবকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে সম্পর্কেও হার্বার্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এই রূপায়ণের কাজকে তিনি চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

প্রথমত, যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে তাকে স্পষ্টভাবে শিশু-মনের সামনে তুলে ধরা দরকার। স্পষ্টতা পাঠটীকার একটি বিশেষ অঙ্গ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়, সংযোগ-সাধন। পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা ভাব-জটের সঙ্গে নতুন পাঠের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে এই রূপায়ণ সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা পাঠটীকার আর একটি বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে পদ্ধতির প্রশ্ন ওঠে। শিশু যে নতুন জ্ঞান লাভ করছে তা যথাযোগ্য রূপে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

হার্বার্টের পথ অনুসরণ ক'রে 'জিলার' একটি শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঁচটি সোপানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্পষ্টতার পর্যায়টিকে তিনি দুইভাগে ভাগ করেছেন—একটি আয়োজন, অপরটি উপস্থাপন। শিক্ষার্থীকে নতুন অভিজ্ঞতা দিতে হলে আয়োজনের মধ্য দিয়ে আগে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার হিসাব নিতে হবে। পরে দিনের পাঠ্যবিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে। কেউ কেউ আবার উপস্থাপিত অংশের মধ্যে আর একটি উপাংশ জুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে পাঠের উদ্দেশ্য উপস্থাপনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। এর পরের স্তরে সংযোগের পর্যায়ে তুলনা ও বিমূর্তকরণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই তুলনা ও বিমূর্তকরণের মাধ্যমে সংযোগ দৃঢ় হবে ও বিচার-বিশ্লেষণের দিকে শিক্ষার্থীর চেষ্টা আসবে। এইভাবে একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে পাঠদান এগিয়ে যাবে। চতুর্থ স্তর হচ্ছে সূত্রনিষ্কাশন বা সাধারণীকরণের স্তর। অর্থাৎ বিচার-বিশ্লেষণের পর বিষয়বস্তুর পারম্পর্য থেকে একটি ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এরপর সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার সহজ হয়ে ওঠে। সবশেষে অভিযোজনের স্তর। এই স্তরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হার্বার্টীয় পদ্ধতি উপস্থাপন স্তরের মধ্যেই তার পরবর্তী দুটি স্তরকে স্থান দিতে চেয়েছে। তাই সেকালে কেবল তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা (১) আয়োজন, (২) উপস্থাপন, (৩) অভিযোজন।

পাঠটীকা প্রণয়নের পদ্ধতি—পাঠটীকা প্রণয়ন করতে হলে প্রথমে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত। বিবরণের বিষয়গুলি যথাক্রমে

(ক) তারিখ, (খ) বিদ্যালয়ের নাম, (গ) শ্রেণী, (ঘ) শিক্ষার্থীসংখ্যা, (ঙ) শিক্ষার্থীর গড় বয়স, (চ) সময়, (ছ) শিক্ষকের নাম।

এইসব বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল পাঠকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি, বয়স ও শিক্ষা-পরিবেশের উপযোগী ক'রে তোলা। সাধারণত, পাঠটীকার শীর্ষে বাঁদিকে এই বিবরণগুলি দেওয়া হয়। ডানদিকে পাঠক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার রীতি আছে।

প্রথমেই আসা যাক পাঠের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের দিকে। প্রতিটি পাঠেরই সাধারণ উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তাই সাধারণত পাঠ কোন উদ্দেশ্যের অভিমুখী হবে তা স্থির ক'রে নিয়ে পরবর্তী স্তরে অনুরূপ আয়োজনের দরকার। দেখা যায়, পাঠ দুরকমের হতে পারে, জ্ঞানসূচক ও রসানুভূতিমূলক। একটির উদ্দেশ্য হ'ল তথ্যগত জ্ঞান পরিবেশন করা, অন্যটির উদ্দেশ্য হৃদয়ের অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করা ও রস উপভোগ করা। প্রত্যেক পাঠেরই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আছে। তাই দুদিকেই দৃষ্টি রেখে পাঠটীকার পরিকল্পনা করতে হবে।

পাঠের উদ্দেশ্য সার্থক ক'রে তুলতে হলে প্রদীপন হিসেবে কি কি উপকরণ প্রয়োজনীয় তা ঠিক ক'রে দেওয়া দরকার। তারপরে আসে আয়োজনের স্তর। এই স্তরে পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার। তাই পূর্বজ্ঞানের সন্ধান নেওয়ার পরেই শিক্ষককে দিনের পাঠ ঘোষণা করতে হবে। পাঠটি ঘোষণা করেই নিবৃত্ত হলে চলবে না, তাকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। যেমন পাঠের দুটি প্রকার আছে, তেমনি উপস্থাপন প্রণালীও আছে। জ্ঞানমুখী পাঠে উপস্থাপনকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। একটি বিষয়, অপরটি পদ্ধতি। অর্থাৎ এক অংশে লিখতে হবে কি পড়াতে হবে এবং অপর অংশে কেমন ক'রে পড়াতে হবে। ভাবমুখী পাঠে বিষয় ও পদ্ধতির স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন নেই। উপস্থাপনের শেষে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের সাধারণ বোধ কতটুকু জন্মালো তা জেনে বিষয়টির একটি সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ব্ল্যাক-বোর্ডে তুলে ধরলে ভালো হয়। সর্বশেষ স্তর, অভিযোজন। পাঠদানের সাফল্য যাচাই

করবার জন্যে এই অভিযোজন স্তরের বিশেষ সার্থকতা আছে। বেশ কয়েকটি সুনির্বাচিত চিন্তাগর্ভ প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদানের পরীক্ষা করা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর জ্ঞান, বোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও একটা সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দেওয়া গেছে কি না অভিযোজন স্তরে সেটাও লক্ষণীয়। অভিযোজনের শেষে, প্রয়োজন বুঝলে, শিক্ষক বিষয় অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ দিয়ে দেখতে পারেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। তাই গৃহকাজ হিসেবে সেগুলি শিক্ষার্থীদের দিলে বোধ হয় ফল ভালো হয়। তবে দেখতে হবে যে, গৃহকাজটি যেন আগ্রহভরে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও গৃহকাজটিকে সংশোধন করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কারণ মূল্যায়ন না হ'লে এই ধরনের কাজে কোনো সার্থকতাই থাকে না।

বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ব'লে ধরা হয়েছে। যে কোনো ভাবে তথ্য পরিবেশন করলেই হ'ল না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদান প্রয়োজন। তাই বিষয়বস্তু যেমন জানতে হবে তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষকের পরিচিত হওয়ারও প্রয়োজন। অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা স্বাভাবিক।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ পরীক্ষামূলকভাবে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য, শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মূল উদ্দেশ্য এক হলেও শিক্ষণ-প্রণালীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তাই তাদের আলোচনাও সার্থক। দেখা গেছে যে, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে, শিক্ষকের কার্যধারায়ও বৈচিত্র্য এসেছে। শ্রেণীপাঠনায় গতানুগতিক পদ্ধতির মৃত্যু ঘটেছে। যেসব নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে ডাল্টন প্রণালী (Dalton Laboratory Plan), কার্যসমস্যা পদ্ধতি (Project Method), কর্মকেন্দ্রিক

শিক্ষা, ইউনিট পদ্ধতি, অনুবন্ধক প্রণালী, উইনেটকা পদ্ধতি, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, আরও দু-একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—আলোচনামূলক পদ্ধতি বা Work-shop Method। শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি হিসেবে প্রাচীন মণ্টেসরি পদ্ধতি ও ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল্য অনেকখানি।

শৈশবের প্রথম স্তর থেকে যে শিক্ষা শুরু হয় তার একটা স্বাভাবিক ক্রমপরিণতি আছে। সেই পরিণতি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইজন্যই পদ্ধতির প্রবর্তন। উদ্দেশ্যকে সেখানে সামনে রাখতে হবে। পদ্ধতিকে মর্যাদা দিতে গিয়ে উদ্দেশ্য যদি হারিয়ে যায় তবে সবই বৃথা।

বর্তমানে শিক্ষাকে বিজ্ঞান ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। এই শিক্ষা-বিজ্ঞান নতুন নতুন দিকে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, উদ্ভাবন করছে নানা পদ্ধতি। সেই পদ্ধতির সঙ্গে পরিবেশের সামঞ্জস্য থাকা চাই। তাই ক্ষেত্র-বিশেষে পদ্ধতিকে পরিমার্জিত ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

প্রথমেই দেখা যাক, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে তার মূলনীতি কি?

ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি—এই পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে তার মূলসূত্রগুলি উল্লেখ করা হ'ল। দেখা যায়, প্রতিটি শিক্ষাপদ্ধতির পেছনে একটা ক'রে শিক্ষা-দর্শন রয়ে গেছে। ফ্রয়েবলের ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য। কারণ, তিনি শিশুর মধ্যে এমন এক সত্তার সন্ধান পেয়েছেন যার উৎস হ'ল বিশ্বস্রষ্টা। তাই শিশুকে তিনি স্বর্গের দেবদূত ব'লে মনে করেছেন। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে অশেষ সম্ভাবনা। সে যেন অঙ্কুরের মতো। শিশুর বৃদ্ধি ও পরিণতি আনতে হলে চাই স্নেহসিঞ্চন, চাই আদর-যত্ন, চাই লালন-পালন। তাই শিক্ষকের কাজ হ'ল বাগানের মালীর কাজ। যাতে শিশুর দেহমন, অন্তর ও বাহির, শক্তি ও সামর্থ্য, অনুভূতি ও প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। শিশুপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে গিয়ে তিনি কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। শিশু যে সৃষ্টিধর্মী, সে যে

খেলা করতে ভালোবাসে, খেলার মাধ্যমেই যে তার আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রসারের প্রচেষ্টা, একথা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ক্রীড়া-দ্রব্যের প্রবর্তন এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। তাদের মধ্যে গোলা (Sphere), একটি ঘন ক্ষেত্র (Cube) ও একটি নলাকার বস্তু (Cylinder) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজীতে এগুলিকে তিনি gift বলেছেন।

আগেই বলেছি যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আছে ভগবানের প্রকাশ। আর শিশু যে ভগবানের সন্তান, একথা ফ্রয়েবল্ জোর ক'রে বলেছেন। পৃথিবীর সমস্ত জীব ও জড়কে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করার আয়োজন সবখানেই চোখে পড়ে। জীব ও জড়জগতের মধ্যে যে সাদৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে তাদের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য আছে, একত্ব আছে, তাকে উপলব্ধি করাই শিক্ষা। শিশু ক্রমশ সেই উপলব্ধির পথে এগিয়ে যায়। সৃষ্টিরহস্যের মধ্য থেকে ফ্রয়েবল কয়েকটি নীতি বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, একত্ব, অবিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমবিকাশ—এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা জড়িত। মৌলিক দৃষ্টি নিয়ে শিশুর দিকে তিনি তাকিয়েছেন। তাই তাঁর মতে শিশু সজীব, প্রাণবান, সক্রিয় সৃষ্টির তাগিদে চপল। এছাড়াও, শিশু যে সমাজের সক্রিয় সভ্য তিনি তারও উল্লেখ করেছেন। যেসব ক্রীড়াদ্রব্য বা গিফট (gift)-এর কথা তিনি বলেছেন, তাদের সাহায্যে শিশুর নৈতিক, শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ যে সম্ভব হয়, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি তাঁর gift-গুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও শিশু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ফ্রয়েবলের যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তা তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাকালে বোঝা যায়।

ফ্রয়েবলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলসূত্রগুলির মধ্যে খেলা, হাতের কাজ, ছবি, গল্প, শিল্পকলা, শারীরশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও প্রকৃতি-পাঠের কথা বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে। এছাড়া কিভাবে শিশুকে অক্ষরের সঙ্গে ছবির সংযোজন ক'রে পড়তে শেখানো যায়, কিভাবে কাঠি বা তেঁতুল বিচির

সাহায্যে অক্ষর তৈরি করতে শেখানো যায়, সে সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ নতুন পথের সন্ধান দেয়। মোটকথা, ফ্রয়েবলের পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবর্তিত হয়েছে। এইজন্য অনেকে বলেন যে, তাঁর শিক্ষাদর্শন পেস্তালৎসির কাছেও বিশেষ ঋণী।

শিশুদের কর্মের স্বাধীনতা ও আনন্দই মূল পাথেয়, আর সেই পাথেয়ের অভাব ঘটলে সমস্ত শিক্ষা নিরর্থক হয়ে যাবে। এইদিক থেকে মণ্টেসরি পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েবলের শিক্ষাপদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে

মণ্টেসরি পদ্ধতি

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। তাই, যে কোনো একটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে করতে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মেলে। মণ্টেসরির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি ছিলেন চিকিৎসক। ক্ষীণ-মেধা শিশুদের নাড়াচাড়া করতে করতে তাদের শিক্ষাদীক্ষার দিকেও তাঁকে সজাগ হতে হ'ল। শৈশবের রহস্য তাঁর কাছে ধরা পড়ল। তিনি ভাবলেন যে, ক্ষীণমেধা শিশুদের জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়, একটু অদল বদল ক'রে সাধারণ শিশুদের জন্যে তার প্রয়োগ করলে বোধহয় ফল ভালোই হয়। সেই প্রত্যয় নিয়ে তিনি তাঁর নতুন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন। স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভই এই পদ্ধতির মূল কথা। ফ্রয়েবলের মতো তিনিও শিক্ষার উপকরণের দিকে জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা-উপকরণ স্বতন্ত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিই শিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম। তাই তাঁর প্রতিটি উপকরণে এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস। শিশু তার জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যত বেশি কাজে লাগাবে ততই তার শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে। মণ্টেসরি শিক্ষার নানাদিকে আলোক-পাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষার প্রধান কাজ হবে শিশুকে বাস্তব জীবনের উপযোগী ক'রে তোলা, আর সেই উদ্দেশ্যে শিশুর জন্য শিক্ষা-মূলক কার্যের ব্যবস্থা করা।

ব্যক্তিগতভাবে শিশুর দিকে দৃষ্টি রাখা ও তার শক্তি অনুযায়ী শিক্ষার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা মণ্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। শিশু সুন্দরের পূজারী। যা কিছু ভালো, শিশু-মনে তার একটি বিশেষ আবেদন আছে।

শিক্ষায় পরিবেশ রচনার দিকে মণ্টেসরি বার বার শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একদিক থেকে তিনি ফ্রয়েবল থেকেও বেশি উদার, কারণ শিশুদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁর মতে অপরাধ। তাঁর মতে বাস্তব জীবনের প্রস্তুতিও যেমন শিক্ষার লক্ষ্য, তেমনি লক্ষ্য হ'ল শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অনুভূতির সমৃদ্ধি।

বাস্তব জীবনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান (Exercises of practical life) প্রসঙ্গে মণ্টেসরি মনে করেন যে, বাড়িতে যেসব কাজ সচরাচর করতে হয়—যেমন হাতমুখ ধোওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার করা ও সাজিয়ে রাখা, বোতাম পরানো ইত্যাদি—তেমনি খুঁটিনাটি কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের কেবল যে বাস্তব অভিজ্ঞতাই বাড়ে তাই নয়, তাদের শারীরিক শিক্ষাও এই সব কাজের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। এমন কি পেশীগত সংহতি—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Muscular coordination তা এইসব কাজের মধ্য দিয়ে বাড়তে থাকে। ফ্রয়েবলের মতে, সৃষ্টিমূলক কাজ যত তাদের দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। মণ্টেসরি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান প্রধান হ'ল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা, বাস্তব জীবনের কাজ শেখানো, শিশুর ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, বাস্তব জীবনের ও সমাজ-জীবনের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়াস। শিশুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি এগিয়েছেন তাঁর নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনায়।

ফ্রয়েবল ও মণ্টেসরি পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হ'ল :

কিণ্ডারগার্টেন	মণ্টেসরি
১। শিশুদের দলগতভাবে নির্দেশিত কর্মে উৎসাহিত করা হয়।	১। খেলনার সাহায্যে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।
২। সমস্ত গোষ্ঠীকে শিক্ষা ও নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা ও আয়োজন করা হয়।	২। ব্যক্তিগত নির্দেশের অবকাশ ও ব্যবস্থা অনেক বেশি।

কিণ্ডারগার্টেন	মণ্টেসরি
৩। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী শিশুরা খেলায় ও কাজে নিযুক্ত হয়।	৩। শিশুর রুচি ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ও ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে খেলা ও কাজে লিপ্ত হয়।
৪। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর খেলা ও কাজ চলতে থাকে।	৪। যতক্ষণ ইচ্ছা শিশু কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে।
৫। শিশুর কল্পনা ও চিন্তার অবসর আছে।	৫। কল্পনাপ্রসূত কাজের ব্যবস্থা কম।
৬। ছবি, গল্প ও গানকে বহুলভাবে শিক্ষার উপকরণ করা হয়েছে।	৬। কয়েকটি নির্দিষ্ট উপকরণের মাধ্যমে স্বয়ং-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭। ফ্রয়েবলের প্রবর্তিত খেলনা-গুলির মধ্যে রূপক ও ইঙ্গিত নিহিত।	৭। মণ্টেসরি প্রবর্তিত খেলনা অত্যন্ত সরল ও স্বয়ং-শিক্ষার উপযোগী।

ডাল্টন পদ্ধতি

গতানুগতিক শ্রেণীপাঠনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জমে উঠছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কয়েকটি পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ডাল্টন পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ডাল্টন নামক শহরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয়। শ্রেণীর সংকীর্ণ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ না রেখে তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা দেবার চেষ্টা ডাল্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। জন এ্যাডাম তাই এই পদ্ধতিকে শ্রেণীপাঠনার মৃত্যু-ঘণ্টা (Death-knell) বলেছেন। মিস হেলেন পার্খার্ষ্ট এই অভিনব পদ্ধতির মূলসূত্র রচনা করেন। প্রথমেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পার্থক্য তাঁর কাছে প্রকট হয়; তাই সেই সমস্যা তাঁকে চিন্তিত ক'রে তোলে। এই চিন্তা ক্রমশঃ একটি পরিকল্পনায় রূপ নেয়। আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। এখানে শিক্ষক কেবল পরামর্শদাতা, তাই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা অব্যাহত। ফলে, শিক্ষকের

দায়িত্বও অনেক। প্রতিটি বিষয় পাঠনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-কক্ষ নির্ধারিত হবে এবং যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও সাহায্য নেবে—এই হ'ল ডাল্টন পদ্ধতির কার্যধারা। তাহলেও দেখা যায় যে, স্বাধীনতাই এই পরিকল্পনার মূলনীতি। একজন শিক্ষার্থী যখন কাজ করতে শুরু করে, তখন তাকে বাধা দেবার কোনো যুক্তি নেই। সে আপন মনে প্রাণের তাগিদে কাজে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সহযোগিতা এই পদ্ধতির অন্যতম নীতি। কারণ, পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক চেতনা ও নাগরিকতা যখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তখন দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস বিশেষ সহায়ক। এক এক বিষয়ে শিক্ষার জন্য কেবল শ্রেণী নির্দিষ্ট থাকে না। শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক ও এক কথায় বলতে গেলে শ্রেণী-পরিবেশ নির্দিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ে কোনো সময়-পত্রিকাও থাকে না, কারণ এই পরিকল্পনায় সময়-পত্রিকার উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। যে কোনো শ্রেণীতে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারে। তারপর সে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, শিক্ষায় যে অগ্রগতি লাভ করে, তার একটি সারমর্ম তাতে লিখে ফেলতে হয় ও পাঠোন্নতির রেখাচিত্র প্রস্তুত করতে হয়। ডাল্টন পদ্ধতিতে অন্য কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এই পদ্ধতিতে সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল :

(১) শিক্ষক প্রধানত শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় ও আগ্রহে শিক্ষা করতে দেন।

(২) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী অভিজ্ঞতা আহরণে ব্রতী হতে পারে।

(৩) বিষয়-কক্ষের প্রবর্তন শিক্ষা-পরিবেশকে সহজ করে।

(৪) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এতে সহজ হয়।

(৫) তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সহযোগিতার মনোভাব ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

(৬) ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেক সহজ হয়।

এইসব সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও ডাল্টন পরিকল্পনা নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা কম থাকে ও পদে পদে তাদের শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া এই ব্যবস্থায় শিক্ষক কেবল পর্যবেক্ষক। সাধারণত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ফলে যে শিক্ষার সঞ্চার হয় এই ব্যবস্থায় তা সম্ভবপর হয় না।

ডাল্টন পরিকল্পনায় পুস্তকই শিক্ষার মূল উপকরণ। সেখানে উপযুক্ত প্রদীপনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ, শিক্ষকের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোনো স্থান না থাকায় সমস্যার সমাধান হয় না।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পাঠোন্নতির সঠিক চিত্র সারমর্মের মাধ্যমে পাওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার্থীর উপরেই নির্ভর করতে হয়। কোনো সময়-পত্রিকার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

মোটকথা, ডাল্টন পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু যাদের বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও অধ্যবসায় কম, তাদের পক্ষে এই পদ্ধতির উপযোগিতা নেই বললেই চলে।

এই সব সুবিধা-অসুবিধার কথা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, ভারতীয় শিক্ষা-পরিবেশে এই পরিকল্পনাকে অনুপূরক হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে প্রথম ভাগে শ্রেণীপাঠন ও দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা আহরণের ব্যবস্থা করলে ফল ভালো হ'তে পারে। এই সমন্বয়ের ফলে যে সামঞ্জস্য ও সার্থকতা আসবে তা হয়তো নতুন কোনো পদ্ধতির সঙ্কেত দিতে পারে। বর্তমান কালে শিক্ষায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মূল ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি ঔদাসীন্য। পরিবর্তিত ডাল্টন পদ্ধতি গতানুগতিক শ্রেণীপাঠনকে বজায় রেখে ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন। এই পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক কেবল নিরপেক্ষ দর্শক নন। শিক্ষার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করবার ভার তাঁরই উপর। সেখানে শিক্ষকের নির্দেশেরও অবকাশ আছে। এছাড়া সময়-পত্রিকাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। মূল্যায়ন ব্যাপারেও স্বতন্ত্র মৌখিক লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির পরিমাপের জন্য যে রেখাচিত্রের নির্দেশ আছে তাকেও কাজে লাগাবার নানা ব্যবস্থা এই পরিবর্তিত পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। কারণ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে রেখাচিত্র পূরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের সে বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে। কতটুকু কে পিছিয়ে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন ছাত্রকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারা যায় তার একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

কার্যসমস্যা-পদ্ধতি

বহুদিন আগেই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অন্তর্বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি পড়েছে। শৈশব থেকেই সৃষ্টির নেশা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তাই প্রতিটি শিশুই হতে চায় কর্মী। প্রত্যেকের ইচ্ছা সে কিছু তৈরী করবে, কিছু সৃষ্টি করবে। নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করে, তার মূল্য অনেকখানি। কার্যসমস্যা-পদ্ধতিতে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকায় জন ডিউই ও তার সহকর্মী কিল-প্যাটি্ক শিক্ষার এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। একটা বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিশুর জীবনকে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ক'রে তোলাই এঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন দিকে শিশু-জীবনের যে চাহিদা থাকে সেদিকে তাকিয়ে কার্যসমস্যার রূপায়ণ করা হয়।

কোনো কার্যরূপ সমস্যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সমাধানের শিক্ষা যে পদ্ধতিতে দেওয়া হয় তাকে প্রোজেক্ট-মেথড বলে (A project is a problematic act carried to completion in its natural setting —*Stevenson*)। তাহলেই দেখা যায় যে, সমস্যার আকারে যেকোনো কার্য শিক্ষার্থীদের সামনে আনলে তার সমাধানের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। আর শিক্ষার্থীরা সমাধানের প্রয়াসে যাতে এগিয়ে যেতে পারে শিক্ষককে সেরকম প্রেরণা জোগাতে হবে।

ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় আহরণ ক'রে শিক্ষার্থী অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে। শিক্ষার্থীর যাত্রা যাতে সুগম হয় সেজন্যে শিক্ষককে

অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশও দিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে কতকগুলি কার্যসমস্যার তালিকা তৈরি করা হয় এবং সেই সকল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এক এক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে।

প্রোজেক্ট দুই প্রকারের হ'তে পারে, যথা—বুদ্ধিমূলক ও কার্যমূলক। বুদ্ধিমূলক কার্যসমস্যার সমাধানের জন্যে কাজটি করার দরকার প্রায়শই হয় না; সমাধানের কল্পিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলেই সমস্যাটির সমাধান হ'ল ব'লে ধরা হয়। কিন্তু কার্যমূলক সমস্যা সমাধানের জন্যে শিক্ষার্থীকে বাস্তবিক কাজ করতে হবে। শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি কাজ করতে দেবেন। শিক্ষার্থী স্বচেষ্টায় তা করবার উপায় চিন্তা করবে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তা সম্পাদন করবে,—যেমন, দিক্ নির্ণয় করা, সময় নির্ণয় করা, বিদ্যালয় ও গ্রামের নকশা তৈরি করা ইত্যাদি। অনেক সময় বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও ছোট ছোট কার্যসমস্যার সমাধান করা যায়। তাহলেও মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সীমানার বাইরেও নিয়ে যেতে হবে।

চারটি স্তরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা—

(১) কাজের ইউনিট ঠিক করা,

(২) পরিকল্পনা করা,

(৩) কাজ সম্পাদন করা,

(৪) বিচার করা।

শিক্ষার্থীরাই কাজের ইউনিট স্থির করবে। তবে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কম; তাই যথাযথ নির্দেশ বা ইঙ্গিত শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহায়ক হয়।

কাজের পরিকল্পনাও করবে শিক্ষার্থীরা। কে কি কাজ করবে তা স্থির করবার জন্যে প্রথমে দলগঠন করতে হবে। দলগঠনের পর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে সকলে মিলে কাজ করতে করতে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা তারা আহরণ করবে। পরিশেষে কার্যসমাপ্তির পর তা নিয়ে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির উপকারিতা—কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার ফলে তাদের বাস্তববুদ্ধি জাগ্রত হয়, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে শেখে। এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সৃষ্টির প্রেরণায় নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়। শ্রেণী-পাঠনার গতানুগতিকতা থেকে তাদের মুক্তি ঘটে। সত্যিকারের জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা তাদের শিক্ষাকে পূর্ণ ক'রে তোলে। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে প্রোজেক্ট-পদ্ধতি বিশেষ অনুকূল। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া সম্ভবপর হয় না বটে, কিন্তু শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবে কার্যসমস্যার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করলে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক ত্রুটি বিদায় নেবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের সামাজিক চেতনা ও বাস্তববুদ্ধির উন্মেষ এই পদ্ধতির ফলে সহজ হয়। তাই অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক বলেছেন—"Project is a whole-hearted purposeful activity in a social environment."

প্রোজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা—নানা দিক থেকে প্রোজেক্ট পদ্ধতির উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি অসুবিধাও এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগায়। প্রথমত, প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে না, কারণ, কাজের ইউনিটগুলি এই বুদ্ধিসত্তার প্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী থাকে না। দ্বিতীয়ত, প্রোজেক্ট অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হবে। কারণ, শিক্ষার মধ্যে যে জড়তা ও একঘেয়েমি এসে পড়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তা দূর হয়, নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীর জীবন উদ্ভাসিত হয়, কাজের প্রেরণা দেখা দেয়, বাস্তববুদ্ধি জাগ্রত হয়। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতিকে যতখানি প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশু স্বভাবতই কর্মচঞ্চল। তার প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তাই কর্মের মাধ্যমে সে প্রকাশের পথ খোঁজে। তার জীবনের প্রস্তুতি নানাস্তরে শুরু হয়। চারদিকে যা কিছু দেখে তারই অনুকরণ সে করতে চায়। কখনও

গড়ে, কখনও ভাঙে। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সে নতুন অভিজ্ঞতা পেতে চায়। শিশুর জীবনে কর্মই তার ধর্ম। যদি তাকে কর্মের পথে বাধা দেওয়া যায়, তাহলে তার প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন চলার পথে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে ক্রমপরিণতি লাভ করে। সজীব প্রাণ মেতে ওঠে নতুন নতুন কাজের নেশায়, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন পরিচয়ের আশায়। শিশুর এই কর্ম-চঞ্চলতা তার শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায়। সেখানে তাকে আত্মপ্রসারের সুযোগ দিতে হবে। কেবল পুঁথিগত জ্ঞান পরিবেশনে সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের মুখোমুখী করাই অন্যতম উদ্দেশ্য। তার অন্তরের যেসব তাগিদ আছে সেগুলিকে কর্মের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করতে হবে। আজ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর মনোবৃত্তি অনুযায়ী কার্যধারার প্রবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

কর্মের রূপ ও প্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও তাঁরা একথা মনে করেন যে, শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সংযোজন একান্ত আবশ্যিক। তাঁরা আরও মনে করেন যে, কর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়,—একটি শিশুর স্বয়ং-কর্ম ও দ্বিতীয়টি শিক্ষক-নির্দিষ্ট কর্ম। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজে লিপ্ত হয় তাকে অনির্দেশিত কাজ বলা চলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। তাই সেখানে নির্দিষ্ট দিকে শিক্ষার অগ্রগতি কতখানি সম্ভবপর তা বিবেচ্য। এমন অনেক কাজ আছে যেখানে শিক্ষকের জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। এগুলিকে আমরা নির্দেশিত কাজ বলতে পারি। এই নির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষার্থী ইচ্ছানুযায়ী অগ্রসর হতে পারে। তাই সেক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না বললেই চলে। কিন্তু যেখানে শিক্ষকের আদেশেই শিক্ষার্থীকে কাজ করতে হয় সেখানে তার অবস্থা হয় যন্ত্রচালিতের মতো। তার স্বাধীনতা হয় বিপন্ন। তাই আদিষ্ট কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব কিছুটা খর্ব হতে পারে, তার সৃজন-প্রতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে।

এইসব কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্দেশিত

কাজ বিশেষ উপযোগী। অনির্দেশিত কাজ অনেক সময় শিক্ষার্থীর চাপল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা ডেকে আনে, আবার আদিষ্ট কাজে তার অভিব্যক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই এমন পরিবেশের প্রয়োজন যা তার স্বেচ্ছাচারিতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবে। এক দিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতার ফলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা, অন্যদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার চাপে অবরুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা,—এই দুই-এর মধ্যে সংগতি রক্ষা ক'রে কাজের প্রবর্তন করতে হ'লে নির্দেশিত কাজ বিদ্যালয়-জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। এই কাজ শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরেও চলতে পারে।

শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে অনির্দেশিত কাজ কিভাবে করবে তা বিচার-সাপেক্ষ। সাধারণত শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে কাজের ইউনিট বেশি থাকা দরকার। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী এক-একটি কাজ বেছে নিতে পারে সে রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্য কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দেশ না থাকলেও শিক্ষক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন ও সামান্য নির্দেশ দেবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষার্থী সাধারণত শিক্ষকের উপরেই নির্ভরশীল। তাই অনির্দেশিত কাজে তাদের প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়। কিন্তু একে একে তাদের অনভ্যাসজনিত অসুবিধা দূর হয় ও অনির্দেশিত কর্মে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত, অনির্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের কিছুই করণীয় নেই—এরকম একটা ধারণা থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে কাজের উৎসের সন্ধান দেওয়া ও একে একে তার বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। মাটির কাজ, কাঠ, কার্ডবোর্ডের কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে। যখন এইসব কাজে তার নৈপুণ্য আসে তখন শিক্ষকের বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকে না। সেখানে তিনি পর্যবেক্ষক মাত্র। অনির্দেশিত কাজে যেমন কয়েকটি সুবিধা আছে তেমনি কয়েকটি সমস্যাও আছে। দেখা যায়, চঞ্চল শিশুর মন ক্রমশই এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরতে থাকে। ফলে, তার কোনো কাজই পূর্ণতা লাভ করে না। শিশুদের কর্মরাজ্য ও ভাবরাজ্য এই দুইএর গতি সব সময়ে এক নয়, কিন্তু মূলত তারা গতিপ্রধান। কখনো কর্মকে ছাড়িয়ে ভাব ছুটতে থাকে, আবার কখনো কর্ম ভাবকে

ছাড়িয়ে যায়। শিশুদের ভাব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা খুবই কঠিন। তারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত। বয়সের অনুপাতে কর্মের একটা নির্দিষ্ট সীমা-রেখা থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা এই সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারে না। নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকলে কর্মধারার ইঙ্গিত পাওয়াও সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ বাঞ্ছনীয়।

ইউনিট পদ্ধতি—শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেরণা অনুযায়ী শিক্ষক প্রয়োজনস্থলে এক একটি ইউনিট নির্ধারিত করবেন, আর শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশকে নিজেদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে ও সেই ইঙ্গিতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। কাজটির বিভিন্ন দিকে পরিণতি দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার সমালোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে কর্ম শিশু-জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। একদিকে থাকে তার রুচি, অন্যদিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার ক্ষমতা।

জন ডিউই তাঁর The School and the Child নিবন্ধে বলেছেন, "শিশুরা একান্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজের ইউনিট স্থির করতে পারে না এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকাও সমীচীন নয়।" তাই শ্রেণীতে কিছুদিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাদের চাহিদাকে বুঝে কাজের বিষয় স্থির করা বোধ হয় শিক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

ইউনিট নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা অবলম্বন ক'রে তাঁর দেওয়া ইঙ্গিতকে শিশুদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে চান তাহলে তাতে কাজ ভালো হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে তারা সেই ইউনিটকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে আর তা সম্পাদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মোট কথা, শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে থেকে কাজের প্রেরণা জাগলে তা সবদিক থেকেই শ্রেয় হয়ে ওঠে।

কর্ম এবং কার্যসমস্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কর্ম বলতে সবরকম কর্মই বোঝায়—যেমন অনির্দেশিত ও নির্দেশিত, এমন কি আদিষ্ট কর্মও। কিন্তু কার্যসমস্যা বা প্রোজেক্ট কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে গেলে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। চারটি স্তরে প্রোজেক্টের রূপায়ণ

ঘটে। যে কাজের মধ্যে এই চারটি ব্যবস্থার একটিরও অভাব থাকে, তাকে প্রোজেক্টের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। প্রোজেক্টের বেলায় আগ্রহের কেন্দ্র থেকে অতি সহজভাবে অন্যান্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, আর শিশুরা প্রয়োজনের খাতিরেই সমস্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হয়। কিন্তু কর্মের বেলায় শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে পারে, কারণ সেখানে আমাদের দৃষ্টি থাকে পাঠ্যসূচীর দিকে। পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র ক'রে কর্ম স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির সঙ্গে কর্মের কৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কর্মের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হ'ল—

(১) খেলনার দোকান;
(২) ফেরী করা;
(৩) বায়স্কোপের ছবি দেখানো;
(৪) পুতুল নাচ;
(৫) বাড়ি তৈরি করা;
(৬) গ্রাম ও শহর তৈরি করা;
(৭) বাজার, পোষ্টাফিস, রেলষ্টেশন তৈরি করা।

এমনি অনেক খেলাই কর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমন কি শিল্প-কাজকেও নির্দেশিত কাজের পর্যায়ে ফেলা যায়। তাহলেই দেখা যায় যে, ব্যাপক অর্থে অনির্দেশিত, নির্দেশিত এবং আদিষ্ট সবরকম কর্মেই শিক্ষকের আদেশ ও নির্দেশ কর্মের প্রতি অংশে জড়িত থাকে। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেরাই কাজের ইউনিট স্থির করা থেকে প্রতিস্তরের কাজ শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পন্ন করে।

কর্ম ও প্রোজেক্টের মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে তা নিচে দেওয়া হ'ল—

কর্ম	প্রোজেক্ট
(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে, কিন্তু দায়িত্ব হ'ল শিক্ষকের।	(১) শিশুরা নিজেরাই সব কাজ করে, দায়িত্ব তাদেরই।
(২) জ্ঞান মুখ্য, কর্ম গৌণ।	(২) কর্ম মুখ্য, কর্মকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান আহৃত হয়।

(৩) কর্মের অবতারণা পাঠ্যসূচীর জন্যে।	(৩) কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই কর্মের অবতারণা। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়সমূহ পরে আসে।
(৪) কর্মের প্রতিস্তরের সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক নয়।	(৪) প্রত্যেকটি স্তরের কাজেই সুষ্ঠু অনুসরণ আবশ্যিক।
(৫) কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাজের দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।	(৫) প্রোজেক্টের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকে না এবং কাজের প্রতি অংশ সুসংবদ্ধ।
(৬) শিক্ষার গতি অন্তর্মুখী।	(৬) শিক্ষার গতি বহির্মুখী।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি ও শ্রেণীস্তর অনুযায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার। এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা সব শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপযোগী। শ্রেণীভেদে ও বিষয়ভেদে পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতেই হবে।

পাঠদানের ইউনিট পদ্ধতি

হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে পাঠের উদ্দেশ্য ও রচনা থেকে শুরু ক'রে পাঠ-পরিচালনার প্রত্যেকটি স্তরই স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত ও রচিত হয়। এই-জাতীয় পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়, জ্ঞেয় বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে খণ্ডিত ও ছিন্ন মনে হয়। হার্বার্টীয় শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। তাতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পাঠদান-কার্যকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি পাঠকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমগ্র পাঠ্যকেই পাঠের একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর সেই একক পাঠকে শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ ক'রে নেওয়া যেতে পারে, এবং পরে পাঠের গভীরতা বা প্রসার নির্ণয় করা যেতে পারে।

ইউনিট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলন এই পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছে। বিষয়বস্তুর উপর অখণ্ড অধিকার ও অবিচ্ছিন্ন ধারণা

গ'ড়ে উঠলে তবেই তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়,—গেষ্টাল্ট-মতবাদের এই হ'ল মর্মকথা। প্রত্যেকটি আচরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতির একটি চিত্র মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুললে পরিণতির পথে যাত্রা কার্যকরী হয়, আচরণও উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়। ইউনিট পদ্ধতিতে মূল উদ্দেশ্যটি স্থির ক'রে নিয়ে প্রাসঙ্গিক সমুদয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার কথা বলা হয়েছে। গেষ্টাল্ট-মত অনুযায়ী মনের মধ্যে সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠার পর শিক্ষার্থীর মনে প্রস্তুতি আসে এবং বিষয়টি আয়ত্তে আনবার জন্যে প্রয়াস দেখা দেয়। অবশ্য এই আয়ত্তে আনবার চেষ্টা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজস্ব রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলন দেখা দেয়। আর অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটে। ইউনিট পদ্ধতিতে গেষ্টাল্ট-মতবাদ ও থর্ণডাইকের শিক্ষা-নীতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত। সুতরাং ইউনিট পদ্ধতির সার্থকতা সম্পর্কে আজ অনেকেই নিঃসন্দেহ। পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে পাঠ-পরিচালনার পরিকল্পনা নতুন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঠ্যবিষয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার গুরুত্ব যে অধিক একথা স্বীকার করতেই হবে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর উপর যথোচিত নৈপুণ্য আসে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় ও রসানুভূতির সঞ্চার হয়। অর্জিত জ্ঞানকে নতুন ক্ষেত্রে নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করতে এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়তা করে। ইউনিট পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত সার্থক কর্মধারার অনুশীলন করতে হয়, যার ফলে তার উদ্দেশ্যটি ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা চারটি বিষয় লক্ষ্য করব ঃ

(১) শিক্ষাকার্যটি কেবলমাত্র পুঁথিগত নয় ;

(২) এই ক্রিয়া একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক, পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত এবং অর্থযুক্ত ;

(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই এই পদ্ধতির প্রধান অংশ ;

(৪) শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এই পদ্ধতির লক্ষ্য আছে।

ইউনিট পদ্ধতি উদ্দেশ্যাভিমুখী। প্রথমে সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির ক'রে নেওয়া ও তারপর সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। হাওয়ার্ড উইলসন ইউনিট পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনটি জিনিসের দিকে জোর দিতে বলেছেন: (১) উদ্দেশ্য নির্ণয়; (২) বিষয়বস্তু নির্বাচন ও (৩) আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

ইউনিট পদ্ধতির সুবিধা—এই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এই পদ্ধতিতে বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট থাকে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও আচরণ এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়। তৃতীয়ত, ইউনিট পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার প্রাসঙ্গিক শিক্ষোপকরণ অধিকতর কার্যকরী হয়। চতুর্থত, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে কতখানি শিক্ষালাভ হ'ল ইউনিট পদ্ধতিতে তার মূল্যায়ন সম্ভবপর। পঞ্চমত, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইউনিট পদ্ধতির লক্ষ্য থাকে ও যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবার যে গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে তা নির্বাহ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation of Studies)—জ্ঞানের রাজ্য বিস্তীর্ণ। খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে যায়। শৈশব থেকে ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে যে সব ভিন্ন ধরনের উদ্দীপনা একে একে মনে জমে ওঠে সেগুলি অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। এই অভিজ্ঞতাগুলি মনের স্বাভাবিক সংশ্লেষণের বশে ক্রমশ সংহত হয় ও একীভূত সত্তায় পরিণত হয়। এই অখণ্ড একীভূত সত্তাই হ'ল জ্ঞান। হার্বার্টের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ভূত ভাবের মধ্যে যখন একটা যোগসূত্র রচনা করবার অবস্থা আসবে, তখনই শিক্ষার পথে প্রস্তুতি আসবে। অনুবন্ধ প্রণালী বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। পাঠ্য-বিষয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিষয় যে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত একথা অস্বীকার করা চলে না।

বিষয়গুলি বিভিন্ন উপকোষ্ঠে বিভক্ত নয়; একটি আর একটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং বিষয়বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত না ক'রে সমজাতীয় বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে পড়ার দিক থেকে অনেকখানি সুবিধা হয় ও অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হয়। আজ পাঠ্যবিষয়ের বোঝা অনেকখানি বেড়ে গেছে ব'লে অনেকের ধারণা। তাই এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাও আজ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অনুরূপ বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে যদি তা এই প্রণালীর সাহায্যে সুসম্বদ্ধভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে।

অনুবন্ধ প্রণালীর শ্রেণীবিভাগ—অনুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহার মূলত তিনটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট হতে পারে :

(ক) একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা যায়;

(খ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

(গ) পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ অর্থাৎ বিদ্যালয় ও বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাধারণত দেখা যায় যে, প্রথম প্রণালীর ব্যবহার পাঠ-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে করা হয়। পূর্ব পাঠের উপর ভিত্তি ক'রে নতুন পাঠ দেওয়া হয়। অর্থাৎ একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেদিকে শিক্ষার্থীর চেতনা আনতে হয়। যেমন, রাজনৈতিক ভূগোল পড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরলে তা কার্যকরী হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধ রচনার মধ্যে শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের বেশি প্রয়োজন। সেখানে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা ও পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধকের বিষয়ে তৎপর হতে গেলে শিক্ষকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োজন। এই অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, জীবন থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব। জীবন জুড়েই শিক্ষার বিস্তার। গ্রন্থজগৎ বিশ্বজগৎ-এর দ্বারস্থ। এই দুই-এর মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করতে পারলেই

আমাদের গ্রন্থজগৎ জীবন্ত হতে পারবে, নচেৎ নয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় কারুশিল্পকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয়ে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও তথ্য পরিবেশন করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কেউ কেউ ব'লে থাকেন যে, এই কেন্দ্রবন্ধ প্রণালী দুই জাতের হতে পারে :

(ক) কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়া হবে ;

(খ) কেন্দ্রীয় বিষয়টি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখা হবে না, কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। এই প্রণালীকে অনেকে সংযোজন (Integration) প্রণালীও ব'লে থাকেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ সমাজবিদ্যা নামে যে নতুন বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে, একমাত্র সংযোজন প্রণালী অনুযায়ী তা পড়ানো সম্ভবপর। এই প্রণালীর প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করা সহজ হয়। তা ছাড়া প্রয়োগ ও অনুশীলনও এই প্রণালীতে কার্যকরী হয়।

আজকাল আরও যে কয়েকটি পদ্ধতির কথা শোনা যায় তাদের মধ্যে Workshop method বা আলোচনা-মূলক পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন সাম্প্রতিক হলেও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-নীতি এই পদ্ধতির মূলে আছে। প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রতি মর্যাদা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিক্ষণকে শ্রেণীপাঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে ভুল করা হবে। তাই পদ্ধতিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সামনে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। কখনও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাই জ্ঞানের পথে এগিয়ে যায়। নানা দলে বিভক্ত হয়ে এক-একটি সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করে ও এইভাবে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয় ও শ্রেণী কর্মমুখর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার লেনদেন করতে থাকে। এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা-সভা ও গোষ্ঠীগত আলোচনা দুই-ই স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করায় যে কোনো বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর হয়। ফলে, প্রত্যেকেই অনুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে ধন্য হয়। অন্যের মতামত সম্পর্কে প্রত্যেকেই সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পরিণতিতে একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের নৈপুণ্যের প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় যে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ ঘটে। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা ও নির্দেশের প্রয়োজন। এই আলোচনা-পদ্ধতিকে তাই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—একটি সাধারণ সভা (Plenary session) আর একটি Group discussion অর্থাৎ দলগত আলোচনা।

আজকের দিনে বৃটেনে ও আমেরিকায় Programmed learning-এর বিশেষ প্রচলন দেখা দিয়েছে। যাতে শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েও উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

এর জন্যে নানা আধুনিক Teaching machine ও Programmed text-এর উদ্ভাবন হয়েছে। শিক্ষার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ক'রে নির্দিষ্ট পথে অভিজ্ঞতাকে চালিত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।

পর্যায় ৩

স্বাস্থ্যবিধি

সাত

বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? স্বাস্থ্যের সঠিক সংজ্ঞা এককথায় দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্য বলতে শরীরের শুধু নীরোগ অবস্থাই বোঝায় না। শরীর সুস্থ থাকার ফলে বুদ্ধি ও মনের সুস্থ বিকাশ হলেই তখন তাকে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বলা যায়। অবশ্য সুস্বাস্থ্য হলেই সুস্থ দেহ, মন ও বুদ্ধি আশা করা যায়। সুতরাং সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপর মানসিক সুস্থতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সুস্থ বিকাশ নির্ভর করছে। তাই প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ, সংস্থা, পরিবার ও রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে দায়িত্ব রয়ে গেছে। সকলেরই স্বাস্থ্য পালন ব্যাপারে অবহিত ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কি কি অবস্থায় স্বাস্থ্য ভালো থাকে তা প্রথমে জানতে হবে।

স্বাস্থ্যই জীবনে আনন্দের উৎস। বেঁচে থাকতে হ'লে চাই সুষ্ঠু ও কর্মঠ শরীর। রুগ্ন শরীরে যদি সব সময়ে প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত হ'তে হয়, তবে সে জীবনে সুখও নেই, আনন্দও নেই। তাই স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলো আগে দূর ক'রতে হবে। অকাল মৃত্যু জীবনের পক্ষে এক দারুণ অপচয়; এ শুধু পরিবারেই দুঃখ আনে না, জাতির উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই অপচয় নিবারণ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

স্বাস্থ্যই জাতি ও দেশের সম্পদ। স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন ব্যক্তি দেশের ভারস্বরূপ। তাই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ দুটি,—একটি অনভিজ্ঞতা, অন্যটি ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অবহেলা। কাজেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপনের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। শুধু নীতি মুখস্থ ক'রেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। যাতে এই নিয়মগুলির অভ্যাস হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক মাতা-পিতা যে-কোনো

কারণেই হোক তাঁদের সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন। অনেক বাড়ির পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল নয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো যাতে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে দৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে শিক্ষর্থীজীবনে বা তার পরবর্তী অবস্থায়ও তারা এই নিয়মগুলো মেনে চ'লে প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী হবে, নিজের জীবন আনন্দময় করতে পারবে এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি মাতা-পিতা বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরও দৃষ্টি থাকবে। যাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সযত্ন হন এবং বিদ্যালয়-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে, তা তাঁদের দেখা কর্তব্য।

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রয়োজনীয়তা শুধু উপদেশ দিয়েই বোঝালে চলবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার মতোই পরিচ্ছন্নতাবোধ শিক্ষার্থীদের মনে সজাগ ক'রে দিতে হবে। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, অথচ এর জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হয় না। শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার। প্রত্যেকে যেন বিদ্যালয়ে প্রত্যহ পরিষ্কার হয়ে আসে। চুল আঁচড়ানো, প্রত্যহ দাঁত মাজা, স্নান করা, কাপড়-জামা পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা সবই এই পর্যায়ে পড়ে।

ভোরে ওঠা। ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। অতি অল্প আয়াসেই এটি অভ্যাসে পরিণত করা যায়। অভ্যাসে পরিণত হ'লে তখন আর ভোরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। রাত্রে সুনিদ্রায় শরীরের মাংসপেশীর ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়; স্নায়ু সতেজ, মন প্রফুল্ল হয়। সমস্ত দেহ আবার দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হয়। এ সময়ে শয্যা ছেড়ে না উঠলে দেহের কাজ করবার ক্ষমতা নষ্ট হ'তে থাকে। অধিক দিন অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকার অভ্যাসের ফলে মানুষ অলস ও অকর্মণ্য হ'য়ে পড়ে।

দেহকে কার্যক্ষম রাখতে হ'লে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের অভ্যাস ও ভোরে ওঠার অভ্যাস করতে হবে। আমরা যাই খাই না কেন তার অসার অংশ মলে পরিণত হয়—যা অত্যন্ত দূষিত ও বিষাক্ত। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে দেহ থেকে মল নির্গত না হ'লে এই বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে অনেক জটিল ও মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অধিক দিন কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ফলে মন নিরানন্দ ও উৎসাহহীন হ'য়ে পড়ে, কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না, হজম-শক্তি লোপ পায়, দাঁতের রোগ হয়, মাথার যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং অতি শৈশব হ'তেই যাতে শিশুর নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সেই দিকে প্রত্যেক মাতা-পিতা বা শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা দরকার। প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ অভ্যাসের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হ'য়ে যায়। এরপর হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ভোরের নির্মল বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এলে শরীর ও মন ভালো থাকে।

নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা—ভাঙা ও গড়া প্রকৃতির নিয়ম। দেহের মধ্যেও চলেছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা। দিনের পরিশ্রমে শরীরে ভাঙন চলে, রাতের বিশ্রামে আবার তার গঠন শুরু হয়। সমস্ত দিন নানা কাজে শরীরে ক্ষয় হয় প্রচুর। সেই ক্ষয় পূরণের জন্যে চাই বিশ্রাম; বিশ্রামের জন্য চাই সুনিদ্রা। সমস্ত দিনের কাজের পর শ্রান্ত মাংসপেশী ও ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হয়ে আসে। তখন তাদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত রাখা অসংগত। কাজেই রাত্রি অধিক হবার আগেই আহার শেষ ক'রে নিদ্রা যাওয়া বিধেয়। নিদ্রার পূর্বে আহারের পরিমাণ হবে কম; তাতে শরীর থাকবে স্নিগ্ধ, মন হবে প্রফুল্ল।

ভোরে ওঠার মতো রাত্রি অধিক হবার আগেই ঘুমোবার অভ্যাস করতে হয়। প্রতিদিন বয়সানুযায়ী যথেষ্ট নিদ্রার প্রয়োজন। সুনিদ্রাতে দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয় এবং ভোরে প্রফুল্লচিত্তে ওঠা যায়। কাজেই ঘুমোবার সময় মনকে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করা দরকার। চিন্তাভারাক্রান্ত মনে সুনিদ্রা সম্ভব নয়। পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আবশ্যক। নিদ্রাতে দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়। তাই রাত জাগা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। নিদ্রার সময় ঘরের জানালা খুলে রাখা দরকার, যাতে অবাধে বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে চলাচল করতে পারে। শোয়ার ঘরে বেশি আসবাবপত্র রাখা স্বাস্থ্যের

পক্ষে প্রতিকূল। অত্যধিক জিনিসপত্রে শোয়ার ঘর বোঝাই থাকলে সেই ঘরে বাতাস চলাচলের বিঘ্ন হয়; ঘরে দুর্গন্ধ হয়। এক বিছানায় বেশি লোক শোয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শোয়ার ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভালো হওয়া দরকার। ঘরের পাশে যাতে আবর্জনা না জ'মে থাকে সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে। ঘরের পাশের ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ বের হ'লে বা আবর্জনার স্তূপ থাকলে বায়ু দূষিত হয়। ঘরের দেয়ালে ভালো ছবি দু-একখানা থাকলে তা মনের প্রফুল্লতা আনে।

নিদ্রার সময় সোজা এক পাশ হয়ে শুতে হয়। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা স্বাস্থ্যসংগত নয়। চিৎ হয়ে বুকের উপর হাত রেখে শুলে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটে। সোজা হয়ে ডান পাশ ফিরে শোয়া সমীচীন, কারণ তাতে হৃৎপিণ্ডের উপর অযথা চাপ পড়ে না। নিদ্রার সময় মস্তিষ্ক বিরতি পায়। ফলে, রক্ত-চলাচল তখন মাথা থেকে দেহতেই হয় বেশি, দেহ উত্তপ্ত হয়। এজন্য দেখা যায়, গরমের দিনে ঘুমুলে দেহ ঘর্মাক্ত হয়; শীতের দিনেও ঘুমের পর শীতের তীব্রতা ক'মে যায়। পা ঠাণ্ডা থাকলে কিংবা মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকলে সহজে ঘুম আসে না। সেজন্য সহজে ঘুম না এলে পা গরম জলে ধুয়ে নেওয়া ভালো। চোখে-মুখে বা ঘাড়ে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিলেও সহজে ঘুম আসে। ঘুমোবার আগে সৎচিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

নিদ্রার সময় যাতে নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে তা অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করা খুবই খারাপ অভ্যাস। এই অভ্যাসের ফলে মুখ-গহ্বরের পিছনে যে অ্যাডিনয়েড গ্ল্যাণ্ড আছে তা ক্রমশ স্ফীত হয়ে মুখ ও কানের সংযোগ-নল বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তাতে কালা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শিশুকাল থেকে মুখ বুঁজে শোয়ার অভ্যাস করা দরকার, যাতে নিশ্বাসের কাজ নাকের দ্বারাই হয়।

নিদ্রা ছাড়াও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'লেই বিশ্রাম করা দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় ও দেহ নানা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্রম ও বিশ্রাম দুই-ই সমভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল। চিকিৎসকগণ তাই রুগ্ন ব্যক্তিদের শুয়ে থাকতে উপদেশ দেন।

বিশ্রামের সময় সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করতে হবে।

অনেক সময় অন্য কাজ ক'রেও বিশ্রামের প্রয়োজন সাধিত হয়। বিদ্যালয়ে ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত লেখাপড়া করবার পর শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ছুটির পর তারা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে খেলাধুলোতে মেতে যায়। এইরূপে মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও দেহের পরিশ্রমের লাঘব হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ব'সে শুধু লেখাপড়ার কাজ ক'রে থাকেন, তাঁদেরও কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে নানারূপ খেলাধুলো করা ভালো। এঁদের মধ্যে অনেকেই শরীরের পরিশ্রম দ্বারা মনের ক্লান্তি এইভাবে দূর করেন। পক্ষান্তরে যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমে দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা সন্ধ্যাবেলায় পুঁথিপাঠে, কীর্তন গানে ও নানা হাল্কা কাজে দেহের শ্রান্তি দূর করেন।

ব্যায়াম

দেহ ও মনের সুসামঞ্জস্যের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা দেহ সুগঠিত হয়, স্বাস্থ্য ভালো হয় ও মন প্রফুল্ল থাকে। ক্রমশ দেহের শক্তি-বৃদ্ধি হয় এবং গতির ক্ষিপ্রতা আসে; দেহের যন্ত্রসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে ও রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের উপর ব্যায়ামের প্রভাব হিসাবে ব্যায়ামকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ

পুষ্টিসাধক ব্যায়াম—এইরকম ব্যায়ামের দ্বারা দেহের উন্নতি সাধিত হয়, মাংসপেশী দৃঢ়, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম করা উচিত। বার, ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদির সাহায্যে ব্যায়াম করা যেতে পারে। খালি হাতে ব্যায়ামের মধ্যে ডন, বৈঠক, কুস্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দৌড়োনো, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলম্ফন প্রভৃতি ক্ষিপ্রতা-বৃদ্ধিকারক ব্যায়ামগুলিও এই পর্যায়ভুক্ত।

শরীর-গঠনকারী ব্যায়াম—দেহের কোনো অংশ স্বাভাবিক না থাকলে ব্যায়াম দ্বারা সে দোষ দূর করা যায়। যেমন—চ্যাপ্টা পায়ের পাতা

দিয়ে হাঁটা-চলা করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা পায়ের এই দোষ দূর করা যায়। শোয়া, বসা, চলা-ফেরার দোষে অনেক সময় মেরুদণ্ড বক্রাকৃতি ধারণ করে; ব্যায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। প্রথম অবস্থায় এদিকে লক্ষ্য না রাখলে পরিণামে কুফল ফলে, দেহ কুঁজো হয়। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ার ফলে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে।

আমোদজনক ব্যায়াম—নানারকম খেলার দ্বারা মন ও শরীরের স্ফূর্তি হয়। কোন পরিস্থিতিতে কিরূপ খেলা উচিত—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে ঠিক ক'রে ফেলতে পারে সে-ই পাকা খেলোয়াড়। মনের ক্ষিপ্রতা না হ'লে ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না। খেলার দ্বারা শিক্ষার্থী সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখে, নিয়ম মেনে চলাফেরা করতে শেখে।

নানারূপ কৌতুক-কসরৎ—এই ব্যায়ামের দ্বারা সূক্ষ্ম মাংসপেশীসমূহ সতেজ হয়। অভ্যাসের দ্বারা এই সব মাংসপেশী আয়ত্তে আনা যায়। সূক্ষ্ম মাংসপেশী আয়ত্তে থাকলে নানারকম কসরৎ করা যায়।

মাংসপেশীর উপর ব্যায়ামের প্রভাব—ব্যায়ামের সময় রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি হওয়ায় মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মাংসপেশী সজীব থাকে, হৃৎপিণ্ডের কার্য দ্রুততর হয় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দৃঢ় হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য দ্রুততর হওয়ায় ফুসফুস অধিক অম্লজান গ্রহণ করে, রক্তশোধন-কার্যও দ্রুততর হয়।

ব্যায়ামের দ্বারা হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ভুক্তদ্রব্য ভালো হজম হওয়াতে শরীরের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, শরীর উত্তপ্ত হয়ে ঘর্মগ্রন্থিগুলি খুলে যায়, এবং ঘামের সঙ্গে দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

শিশু যখন বসতে বা দৌড়োতে শেখে, তখনই তার বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমাবস্থায় যদি ঠিকভাবে দৌড়োতে বা বসতে না শেখে তবে কতকগুলো দুষ্টভঙ্গি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। পরে এই ভঙ্গি শোধরানো শক্ত হয়ে পড়ে। কতকগুলো মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে আমরা দাঁড়াই অথবা চলি। মাংসপেশীগুলো যাতে দেহকে পুষ্ট রাখতে পারে সেইভাবে অভ্যাস করা দরকার। অনেকে এক কাঁধ উঁচু ক'রে আর এক কাঁধ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ বা মুখ এগিয়ে দিয়ে

একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। অধিকদিন এরূপ দাঁড়াবার অভ্যাসের ফলে মেরুদণ্ডে কুব্জতার স্বৃষ্টি হয়।

দাঁড়াবার নিয়ম—সোজা হয়ে দু'পায়ের উপর দেহের ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। মাথা উঁচু ক'রে, সোজা বুক এগিয়ে ও পেট ভিতর দিকে টেনে দাঁড়ালে ভালো দেখায়। এভাবে দাঁড়াবার ফলে দেহ সুঠাম হয়, মনে নিশ্চয়তার ভাব আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

শোয়া-বসার নিয়ম—বসবার সময় দু কাঁধ সমান রেখে শির-দাঁড়া সোজা রেখে বসবার অভ্যাস করতে হয়। কখনো সামনে ঝুঁকে বসতে নেই। পড়ার সময় বই দু চোখের থেকে এক ফুট দূরে রেখে পড়তে হয়। বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়াশোনা করা উচিত নয়।

শোবার সময় দেহ সোজা ক'রে এক পাশ ফিরে শোবার অভ্যাস করা দরকার। মাথার বালিশ মোটামুটি নরম হ'লে ভালো হয়। খুব শক্ত বা খুব নরম বিছানাতে শোয়া ভালো নয়।

ভঙ্গির দোষে দেহ অস্বাভাবিক ভাবে গঠিত হয়। দেহ প্রসারিত না হ'লে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে, ফলে তাদের কাজ ব্যাহত হয়। কোনো সময়ে যদি তলপেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও পিঠ পিছনে এগিয়ে পড়ে, তাহ'লে সহজে পরিপাক হয় না এবং উদরাময় ইত্যাদি রোগ হতে পারে। দুষ্ট ভঙ্গিবিশিষ্ট মানুষ অনেক সময় অপরের কৌতুকের পাত্র হয়।

দেহ ও মনের ক্রিয়া

দেহের অধীশ্বর মস্তিক। এখন দেখা যাক, বিভিন্ন অবস্থায় মস্তিষ্কের কি কি পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আগে আমাদের তা জানতে হবে।

মস্তিষ্কই সমস্ত উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র। শরীরে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়জ প্রতিক্রিয়া হয় তা নালীবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্কের সঙ্গে যদি কোনো ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হয় তবে সেই ইন্দ্রিয় অচল হয়ে পড়ে; তখন মন কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ায়ই সাড়া দেয় না। মস্তিষ্কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যদি কারুর পক্ষাঘাত হয়, তবে স্পর্শানুভূতিতে

তার মন কিছুতেই প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আগে সমস্ত উত্তেজনা মস্তিষ্কে বাহিত হয়।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে যতক্ষণ কোনো উত্তেজনা মস্তিষ্কে গিয়ে না পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ কোনো উত্তেজনা বা সংবেদনই হয় না। বহিঃউত্তেজকের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং মস্তিষ্কে তার গমন—এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী সময়ে ইন্দ্রিয়ে কোনো উত্তেজনা বা প্রতিক্রিয়া হয় না। বরফে হাত দিলেই ঠাণ্ডা লাগে না, যতক্ষণ না তা গিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে।

মস্তিষ্কে কোনো আঘাত লাগলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, অথচ মনের উপর তার প্রভাব নেই। স্নুতরাং মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের সম্পর্কটি খুবই জটিল।

মস্তিষ্কের অতিরিক্ত ব্যবহারে মন পরিশ্রান্ত হয়। অতিরিক্ত চিন্তায় অনেক সময় গায়ের উত্তাপ বাড়ে ও দুর্বলতা বোধ হয়। রক্ত-সঞ্চালনও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্নুতরাং মস্তিষ্কের ব্যায়াম বলতে মানসিক পরিশ্রম বোঝায়।

মস্তিষ্ক ছাড়াও শরীরের প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিগূঢ়। যেমন, গ্রন্থির রসক্ষরণ, স্নায়ু-প্রক্রিয়া, রক্তের উপাদান, রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাস-প্রক্রিয়া—সমস্তই প্রভাবিত করে মনকে। তার জন্য মন যে প্রভাবিত হয় তা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। রসক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। রক্তের উপাদান মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

স্নুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীর ও মন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল। অনেক ক্ষেত্রেই শরীর ও মন কার্য-কারণরূপে কাজ করে। স্নায়ুমণ্ডলী এই দেহ-মনের যোগসূত্র রচনা করে।

স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলী

স্নায়বিক প্রক্রিয়ার কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া (sensory function); (২) কর্মাত্মক ক্রিয়া (motor function); (৩) সংযোগ ক্রিয়া (associative function)।

প্রথমটি হ'ল জ্ঞানদা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। এই স্নায়বিক প্রক্রিয়ার কাজ হ'ল

বাইরে থেকে উত্তেজকের উত্তেজনা বয়ে নিয়ে যাওয়া। এই জ্ঞানদা স্নায়ু উত্তেজনা বয়ে নিয়ে যায় তিন-চারটি জায়গায়,—হয় কোনো স্নায়ুকোষে, না হয় সুষুম্না-রজ্জুস্থিত স্নায়ুকোষে, না হয় Brain stem বা মেডুলায়, না হয় মস্তিষ্কে। উত্তেজকের অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়ের সামনে উত্তেজকের উপস্থিতি থেকে এর কাজ শুরু হয়। যতক্ষণ কোনো স্নায়ুকোষে এর সংবাদ যাচ্ছে ততক্ষণ এ কাজ করে। কেন্দ্রে সংবাদ পৌঁছে দিতে পারলেই জ্ঞানদা স্নায়ুতন্ত্রের (Sensory function) কাজ শেষ।

দ্বিতীয়টি হ'ল কর্মদা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। কর্মদা স্নায়ুতন্ত্র যোগাযোগ সাধন করে। কোনো কেন্দ্রীয় স্নায়ুকোষ থেকে পেশী পর্যন্ত বা গ্রন্থি পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া বয়ে নিয়ে যায়।

আর তৃতীয়টি হ'ল সংযোগী স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। অনুভূতি ও কাজের মধ্যে যোগসাধন করা হচ্ছে এর কাজ। মস্তিষ্কের আজ্ঞা ধারণার রূপ নিয়ে বা অনুভূতির রূপ নিয়ে যায়—সেটা কাজ নয়, ধারণার অনুভূতি। যেমন, স্মৃতি, বুদ্ধি, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি। এগুলো নিয়ে যায় সংযোগী স্নায়ু, পৌঁছে দেয় কর্মদা স্নায়ুতে, যা আবার কর্মে রূপান্তরিত হয়।

সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু স্নায়বিক প্রক্রিয়ার অধীশ্বর। তার মধ্য দিয়েই সমস্ত প্রক্রিয়ার যোগ সাধিত হয়। কশেরুকার মধ্যস্থিত গর্ত দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পা পর্যন্ত টানা আছে এই রজ্জু। কত শত তন্তু এসে মিশেছে এতে, আবার বেরিয়ে গেছে। Cerebro-spinal systemএ এটিই হ'ল মস্তিষ্কের পাদপীঠ। চোখে নেই ঘুম, সর্বদাই চলছে টুকিটাকি কাজ। Reflex থেকে আরম্ভ ক'রে Complex situational problem-এর action পর্যন্ত সব কাজে আছে এই সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু—সর্বদা সজাগ ও সক্রিয়।

Reflex arcএর কেন্দ্র নিউরোনগুলো। অতএব একেই পরিচালনা করতে হয় সমস্ত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াকে। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াগুলোর মধ্যে কতক সচেতন, কতক অবচেতন—দুটিরই পরিচালনা করে সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু।

তারপর সুষুম্না স্নায়ুরজ্জুই নিয়ন্ত্রিত করে সমস্ত অভ্যাসমূলক কর্ম। কারণ এই কর্মগুলো এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা কেন্দ্র-মস্তিষ্কে না গিয়ে সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু থেকে ফিরে আসে এবং তখন যন্ত্রচালিতের মতো কাজ হতে থাকে। সেই যন্ত্রচালকের ভার নেয় Spinal cord। অতএব প্রত্যাবর্তক

ক্রিয়ার (Reflex action) মতো স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম (Automatic action), অভ্যাসমূলক কর্মের (Habitual action) মতো Secondarily automatic action সব কিছুরই ভার নেয় Spinal cord।

Reflex Arc (প্রত্যাবর্তক চাপ)—যেসব কাজে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই সেগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কে নয়। এ হচ্ছে জরুরী অবস্থা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা। হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে হলে সেটি নিয়ন্ত্রণ করে সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু, মস্তিষ্ক নয়। তা হলেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কথা এসে পড়ে। আর যেভাবে সেই প্রক্রিয়া হয় তাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তক চাপ।

প্রত্যাবর্তক চাপ তৈরি হয় তিনটি জিনিস নিয়েঃ (১) জ্ঞানদা স্নায়ু; (২) কেন্দ্রের সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু; (৩) কর্মদা স্নায়ু।

কারও হাতে মাছি বসলে অপর হাতটি আপনা আপনি উঠে গিয়ে মাছির উপর পড়ে। এটি হ'ল Reflex action বা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। এতে বিচার-বিবেচনার কোনো দরকার হয় না। কোনো একটা উত্তেজকের প্রতি এরূপ প্রতিক্রিয়া হ'ল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। তাহলে Centre বা জ্ঞানদা ও কর্মদা স্নায়ুর কেন্দ্র থাকবে সুষুম্না স্নায়ুরজ্জুতে, ওর কেন্দ্র মস্তিষ্কে থাকবে না; কারণ, এক্ষেত্রে কোনো কিছু বিচার-বিবেচনার দরকার হচ্ছে না।

এক একটা স্নায়ুকোষ হ'ল নিউরোন (Neuron)। যে Reflex arc-এ দুটো স্নায়ুকোষ থাকে তাকে বলা হয় সহজ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। এই দুটি স্নায়ুকোষ হ'ল—জ্ঞানদা স্নায়ুকোষ আর কর্মদা স্নায়ুকোষ।

কিন্তু যেখানে দুটোর বেশি স্নায়ুকোষ থাকে তাকে বলে Intercolated Reflex arc। প্রত্যেক Reflex arc-এ দুটো স্নায়ুকোষ থাকবেই। উপরন্তু যখন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া সুষুম্না স্নায়ুরজ্জু থেকে ঘুরে আসে তখন সুষুম্না স্নায়ুকোষের আরও কোষ এসে ঐ ক্রিয়ার সঙ্গে মেশে। স্নায়ুরজ্জুর একটা কোষের সঙ্গে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া-স্রোত মিলিত হয়েছে। অনেক সময় সুষুম্না স্নায়ুরজ্জুর সঙ্গেই স্নায়ু প্রতিক্রিয়া আবার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, তখন একটি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার অনেকগুলো সুষুম্না স্নায়ুকোষ দেখা যায়।

Reflex action আবার দুরকমের হতে পারে, যথা :

(১) স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া বা Unconditioned Reflex action.

(২) কৃত্রিম প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া বা Conditioned Reflex action.

আমাদের আহার-বিহার, আরাম-বিরাম প্রভৃতি অধিকাংশ শারীরিক এবং মানসিক কাজের নিয়ন্ত্রণকর্তা মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক তার কাজ চালায় আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে। আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন ক'রে তাদের নির্দিষ্ট কাজে লাগাবার ভার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর।

শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিই স্নায়ুশিরার সাহায্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগ সংঘটন খুব তাড়াতাড়িই হয়। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে ডানদিকে আর বাঁদিকে বারোটা ক'রে স্নায়ু শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করবার জন্য নিচের দিকে নেমেছে। এই স্নায়ুশিরাগুলিই আমাদের ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে। মস্তিষ্ক থেকে যেমন বারো জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে, মেরুদণ্ড থেকেও তেমনি একত্রিশ জোড়া স্নায়ু নানা জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঐসব স্নায়ু বিভিন্ন জায়গার খবর মেরুদণ্ডে পৌঁছে দেয়। মেরুদণ্ড তখন সেই খবর মস্তিষ্কে জানায়। আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শানুভূতি, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতি এইসব স্নায়ুর উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী নামে আর একরকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে। এগুলি মেরুদণ্ডের দুপাশে থাকে। ক্রোধ, উত্তেজনা, অনুভূতি প্রভৃতি ক্রিয়ার পিছনে এগুলি কাজ করে।

প্রতিটি স্নায়ুই বহু নিউরোনের সমষ্টি। এই নিউরোনের সাহায্যেই স্নায়ুশিরাগুলি ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত খবরগুলি মস্তিষ্কে পাঠায়।

স্নায়ুশিরাগুলি তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) জ্ঞানদা (Sensory); (২) কর্মদা (Motor); (৩) সংযোগী (Connectives)।

জ্ঞানদা ও কর্মদা স্নায়ু দুটি যথাক্রমে অনুভূতি জাগায় ও কাজ করায় ব'লে ইংরেজীতে এদের afferent ও efferent nerves বলে।

জ্ঞানদা (Sensory)—এরা ইন্দ্রিয়গুলির আহৃত জ্ঞান মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। এরা কেবলমাত্র আবেগসমূহ ভিতরে পৌঁছে দেয়; তাই এদের ইংরেজীতে in-carrying nerves বলা হয়।

কর্মদা (Motor)—এরা মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্ক-নির্দিষ্ট আবেগ পেশী বা গ্রন্থিতে পৌঁছে দেয়। এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে আসা। তাই এদের ইংরেজীতে বলে out-carrying nerves।

সংযোগী (Connectives)—কেবলমাত্র অনুভূতি ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে।

প্রত্যেক স্নায়ুকোষের একটি ক'রে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে। কেন্দ্রীয় কোষ থেকে একটা সুতোর মতো শাখা বের হয়। একে বলা হয় Axon। আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু সুতোর মতো অঙ্গ বের হয়। এগুলিকে বলা হয় Dendron। Axonগুলি লম্বায় আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। Axonগুলি সাধারণত সরল। Dendron-গুলি অনেকটা ঠিক গাছের শাখা মূলগুলির মতো। এরা সব সময় শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। কতকগুলি স্নায়ুকোষ একত্র হয়ে Ganglia সৃষ্টি করে। স্নায়ুকোষগুলি কর্মধারা অনুসারে উপরোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত।

সাইন্যাপ্‌স্ (Synapse)—বিভিন্ন স্নায়ুকোষের Axon-এর শেষ অংশ ও Dendron পরস্পর যুক্ত হয়ে Synapse-এর সৃষ্টি করে। এই যোগাযোগের সময় এরা একসঙ্গে জুড়ে যায় না। সাইন্যাপ্‌সের ভেতর দিয়েই এক স্নায়ুকোষ দিয়ে অন্য স্নায়ুকোষে আবেগ সহজেই পথ ক'রে নেয়। এইভাবে অসংখ্য Synapse-এর মধ্য দিয়ে আবেগ মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এর গতিপথ একমুখী। প্রতিদিন আমাদের শরীরের অসংখ্য স্নায়ুকোষ কাজ ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই কাজের ফলে তাদের বয়স যায় ফুরিয়ে। তখন আসে অবসাদ। রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নায়ুকোষেরা নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে। পুষ্ট হয়ে পরদিনের কাজের জন্যে তারা অপেক্ষা করে।

আমরা দেখি, মদ খেয়ে লোকে দুঃখ ভোলে, মর্ফিয়া নিয়ে রোগের যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। এগুলো আর কিছুই নয়, এই সব অতি-উত্তেজক জিনিসগুলো স্নায়ু-সন্ধির বাধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

ফলে, দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতিগুলো আর মস্তিষ্কে পৌঁছোয় না। তাই ঐ সময়টায় দুঃখ-যন্ত্রণা আর টের পাওয়া যায় না।

এই স্নায়ু-সন্ধিগুলো ভেদ ক'রে যেতে আবেগের প্রথমটা কিছু অসুবিধা হয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পথটা কিছু সুগম হয়। কারণ স্নায়ু-সন্ধিরা সহজে কোনো আবেগকে তার নির্দিষ্ট পথে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। কারণ এই আবেগের আগের একটি আবেগ এই সব স্নায়ু-সন্ধির ভেতর দিয়ে যাতায়াত ক'রে তার নিজের পথকে সহজ ক'রে নেয়। নতুন আবেগ এসে সেই আগের আবেগের পথটি ধ'রে যায় না। তার ফলেই এই বাধার সৃষ্টি। আমরা যখন নতুন কোনো কিছু শিখি, তা সে কবিতা, অঙ্ক বা অন্য কিছুই হোক, প্রথমবার আমাদের একটু অসুবিধা হয়। তারপর, বারে বারে অভ্যাস করতে করতে জিনিসটা সহজ হয়ে যায়। কারণ, তখন স্নায়ু-সন্ধির পথটি সরল হয়ে যায়। আর বাধা থাকে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বারংবার কোনো কাজ করার অভ্যাসের একটি দাম আছে। অনবরত কাজের জন্য স্নায়ু-সন্ধিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই তার ক্লান্তি দূর করবার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। সেটা অনেকটা বিশ্রামের সাহায্যে সম্ভবপর হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ একটা কবিতা নিয়ে ব'সে থাকে, কিছুতেই মুখস্থ করতে পারে না। সেই সময় তাদের যদি বলা হয় দশ মিনিট ঘুরে এসে তারপর মুখস্থ করতে, তাহলে ভালো ফল পাওয়া যায়। গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে হচ্ছে, কিছুই মনে থাকছে না। পরদিন ভোরে কিন্তু সেই পড়াই সহজে হয়ে গেল। আবার অনেকে রাত্রিতে চা, কফি, প্রভৃতি খেয়ে ঘুম তাড়িয়ে পড়াশোনা করে। চা বা কফি পান করলে শরীরে উত্তেজনা আসে। উত্তেজনায় স্নায়ু-সন্ধির বাধা কিছুটা দূর হয়। তবে এইভাবে উত্তেজক দ্রব্যের সহায়তায় পড়াশোনা করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

মস্তিষ্ক

প্রাণিজগতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষের বর্তমান পরিণতি হয়েছে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে। আচার-আচরণে

সে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার বোধ-কেন্দ্র মস্তিষ্ক। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিষ্কের গঠন ও আকার উন্নততর। প্রাণিজগতে এককোষী অ্যামিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সে তার ঐ একমাত্র কোষ দিয়েই সবকিছু করে। সামান্য অ্যামিবা থেকে বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভেতর আস্তে আস্তে বোধ এসেছে। মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা পেয়েছে।

মস্তিষ্কের পরিমাপটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। দেখা গেছে, বহু মনীষীর মস্তিষ্কের পরিমাপ অতি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। আলোকপ্রাপ্ত সভ্য মানুষের চেয়ে এক জাতের এস্কিমোর মস্তিষ্ক বৃহৎ হলেও তাদের বুদ্ধি বেশি নয়। বুদ্ধি নির্ভর করে অন্য বিষয়ের উপর। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে মগজের ভেতর বিভিন্ন নিউরোন কত কাছাকাছি হয়ে সাইন্যাপ্‌সের সৃষ্টি করেছে তার উপর। যার মাথায় যত বেশি এই কাজ হবে তার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য তত বেশি। ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্যাপ্‌সের সংখ্যা খুবই কম থাকে।

আমাদের মাথার নিউরোনগুলো দুই রঙের—শাদা এবং ছাই রঙের। যার মাথায় যত ছাই রঙের নিউরোন আছে তার বুদ্ধির কৌশল তত বেশি হবে। শাদা জিনিসের কাজ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। শৈশবে এগুলি তৈরি হয় না। আর বার্ধক্যে এগুলির অবনতি হয়। সেই জন্যে এই দুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ছাই রঙের নিউরোন মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, চিন্তার পরিচালন, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতির সহায়।

মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি ছোট-বড় খাদ আছে। মস্তিষ্কের মধ্যে এই খাদ যার যত বেশি হবে তার ছাই রঙের জিনিস তত বেশি থাকবে। তাই বুদ্ধিমান লোকদের মস্তিষ্ক বেশি কোঁচকানো, তার খাদের সংখ্যাও বেশি।

আমাদের দেহের ডানদিকের সমস্ত শিরা-উপশিরা মস্তিষ্কের বাঁ দিকে এসে মিলেছে আর বাঁ দিকের শিরা-উপশিরাগুলি এসে মিলেছে মস্তিষ্কের ডানদিকে। তাই আমাদের ডানদিকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্তা বাম মস্তিষ্ক, আর বাঁ দিকের নিয়ন্তা ডানদিকের মস্তিষ্ক।

গুরুমস্তিক (Cerebrum) আমাদের মাথার অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। ঘাড়ের একটু উপর থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত মাথাটাই এর অধিকারে। গুরুমস্তিষ্ক প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। গুরুমস্তিষ্ক এই স্নায়ুমণ্ডলীর আবেগকে বয়ে আনে। আর এখান থেকেই সেই আবেগের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে গিয়ে পৌঁছোয়। গুরুমস্তিষ্কের এক এক অংশ এক একটা কাজ করে। যে অংশগুলিতে আবেগ এসে তার উপস্থিতি জানায় তাকে বলে জ্ঞানদা ভূমি বা Sensory area। যে জায়গাগুলি থেকে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাকে বলে কর্মদা ভূমি বা Motor area। আর যে অংশ এই অংশগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে তাকে বলে সংযোগ ভূমি বা Connective area। লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum) গুরুমস্তিষ্কের নিচে আর ঘাড়ের উপরে থাকে। লঘুমস্তিষ্কের দুটি ভাগ। আমাদের দেহে বহু পেশী আছে এবং আমাদের বহু কাজ আছে যা করতে দেহের একাধিক পেশীর সাহায্য নিতে হয়। লঘুমস্তিষ্ক এই সব পেশীর নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘাড়ের নিচের থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট ছোট হাড়ের সমষ্টি হ'ল মেরুদণ্ড। এরা সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এই ছোট ছোট হাড়গুলির মধ্যে আছে মেরুমজ্জা। প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে। এগুলি মেরুদণ্ডের দু' পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসঙ্গে মিলেছে। এদের আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এরা বিভিন্ন পেশী, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মিশেছে।

পেশী

আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেশী। মস্তিষ্ক প্রতিটি আবেগের একটি ক'রে প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট পেশীতে পাঠায়। পেশী তা কাজে পরিণত করে। দেহের সমস্ত পেশীকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়—ঐচ্ছিক আর অনৈচ্ছিক। সাধারণত বাহ্য দেহের কাজে আমরা যে পেশীগুলিকে ইচ্ছামতো চালনা করতে পারি সেগুলোকে বলে ঐচ্ছিক পেশী। আমাদের দেহের ভেতরের যে কাজগুলো আপনা থেকেই হয়, সেই কাজের পেশীগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এগুলি আমাদের

ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এরা অনৈচ্ছিক। যেমন, রক্তচলাচল, পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস—এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীর কাজ। কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজের মূলে যেমন লিভার থাকে, তেমনি পেশীদের কর্মশক্তির মূলেও আছে বিভিন্ন রকমের লিভার। আমাদের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াবার পেছনে কাজ করে নানা রকমের লিভার।

ঐচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্কোচনশীল ও প্রসারণশীল এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। সঙ্কোচনশীল পেশীগুলির সাহায্যে আমরা যে কোনো জিনিসকে টানতে পারি, চাপ দিতে পারি। আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে এর উলটো কাজগুলোই করি। যেমন, কিছু ছুঁড়ে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মস্তিষ্ক-প্রেরিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই পেশীদের ফুলে ওঠা ধর্ম। অনৈচ্ছিক পেশীদের আমরা ঐচ্ছিক পেশীর মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই পেশীগুলির উপর খুব বেশি পড়ে। ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্য এই পেশীগুলির কাজে বাধা দেয়। আর মানসিক স্বাস্থ্য যখন সতেজ থাকে তখন এদের কাজ ভালো হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের উপর সব রকমের পেশীরই শক্তি নির্ভর করে।

পেশীর স্বাস্থ্য—কর্মশক্তির মূলে আছে পেশী। সুতরাং তার পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি জাগ্রত রাখবার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। পেশীর পুষ্টি খাদ্যগ্রহণে এবং ব্যায়ামে। খাদ্য পরিপাকের কাজটা পেশীকেই করতে হয়। আর পরিপাকের মধ্য দিয়েই তার নিজের পুষ্টিসাধন করতে হয়। কাজের ফলে ক্ষয় হয়, তাই পূরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় রাখা ও তার কর্মশক্তি বাড়াবার জন্য ব্যায়ামের দরকার। ঐচ্ছিক পেশীগুলি এই ব্যায়ামের ফলে বিশেষ উপকৃত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে ঐচ্ছিক পেশীগুলি। তাই ব্যায়ামের ফলে ঐচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টি পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক পেশীগুলির পুষ্টির সহায়তা করে। তবে অত্যধিক ব্যায়ামের ফলে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভালো হয় না। ফলে, তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। কোনো পেশীকেই একটানা একটা কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ ধ'রে একটানা লিখলে হাত টনটন করে। তখন ঐ পেশীর বিশ্রামের

প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যদি আবার লেখা যায় তবে সজীবতা ফিরে আসে। পেশী যদি সতেজ থাকে তাহলে আমাদের দেহ বেশি ক'রে অক্সিজেন নিতে পারে। অক্সিজেন আমাদের দেহের ভিতরের গ্লানি দূর ক'রে দেহে সজীবতা আনে। পেশীগুলি যাতে তাদের কাজ ভালো ক'রে করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী বিদ্যালয়গুলোয় পেশীর সুষ্ঠু সঞ্চালনের উপযোগী নানা কাজ দেওয়া হয়।

গ্রন্থি

আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলিকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ একরকম Duct glands, আর একরকম Ductless glands।

এই দু'রকমের গ্রন্থিই রসক্ষরণ করে। Duct glandগুলির ক্ষরণ বাহ্যিক। আমাদের নাক চোখ জিভ থেকে জল পড়ে; তা এই গ্রন্থিরই কাজ। Ductless glandগুলির ক্ষরণ আমরা চোখে দেখতে পাই না। তারা দেহের মধ্যে রস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দেহের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে। এদের হর্মোনও বলা হয়। Ductless glandগুলির মধ্যে থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি নানারকমের গ্রন্থি আছে। দেহের উপর এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি—এই গ্রন্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থি যদি তার নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহ'লে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যায়, চর্বি ক'মে যায়, মাথার চুল উঠে যায়; শরীরের তাপ ক'মে যায়, শরীর আর বাড়ে না। এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয়, মানসিক অবস্থারও তেমনি অধঃপতন হয়। কোনো কাজে উৎসাহ থাকে না। দিনরাত ঘুম আসে, বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত Cretin নামে যে জড়বুদ্ধি লোকদের দেখা যায় তাদের ঐ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের প্রভাব থাকে। এইজাতীয় জীবদের দেহে থাইরয়েড রসের ক্ষরণ হয় না। থাইরয়েডের কাজ যে বয়সেই বন্ধ হোক, সেই বয়সেই শরীর দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা হারায়।

যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ বেশি হয় তাহ'লে কম ক্ষরণের ঠিক উলটো ফলই

দেয়। দেহের অসম্ভব বৃদ্ধি হয়; শরীরে উত্তেজনা হয়; মানুষ চঞ্চল হয়ে পড়ে; হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে।

আমাদের দেহ, মন ও তাদের কার্যকলাপের উপর থাইরয়েড গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে। থাইরয়েডের চিকিৎসা ক'রে রোগগ্রস্ত বহু লোককে সুস্থ করা হয়েছে।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি—এই গ্রন্থি যদি নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে তাহ'লে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, দেহের রঙের পরিবর্তন হয়। দেহ ক্রমাগত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। এই গ্রন্থি বেশি কাজ করলে পুরুষ-দেহে রোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ-বেদনায় সহজে উত্তেজিত হয়। স্ত্রীদেহে এই গ্রন্থির বেশি কার্যকারিতায় পুরুষভাব ফুটে ওঠে।

এই গ্রন্থি যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে তাহলে পেশীগুলি সতেজ হয় ও কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। পেশীগুলি যখন বেশী পরিশ্রম করে তখন তাদের উত্তাপ বেড়ে যায়। এই উত্তাপের সমতা আনবার জন্য ঘাম হয়। এই গ্রন্থি ঘাম বেরনোয় সাহায্য করে। এই গ্রন্থি বীরকে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে, আবার কাপুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে।

পিটুইটারি গ্রন্থি—এই গ্রন্থি ভালোভাবে কাজ না করলে দেহের বৃদ্ধি হয় না। Midgets নামে খর্বকায় ব্যক্তিদের দেহের বৃদ্ধি বন্ধ করার মূলে এই গ্রন্থি। এদের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মতো হয় না। এই গ্রন্থির রসক্ষরণ বেশি হলে দেহের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর যোগ বেশি।

স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক উপাদান

শিক্ষা বলতে কেবল মানসিক উৎকর্ষই বোঝায় না। শিক্ষাই দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশকে সম্ভবপর ক'রে তোলে। দেহকে বাদ দিয়ে মনের বিকাশ আনা সম্ভব নয়। কারণ দেহ ও মনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই আজ শিক্ষাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিভাবে শরীর কার্যক্ষম থাকে, কিভাবে তাকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ ক'রে তোলা যায়, সে বিষয়ে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের সচেতন ক'রে তুলতে হবে। আর তা করতে হ'লে স্বাস্থ্যরক্ষার মৌল উপাদান কি কি তাও

জানা দরকার। আমাদের স্থূলদেহ কি চায়, কি তার চাহিদা, তা জেনে তাকে মেটাবার আয়োজন শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। বাতাস, আলো, তাপ—এ তিনটির প্রয়োজন একান্ত মৌলিক। এছাড়া খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন তো আছেই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; অঙ্গ-সঞ্চালনের অভাবে আমাদের দেহযন্ত্র পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম একান্ত আবশ্যিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামেরও প্রয়োজন। যে কোনো জীবন-যাত্রায় সার্থকতা আনতে গেলে শুচিতা আনতে হবে। আর সেজন্যে বেশভূষা ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বাঞ্ছনীয়। বাইরের পরিচ্ছন্নতা এলে তা মনকেও প্রভাবিত করে। এইভাবে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক উপাদান অনেকগুলি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সেই উপাদানগুলি কিভাবে আহরণ করা যায়, কিভাবে তার সন্ধান মেলে সে নির্দেশ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, স্বাস্থ্য বলতে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য বোঝায় না, মানসিক স্বাস্থ্যও বোঝায়। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে তোলে।

বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার একটি মৌল উপাদান একথা আগেই বলা হয়েছে। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, কিছু পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। প্রাণীর জীবনধারণের জন্যে অক্সিজেনের একান্ত প্রয়োজন। শ্বাসগ্রহণের সময় আমরা যখন বাতাস টেনে নিই, তখন বাতাসের অক্সিজেন ফুসফুসের রক্তকণিকা দ্বারা শিরা ও উপশিরা পথে বাহিত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, দেহের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া ক'রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জল ও তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপ সমস্ত কাজের শক্তি জোগায় এবং দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে। সুতরাং অক্সিজেন প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি তখন বায়ু থেকে অক্সিজেন আমাদের দেহে শোষিত হয়, আবার যখন শ্বাস ত্যাগ করি তখন অবশিষ্ট গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে নির্গত হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি পরিমাণ বাতাসে থাকলে তা শরীরকে অসুস্থ ক'রে ফেলতে পারে এবং এর মাত্রাধিক্য ঘটলে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক ঘণ্টায় ৬ ঘনফুট কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এই

তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের পরিকল্পনা করা উচিত যাতে ঘরের জানলা বন্ধ থাকলেও সকলে প্রচুর অক্সিজেন পেতে পারে। শরীরে যে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে তা শুধু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্যই নয়। বাতাসের তাপবৃদ্ধি ও জলীয় বাষ্পের অভাব ঘটে ব'লে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। দেহের তাপ সঞ্চারের জন্য বাতাসের সঞ্চালন আবশ্যক।

এই সঞ্চালন দুইভাবে হতে পারে : বাইরের উন্মুক্ত বাতাসের স্বাভাবিক সঞ্চালন ও ঘরের মধ্যকার বাতাসের কৃত্রিম সঞ্চালন। স্বাভাবিক সঞ্চালন আবার মোটামুটি তিন প্রকারের হতে পারে : প্রথম, বায়ুপ্রবাহ, দ্বিতীয়, বায়ুর পরিচলন-প্রবাহ ও তৃতীয়, বায়ুর অনুপ্রবেশ। যাতে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের বায়ুপ্রবাহ অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখে গৃহের দরজা-জানলা, ঘরের আয়তন, সবকিছু নির্দিষ্ট করতে হবে। তারপর পরিচলন-প্রবাহের ব্যবস্থা। ঘরের তপ্ত বায়ু যাতে সহজে বার ক'রে দেওয়া যায় এবং বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস প্রচুর পরিমাণে ভিতরে আসতে পারে সেরকম ভেন্টিলেটার রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাতাসের প্রবাহ না থাকলেও তার অনুপ্রবেশ সবসময়েই চলছে। অর্থাৎ ঘরের দরজা-জানলা খোলা থাকলে বাইরের ও ঘরের বাতাস ধীরে ধীরে একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মিশে যায় এবং তাপের সমতা হয়। যাতে এই অনুপ্রবেশ সহজ হয় সেজন্য দরজা-জানলার ব্যবস্থা সে রকম রাখা আবশ্যক।

স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের সুবিধা যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে কৃত্রিমভাবেই বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্যে নানাজাতীয় কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, টবিনস্ টিউব (Tobin's tube)। এই কৌশল খুব ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। ঘরের দেয়ালের সমান্তরাল ক'রে প্রায় ৬ ফুট উঁচু একটা নল বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই নলের মধ্য দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে ও বাতাসের কৃত্রিম সঞ্চালন ঘটাতে পারে। শেরিংহ্যাম ভাল্ভ (Sheringham valve)-এর কৌশল আরও বৈজ্ঞানিক। এর সাহায্যে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভাল্ভ ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। বাইরে থেকে

বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে আনবার জন্য এই ব্যবস্থা খুবই ভালো। এই দুটি কৌশল ছাড়া অন্য কৌশলেরও প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন, বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে বায়ুসঞ্চালন। বড় বড় ঘরের দেয়ালে ভেন্টিলেটার তৈরি ক'রে সেখানে বহির্মুখী বায়ুসঞ্চালক পাখার সাহায্যে বাইরে থেকে বিশুদ্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, আর তার বিপরীত দিকে ঘুলঘুলিতে অন্তর্মুখী বায়ুসঞ্চালক পাখা বসিয়ে ঘরের দূষিত বাতাসকে বার ক'রে দেওয়া হয়। একসঙ্গে দুরকম পাখা চললে বায়ুসঞ্চালন বেশ ভালোভাবেই হয়।

সূর্যালোক

সূর্যই সর্বশক্তির মূল ; তার আলোয় আমরা দেখতে পাই, তার তাপে আমাদের জীবন-ধারণ সম্ভব হয়। স্বাস্থ্যের উপরে সূর্যরশ্মির যে আশ্চর্য ক্রিয়া দেখা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সূর্যরশ্মির যে অংশটা আমরা আলোরূপে দেখি তাকে বিশ্লেষণ করলে সাতটি বর্ণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের দীর্ঘতম তরঙ্গের আলো হ'ল লাল, আর ক্ষুদ্রতম হ'ল বেগুনি। জীবজন্তুর শরীরের উপরকার ত্বক বা উদ্ভিদের পাতার উপরিভাগ ভেদ ক'রে যায় বেগুনি পারের আলো (Ultraviolet rays)।

মানবদেহে অতিবেগুনির কার্যকারিতার মূল কারণ হ'ল ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। এই মূল উপাদান দুটিকে কাজে লাগানো দরকার। কারণ মানুষের ত্বকে এই রশ্মি লাগলে ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন হয়।

স্বাস্থ্যের উপর সূর্যালোকের প্রভাব—শৈশবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক না পেলে দেহের যথাযথ পুষ্টি হয় না। বিজ্ঞান এই সত্য আজ আবিষ্কার করেছে যে, শিশুদেহের খানিকটা অংশ প্রত্যহ সূর্যরশ্মিতে উন্মুক্ত না রাখলে তার অস্থি পুষ্ট হয় না। সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে অনেক ব্যাধির নিরাময় হয়। এছাড়া সূর্যালোক মানুষের ক্ষুধা, কর্মশক্তি সবকিছুই বাড়িয়ে দেয়। মানুষের মনে এনে দেয় স্ফূর্তি, দেহে নতুন উদ্দীপনা। তাই বিদ্যালয়-জীবনেও যাতে সূর্যালোকের কার্পণ্য না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তাকে সম্ভবপর ক'রে তুলতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে খোলা-মেলা জায়গায় খেলা-ধুলো, হাতের কাজ, এমন কি গাছের ছায়ায় পাঠনের ব্যবস্থা করাও

বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তাপকে পরিবেশন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শীতকালে দেহকে উষ্ণ পরিবেশে ও গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ পরিবেশে রাখতে হলে শ্রেণীতে অনুরূপ আয়োজনের দরকার। অবশ্য গ্রাম্যবিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা ততখানি সম্ভবপর নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ এই তাপ সংরক্ষণ কাজে সহায়তা করে। এর দুটি দিক আছে। একটি প্রয়োজনীয়তার দিক, আর একটি সৌন্দর্যের দিক। পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয় যুগের রুচি অনুযায়ী। এমন কতকগুলি বস্তু আছে যার মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই পরিবাহিত হয়ে চলে যেতে পারে। অপরিবাহী বস্তুর পোশাক পরিধান করলে দেহের তাপ বাইরে যায় না। তার ফলে শরীর গরম থাকে।

সাধারণত পশম অপরিবাহী। ঋতু অনুযায়ী কখনও পরিবাহী কখনও অপরিবাহী পোশাক ব্যবহার করা উচিত। বিভিন্ন ঋতুতে যে সব পোশাক ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে কয়েকটির দাহগুণ আছে। এই দাহগুণসম্পন্ন পোশাকের মধ্যে নাইলনের পোশাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই শিক্ষার্থীদের এই ধরনের পোশাক না পরাই উচিত। যাতে তারা সারা দেহ স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করতে পারে সেজন্য একটু আলগা পোশাক পরা ভালো। আবার খুব ঢিলে পোশাকও বাঞ্ছনীয় নয়। মোট কথা, পোশাক নির্বাচন করতে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন, দেশের জলবায়ু, বয়স, উত্তাপ-রক্ষা, দাহতা, পরিচ্ছন্নতা, ওজন ও স্বাচ্ছন্দ্য। এছাড়া স্ত্রী, পুরুষ ও বৃত্তিভেদে পোশাকের পরিবর্তন আনতে হবে।

খাদ্য

দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টির জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন আছেই। দেহকে সচল রাখতে হলে তার বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চারের জন্যে পুষ্টির প্রয়োজন। আমরা নানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি ও সেগুলি পরিপাকের পর যে রস আহরণ করি তা আমাদের প্রাণশক্তিকে বজায় রাখে। প্রয়োজন অনুযায়ী দেহ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি প্রভৃতি নানা পদার্থ খাদ্যের থেকে গ্রহণ করে। কিন্তু কেবলমাত্র এগুলির সাহায্যেই দেহকোষের সমস্ত চাহিদা পূরণ করা যায় না। এর জন্য চাই ক্যালসিয়াম, লৌহ, পটাসিয়াম, আয়োডিন, ক্লোরিন। এছাড়া ভিটামিন আমাদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার

জৈবক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য। খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করতে হলে দেহের সঞ্চালনে ও রেচনক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন। কেবল তা-ই নয়, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও বিবিধ লবণজাতীয় পদার্থেরও প্রয়োজন আছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে যে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক চাহিদার জন্যে মোটামুটি চাই একশ গ্রাম প্রোটিন, পাঁচশ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, একশ গ্রাম চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থ। অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম।

আমরা যা কিছু খাদ্য গ্রহণ করি, তার তাপ-উৎপাদনশক্তি অনুযায়ী ক্যালরি মূল্য মাপা হয়েছে। যেমন ঃ

এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট—চার ক্যালরি তাপ ;

এক গ্রাম প্রোটিন—চার ক্যালরি তাপ ;

এক গ্রাম চর্বি—নয় ক্যালরি তাপ।

লবণ বা ভিটামিন থেকে কোনো তাপ পাওয়া যায় না। দেখা যায়, চর্বির তাপ-উৎপাদন শক্তি সবচেয়ে বেশি। শিশুকালে তাপশক্তি বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। এক বছর বয়স পর্যন্ত দেহের প্রতি পাউণ্ড ওজনে দৈনিক পঁয়তাল্লিশ ক্যালরি, তিন বছর পর্যন্ত চল্লিশ ক্যালরি এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত চব্বিশ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্ক মানুষের বেলায় লাগবে প্রতি পাউণ্ডে ষোল ক্যালরি। তাহলেই দেখা যায়, একজন ১৪০ পাউণ্ড ওজনের মানুষের পক্ষে তাপশক্তি লাগবে ৩৫০০ ক্যালরি। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য থেকে এই তাপ আমরা সংগ্রহ করি। এছাড়া পেশী সঞ্চালনের ফলেও কিছু তাপ উৎপন্ন হয়।

যে যে খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজন তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বির কথা আগেই বলেছি। কার্বোহাইড্রেট সাধারণত দুই প্রকারের, শর্করা ও শ্বেতসার। শর্করার মধ্যে নানাপ্রকার ফল, দুধ, মধু ইত্যাদি ও শ্বেতসার জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে চাল, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রোটিন সাধারণত দুরকমের— একটি উদ্ভিজ্জ ও অন্যটি জান্তব। মাছ, মাংস ইত্যাদি জান্তব প্রোটিন সহজপাচ্য। স্নেহজাতীয় পদার্থের মধ্যে চর্বির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘি, মাখন এগুলি প্রাণিজ স্নেহ।

ভিটামিন হিসেবেও খাদ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। এক এক রকম ভিটামিন এক এক জাতীয় পুষ্টি আনে।

ভিটামিন A—এই ভিটামিন পাওয়া যায় সাধারণত ডিমের কুসুম, জান্তব চর্বি, মাখন, ঘি, মাংস ও টমেটো প্রভৃতি নানাপ্রকার সবজিতে।

ভিটামিন B—চালের খোসা, ফলের রস, ডিমের শ্বেতাংশ, অঙ্কুরিত ছোলা ও দুধে এই জাতীয় ভিটামিনের প্রাধান্য আছে।

ভিটামিন C—কমলালেবু, নানাপ্রকার লেবুজাতীয় ফলের রস, সবুজ শাক-সবজিতে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন D—অস্থিগঠনে এই ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা বেশি। সাধারণত কড লিভার, হ্যালিবাট লিভার প্রভৃতির মধ্যে এই জাতীয় ভিটামিন বেশি।

ভিটামিন E—এই ভিটামিনের অভাবে জীবদেহে প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস পায় ও পেশী শিথিল হয়ে পড়ে। সাধারণত নানাপ্রকার ডাল, সবুজ তরকারী এবং মাংসের মধ্যে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

সুষম খাদ্য—দেহগঠনের মৌল উপাদান হিসেবে এতক্ষণ যেসব খাদ্য-দ্রব্যের আলোচনা করা গেল, তার যে কোনো একটির অভাব ঘটলে স্বাস্থ্য-হানি ঘটবে। তাই দেহের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হলে সব দিক থেকে বিচার ক'রে সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। খাদ্যতালিকা প্রস্তুতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, খাদ্যের মোট তাপমাত্রা যেন আড়াই হাজার ক্যালরির উপর থাকে এবং সেই সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপাদান পরিমাণ মতো পাওয়া যায়।

খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে সতর্কতা—স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে খাদ্যের নিয়মিত ও পরিমিত ব্যবহার দরকার। তা না হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতিরিক্ত আহার, অসময়ে খাদ্যগ্রহণ করা, অপরিচ্ছন্নভাবে যেখানে সেখানে খাওয়া, কারও উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ—এর সব কিছুই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। যাতে রোগবীজাণু খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

পুষ্টি ও অপুষ্টি—খাদ্য শুধু গ্রহণ করলেই হবে না, ভালোভাবে তা জীর্ণ করতে পারলে তবেই দেহের পুষ্টি ঘটবে, নচেৎ নয়। পুষ্টির অভাব ঘটলে

অপুষ্টিঘটিত যেসব লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে প্রধান হ'ল দেহে চর্বির অভাব, মাংসপেশীর শিথিলতা ও নানারকম বিকৃত ভঙ্গি। রক্তাল্পতা, সহজেই ক্লান্তিবোধ, মাথাধরা ইত্যাদি পুষ্টির অভাবেই দেখা দেয়। শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটলে অপুষ্টিঘটিত নানাপ্রকার ব্যাধির উদ্ভব হয়। তাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থাকে আরও নিয়মিত ও কার্যকরী ক'রে তোলার প্রয়োজন। প্রয়োজন হ'লে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থাকে অনুকূল ক'রে তুলতে হবে। সাধারণত শিক্ষার্থীরা যে সব দীন-দরিদ্র গৃহপরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে তা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তাই যাতে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা দুধ, বা ঋতু অনুযায়ী কিছু কিছু ফল বিনাব্যয়ে বা অল্পব্যয়ে পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে হীনবল, ভগ্নস্বাস্থ্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা কতটুকু আশা করতে পারি! যিনি বিদ্যালয়ের চিকিৎসক হবেন, তাঁকেও দরদী হতে হবে এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের অবনতির ও উন্নতির হিসেব রাখতে হবে। এইভাবে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্যে 'ক্লিনিক' ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রম

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা একটি প্রধান অঙ্গ, কারণ তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে তা চিন্তা করবার মতো। এই কার্যক্রমটি সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া যায়ঃ

(ক) স্বাস্থ্য-রক্ষণ;
(খ) স্বাস্থ্য-উন্নয়ন;
(গ) অস্বাস্থ্য-প্রতিরোধ।

স্বাস্থ্য-রক্ষণ কার্যক্রম

বিদ্যালয়-গৃহের পরিবেশ ও ব্যবস্থার উপরে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। যাতে জীবনের স্ফূর্তি ঘটে, মনের তৃপ্তি আসে এমনি পরিবেশের প্রয়োজন অনেকখানি। এছাড়া বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা

এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যা কোনো প্রকারে স্বাস্থ্যবিধির পরিপন্থী না হয়ে পড়ে। অনেক বিদ্যালয়েই দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্যে সময়-পত্রিকায় বিশেষ কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয় না। অনেকে ব'লে থাকেন যে, পাঠ্যক্রমের বোঝা আজকাল এত ভারী হয়ে উঠেছে যাতে একটা সুসমঞ্জস সময়-পত্রিকা প্রণয়ন করা প্রায় অসম্ভব। এই মন্তব্য খুবই নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নেই, তবু শিক্ষায় স্বাস্থ্যের স্থান যে অনেকখানি একথা ভুললে চলবে না। "শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্মসাধনম্", অর্থাৎ শরীরই সব ধর্মসাধনের মূলে।

পরীক্ষা-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে, বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের দিকে উদাসীন। অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ ও ঘন ঘন পরীক্ষার তাগিদ শিক্ষার্থীদের আয়ু হরণ করে। তাই নিয়মিত পাঠনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে পরীক্ষার বিভীষিকা ক্রমশ দূরে যায় ও মনের উপর কম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

একজন শিক্ষার্থীর ভাবীজীবনের প্রস্তুতি করিয়ে দেবার দায়িত্ব মূলত বিদ্যালয়ের। তাই বিদ্যালয়ে তার চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, সবদিক দিয়ে যাতে সুষ্ঠু ও শোভন হতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এমন কি বসা, দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের যাতে উন্নতি ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের ছোট বয়স থেকেই অনেকক্ষেত্রে খারাপ অভ্যাস হয়ে যায়। তারা সোজা হয়ে বসতে পারে না, দাঁড়াতে ও চলতে শেখে না, ফলে একটা সুষ্ঠু দেহভঙ্গি গ'ড়ে ওঠে না। সময়ে সাবধান না হলে এইসব অভ্যাস বরাবরই থেকে যাবার সম্ভাবনা।

স্বাস্থ্য-উন্নয়ন কার্যক্রম

ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া অভ্যাসসাপেক্ষ। অস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য-হীনতা থেকে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করাটাই বড় কথা নয়। যাতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, বিদ্যালয়কে সেদিকেও অবহিত হতে হবে। কিভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির কার্যক্রম অবলম্বন করা যায় তা আলোচনাসাপেক্ষ।

প্রথমত, স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মানবদেহের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে স্বাস্থ্যবিধি পালনের কার্যকারণ সূত্রটি আবিষ্কার করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যবান শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবার জন্যে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে শিবির (Camp) করলে ভালো হয়। এইজাতীয় ক্যাম্প-জীবনে শিক্ষার্থীরা খুবই আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া গোষ্ঠীজীবনের মাধ্যমে ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তৃতীয়ত, প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নিয়মিতভাবে খেলাধুলো, ব্যায়াম প্রভৃতি শরীর চর্চার দিকে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য-উপদেষ্টার কার্যক্রম প্রণয়ন করা দরকার। বিদ্যালয়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং সেজন্যে নিয়তই তাঁকে নতুন নতুন পরিকল্পনা অবলম্বন করতে হবে।

এছাড়া বিদ্যালয়েই যাতে ভালো জলযোগের ব্যবস্থা হয়, বা সম্ভবস্থলে দ্বিপ্রাহরিক খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, সেদিকে কেবল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নয়, রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য রাখতে হবে।

অস্বাস্থ্য-প্রতিরোধ কার্যক্রম

খেলাধুলো ও দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের মধ্যে ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কেটে যাওয়া, মচ্‌কে যাওয়া ইত্যাদি বহু দুর্ঘটনা শিক্ষার্থীদের জীবনে নিত্যকার ঘটনা। এছাড়া বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী হঠাৎ কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কি কি প্রতিবিধান করা যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন। যদি কোনো কারণে শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে অবিলম্বে সুস্থ করবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। এই জন্যে বিদ্যালয়ে "ক্লিনিক" খোলা ও প্রাথমিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন। আবার বহুদিনের অসুস্থতার পর যখন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসে যোগ দেয় তখন তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে এইসব শিক্ষার্থীদের জন্য বিধিব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র হওয়া দরকার একথা অস্বীকার করা যায় না।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও একটি বিশেষ দিক। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করানো একান্ত আবশ্যিক। তবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মধ্যেই কার্যধারা আবদ্ধ রাখলে চলবে না, কিভাবে তার উন্নয়ন ঘটানো যায় সে সম্পর্কেও যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা নিয়মিত নয়। অত্যন্ত অসন্তোষজনকভাবে দায়সারা কাজ হিসেবে তা করা হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন অনেক রোগ দেখা যায় যা একটু চেষ্টা করলেই সারানো যায়। যেমন, দাঁতের রোগ, দৃষ্টিক্ষীণতা, বধিরতা, চর্ম-রোগ ও দুর্বলতা। এই রোগগুলি যদি শুরুতেই ধরা পড়ে তাহলে তার প্রতিকার করা আদৌ কঠিন নয়।

অনেক সময় অভিভাবকদের অজ্ঞতার জন্যে ছেলেমেয়েদের অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তাই অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করা ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ ক'রে দেওয়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একান্ত কর্তব্য। কারণ আজ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় প্রবর্তিত হয়েছে যা আয়ত্ত করতে হলে বলিষ্ঠ দেহ ও দৃঢ় মনের বিশেষ প্রয়োজন। আজকের যারা শিক্ষার্থী আগামী দিনের তারা নাগরিক। শক্তিমান্ স্বাস্থ্যবান্ নাগরিক তৈরি করাও তাই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। ক্রমশ পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে যে কারণে বেড়ে চলেছে তার মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা অন্যতম। শক্তি, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা—সব কিছুই স্বাস্থ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। এইজন্যে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ বললেও ভুল হয় না। খেলাধুলোর জন্যে উপযুক্ত সরঞ্জাম, পরিবেশ ও ব্যবস্থা রাখার দরকার। এছাড়া স্বাস্থ্য-পরিদর্শককে কেবল বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না, প্রয়োজন হলে তাঁকে শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়েও খবরাখবর নিতে হবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারায় বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের কাজ চলবে :

(১) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা ;

(২) যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন সেগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার যথোচিত ব্যবস্থা করা ;

(৩) শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক প্রেরিত কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা ;

(৪) কোনো সংক্রামক রোগগ্রস্ত বা অপরিচ্ছন্ন বা অসুস্থ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে আসতে না দেওয়া ;

(৫) পরিবেশে কোনোরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা গেলে বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া ;

(৬) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার মৌল বিধানগুলি পালিত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং পালিত না হলে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা ;

(৭) বিদ্যালয়ে জলখাবার, পানীয় বস্তু ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা ক'রে দেখা ;

(৮) বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা, পাঠ্যসূচী, পাঠকাল সমস্ত কিছু শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বাস্থ্যানুমোদিত কি না তা লক্ষ্য রাখা এবং তা না হলে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রাত্যহিক বিদ্যালয়-জীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য-পরীক্ষা দুভাবে করতে পারলে ভালো হয় :

(১) বিদ্যালয়ে সাময়িক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ;

(২) প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা।

সাময়িক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসক দুই তিন মাস অন্তর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। দেহে কোনো রোগের সম্ভাবনা বা স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধানের দিকে তৎপরতা অবলম্বন করাই এর উদ্দেশ্য।

প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ভার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে থাকলেই ভালো হয়। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখাই এর উদ্দেশ্য।

বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা (School Clinic)

আগেই বলেছি যে, কেবল স্বাস্থ্যহানির কারণ আবিষ্কার করাই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা

না করলে শুধু কারণ জেনে লাভ কি? এই দায়িত্ববোধ থেকে বিদ্যালয়ের আরোগ্যশালার প্রবর্তন হয়েছে। প্রতিটি উন্নত দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ক্লিনিক রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা এখনও স্বপ্ন। তবে শহরাঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয়ের জন্যে একটি ক'রে ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। শিক্ষক ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের নিয়ে বিদ্যালয়ে পরিচালনা-সমিতি গঠন করা যেতে পারে। অবশ্য এজন্যে সরকারী ও সাধারণের সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতেও একটি ক'রে Psychological Clinic প্রতিষ্ঠিত করলে অন্তত মানসিক বৈক্লব্যের আংশিক প্রতিকার হতে পারে। কারণ দৈহিক ব্যাধি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক বিকার ও বৈক্লব্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গোড়াতেই এর প্রতিকার না হলে সমাজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের যে সূচনা হবে তা ভবিষ্যতে বিশেষ ক্ষতিকর হবে।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা বলাই বাহুল্য। কথায় আছে, "Cleanliness is next to godliness" অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাই মানুষের পবিত্রতা আনে। কেবল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রুচি, সৌন্দর্যবোধ, কমনীয়তা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির একে একে উন্মেষ হয় সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাধ্যমে। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ক'রে রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রতিদিন প্রতি শ্রেণীতে পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা খুঁজতে হবে। এই অভিযান হবে দ্বিমুখী: (ক) পরিবেশগত, (খ) ব্যক্তিগত।

পরিবেশগত অভিযানের মধ্যে কয়েকটি কার্যক্রম রাখা চলে। বিশেষ ক'রে কোথাও কোনো কাগজের টুকরো, শালপাতা ইত্যাদি ফেলার জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে। বিদ্যালয়ে জল রাখার ঘর, শৌচাগার খুব পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। তাছাড়া আসবাবপত্র যাতে অক্ষত থাকে সেদিকে শিক্ষকদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। কোনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র শ্রেণীতে রাখলে একটা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এজন্যে এমন

একটি বিশেষ ঘর রাখা দরকার যেখানে বিদ্যালয়ের যত ভাঙাচোরা আসবাবপত্র রাখা যায়।

বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিবেশকে সমৃদ্ধ করা ছাড়াও শ্রেণীপরিবেশ সুন্দর রাখা দরকার। ঘরে ঘরে নানাজাতীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চিত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলে পরিবেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্থানীয় দ্রব্যের ছোট ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সাধারণ পরিবেশকে বাদ দিলে যে সংকীর্ণ পরিবেশ বাকী থাকে, তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে শ্রেণীতে আসে তবে সমগ্র শ্রেণীর শোভাবর্ধন হয়। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার।

আট

মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্যা

যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক সুস্থতা বা মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত অপরিহার্য। সচেতন অনুভূতিকে নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ গ'ড়ে ওঠে না, অবচেতন মনের প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল। রুদ্ধ কামনা ও অনুভূতি চেতন-মানসে মুক্তি না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে। তাই বিস্মৃতির অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকে আমাদের মনের অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা ও কামনা। মনের গহনে তারা ডাক দিতে থাকে, শাসন ও অনুশাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প নিয়ে। শেষে এইরকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যখন প্রবল রূপ নেয়, তখন তাদের সুসংহত করা সম্ভব হয় না। তখনি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়; নানা উত্তেজনার ফলে দেখা দেয় "হিষ্টিরিয়া" প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব—ফ্রয়েডের মতে, যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি সবরকম মানসিক বিকারের মূল কারণ। তাই মানুষের সামাজিক বুদ্ধি যদি আদিম প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তবে নানা জটিল ও বিকার-গ্রন্থির সৃষ্টি হয়। এই জট খুলতে না পারলে রোগ সারানো কঠিন হয়। সম্মোহন পদ্ধতিকে ফ্রয়েড স্বীকার করলেও, তিনি বুঝেছিলেন যে এর মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। তাই সে পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন, তা হ'ল রোগীর মনের সবকিছু খবর নিয়ে তাকে আরাম দেবার চেষ্টা। তাই পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে রোগীর মনের খবর জানবার জন্য যা তুচ্ছ বা অশ্লীল তা-ও তাকে দিয়েই প্রকাশ করাতে হয়। অনেকক্ষেত্রে পরিচিত-জনের কাছেও তার খবর কিছুটা জানা যায়।

নানারূপ সমস্যা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফলে, নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু এদের মূলে প্রধানত কামভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিশু অনেক সময় আপনাকেই বেশি ভালোবাসে ও আপনার দেহকে নিয়েই নিজের কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্রেমেই সে

মাতোয়ারা। তাই খেলাধুলো সবকিছু তার নিজেকে নিয়েই। এই স্তরে আত্মরতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।

কৈশোর থেকে যৌবনের উদ্গম হবার সঙ্গে সঙ্গে সমলিঙ্গ কাম দেখা দেয়। এই সময় তাই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সে নিজেরই লিঙ্গের প্রতি বিশেষ সজাগ হয়।

ফ্রয়েডের মতে, শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই যত সমস্যার সূচনা। আজ যেসব বিকার দেখা দিচ্ছে, তার মূল কারণ হ'ল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বা সহজাত প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছনীয় নির্দিষ্ট মানসিক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা। ফলে, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। কেবল এইসব মানসিক বিকারই নয়, বুদ্ধিহীনতা বা বৈক্লব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে মানসিক দুর্বলতা ও চিত্তবিক্ষোভ।

অনেক সময় আবেগ, উদ্দাম ও উচ্ছ্বাস শিক্ষার্থীর মনকে বিকৃত ক'রে তোলে। কোনো অঙ্গবিকার, যেমন তোতলামি, বাঁ হাতে কাজ করবার প্রবণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মুক্তির আস্বাদ পায়। তখন সে রূঢ় বাস্তবের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে কল্পনার আশ্রয় নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার জন্ম। এই বাস্তব থেকে পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী। কখনও কোনো কিছু খারাপ জেনেও সে তাকে স্বীকার না ক'রে পারে না। কখনও আবার কাজটির সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায় ও নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে। কখনও বা সে আত্মসমর্পণ করে, আবার কখনও নিজের দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে বলে, projection, rationalisation ও defence mechanism।

শিক্ষকের কাজ—শিশুর সমস্যার সমাধান খুঁজতে হলে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সংবাদ নেওয়া, তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে জয় ক'রে নিয়ে তার মনের খবর জেনে সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা, তার রুদ্ধ কামনার যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া ও সুশিক্ষার সাহায্যে তার স্বাভাবিক মনকে ফিরিয়ে আনা।

পিছিয়ে-পড়া শিশু—অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই পিছিয়ে-পড়া শিশু এক বিরাট সমস্যা। কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা সমাজে, কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা অন্য কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে।

এই পিছিয়ে-পড়া নানারকমের হতে পারে, আর এর কারণও একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ আর তার কারণও বিভিন্ন।

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, কেউ স্থৈর্যহীন। কেউ সাহসী, কেউ ভীরু। কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন। শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই পিছিয়ে-পড়া শিশু সংখ্যা অনুপাতে কিছু কম হলেও এদের নিয়ে সমস্যা প্রবল।

সাধারণত যেসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে নিচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়—

(ক) মনোনিবেশের দৈন্য ;

(খ) কোনো বিশেষ অবস্থায় ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব ;

(গ) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ শক্তি ;

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার অক্ষমতা ;

(ঙ) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতার অভাব ;

(চ) নতুন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি ;

(ছ) কোনো কিছু শিখতে অসম্ভব দেরি করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া।

শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলেও বোঝা যায়, শিশু কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখা যায় যে, কোনো শিশু সব বিষয়েই পিছিয়ে পড়েছে তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন :

কিন্তু এছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কি কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নানাকারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ঃ

(১) বুদ্ধিহীনতা ;

(২) বিষয়ানুরাগের অভাব ;

(৩) কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব—যথা, অধ্যবসায়-হীনতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ;

(৪) বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি ;

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈক্লব্য।

কোনো সমাধান খুঁজবার আগে মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতিকার করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, কোনো জন্মগত বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈক্লব্য এর জন্যে দায়ী, তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। সুখের বিষয়, পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম।

পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে, এর জন্যে পিতা-মাতা-অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা, প্রথম ভর্তির সময়ে, তাঁদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না ক'রেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি করবার জন্যে উপরোধ ও অনুরোধ করেন। ফলে, ক্রমশ ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও শিশু পিছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য শিশুর যোগ্যতা বুঝে তাকে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করা। বাৎসরিক পরীক্ষান্তে অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অনুরোধে উঁচু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতে হয় ; এতে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ প্রতিকূল পরিবেশ। চারদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে ওঠে। ফলে, শিক্ষার্থীর পাঠানুরাগ ক্রমশই ক'মে আসে। সমাজে উজ্জ্বল আদর্শের অভাবও এই বিক্ষেপের অন্যতম কারণ।

কিভাবে এর সমাধান হতে পারে? অভিভাবক বা পিতামাতার কর্তব্য —বাড়িতে শিশু যাতে আদর-যত্ন পায়, তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আবেগ-উচ্ছ্বাস, কৌতুক-কৌতূহলকে মর্যাদা না দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যদি আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া হয় ও তার কৌতূহলী মনকে দমিয়ে

দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বা অন্য কোনো বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়া-পাওয়া ও আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। শিশু কোন কাজ করতে ভালোবাসে, কোনদিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোনো কাজে সে লেগে থাকতে পারে কি না—এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুযায়ী উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া দরকার। শিশুর সামনে সবসময়ে একটি উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে হবে এবং তার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয়ত, শিশুকে ছোট ব'লে অসম্মান করলে চলবে না। তার ব্যক্তিত্বের যোগ্য সম্মান দিতে হবে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হ'ল তাকে কাজে উৎসাহ দেওয়া ও নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া। শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র ক'রে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার মূল কারণ হ'ল তাদের প্রতি অভিভাবকদের উপেক্ষা।

শিশু-কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হ'ল পিতামাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য। সে অভাব যে-কোনো ভাবেই পূরণ করা দরকার। যদি অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনও খর্ব হতে পারে না। বাড়িতে অনুকূল পরিবেশে শিশু প্রসন্ন মনে পড়াশুনা করতে পারলে তার পাঠের প্রতি অনুরাগ বেড়ে উঠবে। পাঠের বিষয়বস্তুকে গল্প, খেলা ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস ক'রে তুলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য

(ক) শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি করা ও শ্রেণীতে ওঠবার সময় যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা অন্যতম কর্তব্য।

(খ) যারা তা সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা ও কারণ নির্ধারণ করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে অভীক্ষার প্রয়োজন।

(গ) যে যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ

যত্ন নেওয়া এবং বিষয়ভেদে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া।

এইসব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হবে। এইসব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে।

শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি, স্থবিধা-অস্থবিধা ও উন্নতির সম্পর্কে পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করে।

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হলে অভীক্ষার প্রয়োজন।

তাছাড়া কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের কোন অংশে দুর্বল তা জানতে হলেও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অভীক্ষার (Diagnostic Test) প্রয়োজন। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে দুর্বল হয়, তবে তার দুর্বলতা কি কি কারণে হতে পারে তা এই অভীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায়। দেখা যায় যে, কারও হয়তো বর্ণাশুদ্ধি বেশি হয় বলেই ইংরাজীতে দুর্বলতা, কারও বা বাক্যবিন্যাসে অক্ষমতার জন্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না।

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় থেকে পলায়ন

গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যখন শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তবিকৃতি দেখা দেয়। ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক। এই চিত্তবিকৃতি বা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় থেকে পলায়নের প্রেরণা জোগায়।

বিদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধানত এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী :

(১) **পরিবেশ**—পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও আঞ্চলিক প্রভাব। যখন এই পরিবেশ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ অভ্যাস ক্রমশ শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে।

(২) **মানসিক সংঘাত**—বিভিন্নমুখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাসনা প্রাধান্যলাভ করে এবং তা চরিতার্থ না হওয়ায় শিক্ষার্থীর মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

(৩) **অসংহত ব্যক্তিত্ব**—শিক্ষার্থী তার নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ না পেয়ে ক্রমশই মনের সন্তুষ্টি ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। এ থেকেই নানারকম দুর্মতি তার মনে বাসা বাঁধে এবং সেগুলির বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিতে সচেষ্ট হয়।

(৪) **বয়ঃসন্ধিজনিত আকাশ-কুসুম কল্পনা**—বয়ঃসন্ধিক্ষণ শিক্ষার্থীর জীবনের এক ভয়ঙ্কর সময়। এই সময়ে তার মনে নানা অবান্তর ও নিষেধাত্মক চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে। সে নিজেকে ঠিকভাবে কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্য কোনো কারণে অন্যায় কাজ ক'রে থাকে।

(৫) **নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা**—শিক্ষার্থী অনেক সময় নিজেকে অপরের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে। এই কারণে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন এবং অপরাপর হীনপ্রবৃত্তি তার মনে জাগে।

(৬) **বাড়ী বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি**—কারণে-অকারণে শিক্ষার্থীর মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয় তাহলে তার মনে এরূপ দুরভি-সন্ধি জাগতে পারে।

(৭) **বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব**—বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর যদি প্রবল আকর্ষণ না থাকে তা হলে স্বভাবতই তার মনে হবে কিভাবে বা কখন সে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে।

(৮) **বাইরের আকর্ষণ**—সিনেমা, খেলাধুলো ইত্যাদি বাইরের অধিকতর প্রবল আকর্ষণও অনেক সময় শিক্ষার্থীকে এরূপ কার্যে প্ররোচিত করে।

(৯) **সময়-সূচীর ত্রুটি**—একঘেয়ে আনন্দহীন সময়-সূচীও শিক্ষার্থীকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে, যার ফলে বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত কিছুই তার কাছে বিসদৃশ ও প্রাণহীন মনে হয়।

সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :

১। বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে হবে।

(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হবে ;

(খ) শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে তার জীবনপথে উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে হবে ;

(গ) বিদ্যালয়ে সমগোষ্ঠী গঠন ক'রে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দান করতে হবে।

২। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধানের প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

৩। বিদ্যালয়-জীবনেই নীতিশিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ হওয়া সম্ভব। প্রার্থনা-সভা, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৪। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। সমাজের গঠনপ্রণালী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়েই কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীর জীবনে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মিথ্যা কথা বলা

চিত্তবিকৃতির আর একটি বহিঃপ্রকাশ মিথ্যা কথা বলা। জেনে বা না জেনে সত্যকে এড়িয়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা। সাধারণত দুই প্রকারের মিথ্যা কথা বলা দেখা যায়—

(ক) সাময়িক ভাবে মিথ্যা কথা বলা ; (খ) অভ্যাসবশে মিথ্যা কথা বলা।

সাময়িকভাবে মিথ্যা কথা বলা চেষ্টা করলে শোধরানো যায়, কিন্তু যখন কারণে বা অকারণে মিথ্যা কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন শিক্ষকদের হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু থাকে না।

শিক্ষার্থীর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি নিম্নরূপ :

(১) পারিবারিক সমস্যা শিক্ষার্থীর জীবনে জড়িত হয়ে পড়ে। বিকৃত পরিবেশ থেকে কোনোরূপ সুশিক্ষাই সে লাভ করতে পারে না। ফলে, তার চিন্তাধারা উল্টো পথেই ধাবিত হয়।

(২) অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ মনঃপূত হয় না ব'লে শিক্ষার্থীর মনে ধিক্কার আসে এবং সে বিকৃত রুচির আশ্রয় নেয়।

(৩) মনের তীব্র বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরেও শিক্ষার্থীর মনে অস্বাভাবিকতা আসে এবং এই থেকেই নানারূপ কদর্য অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

(৪) অনেক সময় ভালোমন্দ বিচারশক্তির অভাবেও শিক্ষার্থী মিথ্যা কথা বলে।

(৫) কোনো কোনো শিক্ষার্থী কৌতুক সৃষ্টি ক'রে আনন্দ বা বাহবা পাবার প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়।

(৬) নিজের দুর্বলতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও শিক্ষার্থী মিথ্যা কথা বলে।

(৭) লজ্জা, ভীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে মিথ্যাভাষণে প্ররোচনা দেয়।

এর প্রতিকারের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

১। শিক্ষক ও অভিভাবকের সহানুভূতিমূলক ব্যবহার তাকে অনেকটা সৎপথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত রাখলে তার কার্যধারা ও চিন্তাধারারও পরিবর্তন সম্ভবপর।

বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ—শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি—(১) বাহ্যিক, (২) আত্মিক (স্বতঃস্ফূর্ত)। বর্তমানে আত্মিক শৃঙ্খলাবোধের উপরই বেশি রকম জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ বাহ্যিক শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে। বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একগুঁয়েমি, এবং এ থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল।

শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নানা কারণে—(১) সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব—কদর্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর রুচির অবনতি ঘটতে বেশি সময় লাগে

না। দিনের পর দিন সে একে একে স্বাভাবিকতা থেকে দূরে চলে যায় এবং কদর্য আকাঙ্ক্ষায় তার মন ভ'রে যায়।

(২) বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি—পরিবর্তনশীল জগতের জটিলতা ও সমস্যা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে। এই সব জটিলতা ও সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটে।

(৩) গৃহ—পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান পরিবেশ বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়।

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিদ্যালয়-পরিবেশ শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খল স্বভাবের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তার চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও অপ্রীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

(৫) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি আংশিকভাবে এর জন্য দায়া। সমাজে ক্রমশ ধর্মানুষ্ঠান ক্ষীয়মাণ হওয়ায় নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে।

(৬) বিশৃঙ্খল পরিবারে থেকে শিক্ষার্থী তিলে তিলে বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে এবং বিদ্যালয়-জীবনেও তার প্রকাশ ঘটে।

(৭) বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্যে তাদের মনে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব আসে।

(৮) শিক্ষার্থী-সংখ্যার আধিক্যবশত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই কারণে অবহেলিত শিক্ষার্থী অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(৯) বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা যায়। পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার দিকেই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশি থাকে না।

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে তাহ'লে তখন শিশু পাঠে না পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক। তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল্যকে এর জন্য কিছুটা দায়ী করা যায়। শিক্ষার্থী জানে শিক্ষালাভ ক'রেও তাকে হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে। ফলে সে পাঠে আগ্রহ দেখায় না বা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। সুস্থ পরিবেশে শিক্ষার্থী দেহে ও মনে স্বভাবতই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাস বর্জন করে।

(২) বিদ্যালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় ক'রে তুলতে হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে হবে।

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে সহজে গ্রহণ করতে পারবে এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যসূচীর মধ্যে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।

বৃটেনের শিক্ষা-সংস্থার অধীনস্থ ক্লিনিকে মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে কাজ করার সময়ে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থের লেখক আহরণ করেছেন তা থেকে এমনি ক্লিনিকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা তাঁর সুস্পষ্ট হয়েছে। কিভাবে এই সব ক্লিনিক শিক্ষার্থীদের মানসিক ব্যাধির আরোগ্য সাধন করে, অন্যত্র তা আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

পর্যায় ৪

সমস্যা

নয়

শিক্ষার বর্তমান ভাবধারা

শিক্ষার ভাবধারা যুগে যুগে বিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রবাহের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষায় গণতন্ত্র এদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া শিক্ষায় গতিবাদ বা প্রয়োগবাদ, শিক্ষায় নির্দেশ, প্রভৃতি চিন্তাধারাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের উদ্ভব রাজনীতি থেকে। যখন সাধারণের জন্যে, সাধারণকে নিয়ে ও সাধারণের দ্বারা কোনো শাসন চলে তখনই বলা হয় গণতন্ত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। মানবের সমান অধিকার ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব গণতন্ত্রের। আজ বিশ্বমৈত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই উদারনৈতিক শিক্ষা, চাই মুক্তির আস্বাদ। গণতন্ত্র আজ সেই বরাভয় বহন ক'রে এনেছে।

শিক্ষার্থীরও ঘটেছে কারামুক্তি। আজ তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরেছে শিক্ষাব্রতীদের। শিক্ষার্থী আজ শিক্ষাজগতের কেন্দ্রবিন্দু; তাকে ঘিরেই সমস্ত আয়োজন। তাই তার রুচি, প্রবণতা, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। লক্ষ্যগুলি হ'ল ঃ

(ক) ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা ;

(খ) সকলকে সমান সুযোগ দান ;

(গ) শিক্ষায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ;

(ঘ) শিক্ষায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সৃজনশীলতা।

এইগুলি শিক্ষায় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এখন কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিফলন হয়েছে তা বিচার্য। প্রথমেই শিক্ষার্থীর কথা ধরা যাক। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আজ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষক আজ তার দরদী বন্ধু ও নির্দেশক। শিক্ষকের একমাত্র কাজ শিশু-কিশলয়কে পর্ণে পরিণত করা। বর্তমানে পাঠ্যসূচীকে শিশুর প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে

বৈচিত্র্যময় করা হয়েছে। আজ সবার্থসাধক বিদ্যালয়ের যে বিভিন্নমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হয়েছে, তা এই গণতন্ত্রেরই প্রভাব।

শিক্ষাপদ্ধতিও আজ নতুন রূপ নিয়েছে। কেবল শিক্ষকই আজ বক্তা নন। শিক্ষার্থীদের জন্যে আলোচনাচক্র, দলগত আলোচনা প্রভৃতি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। উয়েনেটকা পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রেরই অভিব্যক্তি।

পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপারেও আজ এক আমূল সংস্কার এসেছে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্য তথ্যপঞ্জীর প্রবর্তন আজ প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি ফিরিয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যানিকেতনের পরিবেশে একটা আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়েছে, সৃষ্টির তাগিদে মুখর ক'রে তোলার একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। চারদিকে প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, ব্যক্তিত্বের সহজ স্ফুরণ। জড়তার রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে গণতন্ত্র আজ শিক্ষার ধারাকে বিস্তৃত ও ব্যাপক করেছে।

একটা প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র কতদূর সম্ভব? চারদিকে এখনও বৈষম্য, মানুষে মানুষে ব্যবধান। মনে হয়, যতদিন আমাদের মন থেকে ভেদাভেদ-জ্ঞান দূর না হবে, ততদিন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখনও শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর খাড়া রয়েছে। গণতান্ত্রিক বাহ্যিক রূপ প্রকট হলেও অন্তর থেকে তার প্রকাশ এখনো পূর্ণ হয়নি।

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ ও গতিবাদ আধুনিক ভাবধারার মধ্যে অন্যতম। এই মতবাদের প্রভাব শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছে। মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা আজ যেমন শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক ক'রে তুলেছে, তেমনি সমাজকেন্দ্রিকতাও এই ক্ষেত্রে একটা প্রগতি এনে দিয়েছে। আজ তাই শিক্ষার মূল্যায়ন তার কার্যকারিতার উপর নির্ভর ক'রে নির্ধারিত হচ্ছে।

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

এই মতবাদের জন্ম আমেরিকার মাটিতে। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগৎ আজ একে স্বাগত জানিয়েছে। স্বীকার ক'রে নিয়েছে এই মতবাদের মূল সুরটিকে। একদিকে প্রকৃতিবাদ ও অন্যদিকে আদর্শবাদ—এই

দুইএর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োগবাদের জন্ম। প্রকৃতিবাদে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর আদর্শবাদে একটা ভাবমূলক পরম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই দুইএর মধ্যে একটা ভাবসংগতি আনবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে প্রয়োগবাদের মধ্যে। প্রয়োগবাদী ডিউই-এর মতে শিক্ষা জীবনের সহগামী—তাই তা একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এর কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এর মূল সূত্র হ'ল—"To follow knowledge like a sinking star"। এক কথায় বলতে হয়, শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী। দুইএর মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনের অভিজ্ঞতাই শিক্ষার পরম উপাদান। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা জীবনে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। তাই বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের জন্ম। আজকের অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই আগামী কালের লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। যা কার্যকরী হয়, যা আমাদের বাস্তবের মুখোমুখী করতে পারে, তা-ই সত্য। কোনো নির্দিষ্ট সত্য বা লক্ষ্য নেই; জীবনের আপাতলক্ষ্যের সোপান বেয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগবাদের বিশেষ অবদান। একটি আশাবাদী মন যেন বার বার উঁকি দিচ্ছে—আর মানুষকে চলার পথে বরাভয় এনে দিচ্ছে। সত্যের এই মূল্যায়ন প্রয়োগবাদের মূলকথা।

শিক্ষার লক্ষ্য যদি অনির্দিষ্ট থাকে, তবে শিক্ষা কি কেবল জীবনের স্রোতে দুলতে থাকবে? উত্তর হ'ল, দুলতে থাকলেও তার একটা গতি থাকবে,—তা না হলে সে শিক্ষা প্রগতিশীল হতে পারবে না।

অবশ্য আজও এই মতবাদের সবটুকুই সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদল একে জড়বাদীর স্বপ্নবিলাস ব'লে মনে করেছেন। শিক্ষা যেন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যেন মানবসত্তা এখানে কেঁদে ফিরছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? বরং মানুষের উপর আস্থা ও বন্ধনমুক্তির সংকল্প শিক্ষার প্রয়োগবাদকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। তাই ডিউই-র এই বলিষ্ঠ ভাবধারা যেন 'sparkling dew-drops'-এর রূপ নিয়েছে। অবশ্য এতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে অনেক বিভ্রাট ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যায়, কখনো ব্যক্তি কখনও বা সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ দুই-এর সংঘাতের ফলে শিক্ষায় গণতন্ত্রের জন্ম।

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ

ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমাজ, সংসার, পরিবেশ সবকিছুকে ছাপিয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য। মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে ক্রমপরিণতির পথে নিয়ে যাওয়াই হবে সকলের লক্ষ্য। ব্যক্তিই সমাজের প্রাণকেন্দ্র ; ব্যক্তি-মানসের প্রতিচ্ছবিই হল সমাজ। তাই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করবার অধিকার সমাজের নেই। সমাজকে ব্যক্তির বিকাশের পথে সহায়তা করতে হবে। সমাজের অগ্রগতির জন্য ব্যক্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের কেন্দ্র হ'ল ব্যক্তির চাহিদা। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে পরিবর্তন এসেছে, যে নানা অভীক্ষার প্রবর্তন হচ্ছে. তা ব্যক্তিকে আরও নিবিড়ভাবে জেনে তার বিকাশকে সহজ করার জন্যে। Diversified Courses, Cumulative Records ইত্যাদি সবকিছুই ব্যক্তিকে ঘিরে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে আর একটি মতবাদ জন্ম নিয়েছে। সেটি হ'ল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। সমাজই এখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে আহুতি দিতেও এই মতবাদ কুণ্ঠা বোধ করে না। তাই ব্যক্তিত্ব-চাহিদা সমাজ-কল্যাণের পরিপোষক না হলে তাকে বিসর্জন দেওয়াই এই মতবাদের মতে শ্রেয়ঃ। হেগেলের মতে, সমাজ একটি অতিব্যক্তিক সত্তা যার কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা ডুবে যাবে। অর্থাৎ সমাজদেহের এক একটি কোষ হ'ল ব্যক্তি—তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি আধুনিক ভাবধারার অন্যতম। আজ তাই শিক্ষায় সামাজিকতার কথা বারবার বলা হয়ে থাকে। ইংরাজীতে একে বলে Socialisation। এই শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল সামাজিক সভ্য সুস্থ সবল নাগরিক তৈরি করা। তাই শিক্ষার্থীর মধ্যে শৈশব থেকে ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক উপাদানের উন্মেষ সাধন করাই এর লক্ষ্য।

Group Dynamics

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীগঠনের ব্যাপারেও নানা পরিবর্তন এসেছে। Group Dynamics-এর প্রবর্তন আজ অপরিহার্য। নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করতে হলে এর প্রয়োজনকে স্বীকার করতেই হবে। শ্রেণীতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব উদ্ভূত হয়। এক ব্যক্তিত্ব আর এক ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। এমনিভাবে ব্যক্তিত্ব সামাজিক ও সুসংহত হয়ে ওঠে। দলগত কার্যকলাপ, গোষ্ঠী আলোচনা বা আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পার্থক্য ধরা পড়ে। ব্যক্তিসত্তাকে কিভাবে সমাজ-কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, কিভাবে তাকে সুসংহত করা যায়, এই হ'ল Group Dynamics-এর লক্ষ্য। প্রতিটি দলের মধ্যে যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও প্রতিক্রিয়ার স্রোত বইতে থাকে তাতে ব্যক্তিত্বের সংহতি ঘটে—এই হ'ল Group Dynamics-এর মূল কথা।

আজ আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করবার জন্যে শৈশব থেকেই শিক্ষার আয়োজন করা হচ্ছে। নানা দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন, শিক্ষক-বিনিময়, নানা দেশের সাহিত্য ও চিত্র পরিবেশন ও জাতিপুঞ্জের প্রবর্তিত প্রদর্শনী—এই উদার মনোভাবের পরিপোষক।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন ধারা

মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারে আজ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেখানে সাতটি ধারার প্রবর্তনে শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা পাচ্ছে। ধারাগুলি হ'ল—Humanities, Science, Technical, Commercial, Fine Arts, Agricultural ও Home Science। এর ফলে যে যার রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পুরাতন ও নূতন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা চলে। পরের পৃষ্ঠায় তা দেখানো হ'ল—

	পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা	নবপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা	
২ বৎসর	তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ প্রথম ডিগ্রী	প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ প্রথম ডিগ্রী	৩ বৎসর
২ বৎসর	প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ ইণ্টারমিডিয়েট		
২ বৎসর	নবম ও দশম শ্রেণী মাধ্যমিক	নবম হইতে একাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক	৩ বৎসর
	নিম্ন মাধ্যমিক ৫ বৎসর		
	প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বৎসর		

বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভ[illegible] হয়েছে। তবে এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তির সুযোগ-সুবিধার সামঞ্জস্য থাকা উচিত। তা না হলে বৃত্তিশিক্ষার সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হবে।

দশ

আমাদের সমাজ-সমস্যা ও শিক্ষা

সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। সমাজের গঠন মানুষকে কেন্দ্র ক'রে। শিক্ষার ধারা চলেছে মানব-কল্যাণকে সামনে রেখে। তাই শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় যোগ, আর সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে শিক্ষার নব নব আয়োজন।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু নানা সমস্যায় জাতীয় জীবন কণ্টকিত। ভারতের সমাজ ও সমাজ-সমস্যা বিরাট। এই ভারতে বিচিত্র মানুষের ধারা মিলিত হয়েছে। তারা সবাই মিলে গ'ড়ে তুলেছে সমাজ ও সংস্কৃতি; মেনে নিয়েছে একটি আদর্শ। তারপর কত ঝড় এল, কত বন্যা ও দুর্যোগ মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিল। তবুও মানুষ তার ঐতিহ্যকে ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি তার সামাজিকতাকে। কিন্তু আজ যেন সমাজের বুনিয়াদ কেঁপে উঠেছে। আর কেঁপে উঠেছে মানুষের মন অনিশ্চয়তার আশঙ্কায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেন যুগান্তরের সূচনা হয়েছে। তন্ত্রের বদলে যন্ত্র, কৃষ্টির বদলে সৃষ্টির আভিজাত্য দেখা দিয়েছে। বিগত দিনের সমাজের গড়ন, লোকাচার, ধর্ম সব কিছুই যেন লুপ্তপ্রায়। চারদিকে সমস্যার প্লাবন। আজ ভারতে বিভিন্ন আকার ও রূপ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ সমস্যারই মূলে আছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ। তবুও তাদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—(১) সামাজিক সমস্যা, (২) অর্থনৈতিক সমস্যা, (৩) মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, (৪) কৃষ্টিগত সমস্যা, ইত্যাদি।

সামাজিক সমস্যা—ভারতবর্ষে এতদিন সমাজের যে কাঠামো বিদ্যমান ছিল তার পুনর্বিন্যাসের দিন আসন্ন। পুরাতন বর্ণব্যবস্থা আজ ভগ্নপ্রায়। বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন করা দূরে থাক, যোগ্যতা ও রুচি-অনুযায়ী বৃত্তি পাওয়াই আজ ভাগ্যের কথা। এই কারণে দেশে জনশক্তির

অপচয় হতে বাধ্য। পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরাজয়ের ফলেই আজ ভারতীয় সমাজ-গঠনের মধ্যে সমবায় ও সহযোগিতার আদর্শ লুপ্তির পথে। যৌথ পরিবারের ভিত্তি আজ টলমল করছে। সমাজে ধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ। রাজনীতির প্রভাব সর্বব্যাপী। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিরাট সংকট-মুহূর্তের সম্মুখীন। কোনোমতে জীবন ধারণের জন্যে প্রাণান্ত তাদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে উচ্চ আদর্শের স্থান কোথায়! কোথায় মানবত্ব আর কোথায় বা নৈতিক উৎকর্ষ! পারিবারিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। গৃহবিবাদ, দাম্পত্যকলহ সমাজ-জীবনকে তিলে তিলে কলুষিত করছে। দলাদলি ও হানাহানিতে জাতীয় সংহতি খণ্ডিত। অলস জীবনে অভ্যস্ত অগণিত বেকার তরুণ লক্ষ্যহীন জীবন যাপন ক'রে চলেছে। সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শুভবুদ্ধি, নীতিবোধ যেন আচ্ছন্ন।

শিক্ষিত যুবকদের সামনে আজ সীমাহীন উদ্বেগ ও নৈরাশ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বরাভয়ের প্রতীক্ষায় তাদের দিন কাটে। ফলে, সমাজ ও দেশকে সেবা করবার অবকাশ তাদের ব্যাহত ও সংকীর্ণ। চারদিকে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা মানবিক সম্পদকে তিলে তিলে হরণ ক'রে নিচ্ছে। ধনীর নির্লজ্জ লোভ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্বকে বিড়ম্বিত ক'রে তুলেছে।

বাংলা মায়ের চোখে আজ অশ্রুর বন্যা। তার শস্য-শ্যামল রূপ আজ কবির স্বপ্ন। উদ্বাস্তু-সমস্যা, দেশবিভাগ আজ বাংলার সমাজকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সমাজের একদল লোক আজ নিঃসহায়, ভাগ্যহত। আজ তাদের সব পরিচয় ধুয়ে-মুছে গেছে। এদেরই ভেতরে আছে অগণিত তরুণ, কিশোর, শিশু নাগরিক। তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে প্রতিভা ও শক্তি।

সুখের কথা, পশ্চিম বঙ্গ সরকার আমাদের সমস্যাগুলির প্রতি সচেতন; তাই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা। কিন্তু সব পরিকল্পনাই যে যথাযথ রূপ পাবে এ আশা কম। কারণ কখনও সততা ও অভিজ্ঞতার অভাবে, আবার কখনও অবস্থার বৈগুণ্যে পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর হচ্ছে না।

অর্থনৈতিক সমস্যা—এককালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করত মূলত ভারতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপর। আজ বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্য জড়িত। এক একটি বিশ্বযুদ্ধ অর্থনৈতিক জীবনে ঘোরতর সমস্যা ডেকে এনেছে। ভারতেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। সাধারণের জীবনযাত্রা আজ কণ্টকিত। ঘরে ঘরে শুধু অভাব-অভিযোগ। ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শিক্ষা আজ যেন বিলাসিতা, কারণ মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই মানুষ উদ্ব্যস্ত। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল। ফলে মানুষের প্রবৃত্তি আজ নিম্নগামী। তাছাড়া দেশের অধিবাসী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান—কিন্তু সেই অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন নেই। খণ্ড-ছিন্ন ভূভাগ, কৃষি-ব্যবস্থার গতানুগতিকতা ও খণ্ড খণ্ড জমি বণ্টন উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। কৃষকদের দুরবস্থা ও অজ্ঞতা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে সুব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষীর দৃষ্টি পড়লে দেশের সমূহ বিপদ। তাই দেশের শিল্পপতিদের সহযোগিতা ও সংযত আচরণকে বাধ্যতামূলক করা বোধ হয় রাষ্ট্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা—সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে অনেক সময় মানসিক সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। বোঝাপড়ার অভাব, অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ দেশের সমস্যাকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছে। জীবনে আদর্শের অভাব ও বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য ও অসহিষ্ণুতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুপ্রভাব বিস্তার করছে। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু ক'রে বৃহত্তর সমাজের সবখানেই সংহতির অভাব। পিতা-পুত্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক-শিক্ষক, মালিক-শ্রমিক—সর্বত্রই মানসিক দ্বন্দ্ব। কেউ কারও আচরণে যেন তুষ্ট নয়। সবখানেই অশ্রদ্ধা ও অসহযোগ। সকলেরই অভিমান যেখানে-সেখানে ফেটে পড়তে চায়। আত্ম-তুষ্টি নেই ব'লেই সামান্য কারণে সংঘাত, গৃহবিবাদ ও পারিবারিক কলহ। তীব্র প্রাদেশিকতা ও ভাষার প্রশ্ন ভারতের ঐক্যকে খণ্ডিত করছে। এই সংকীর্ণতা দেশের অন্যতম সমস্যা।

কৃষ্টিগত সমস্যা—সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সমস্যা কম প্রকট নয়। জাতীয় কলা ও সাহিত্যের গতি এখন যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানেও আদর্শের অভাব লক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্য আজ পাঠকের বিকৃত রুচিকে প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু জাতিকে ঋদ্ধির পথে নিয়ে যাবার যে বিরাট দায়িত্ব, তাকে অস্বীকার ক'রে শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক যোগানোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। আজকাল সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যাপক হয়েছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে ক'খানি গ্রন্থ প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা পাবে! সংস্কৃতি মানুষের অগ্রগতির প্রধান মাপকাঠি। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জাতির ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম—সবকিছুই। আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে জাতির সংস্কৃতি যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। ধর্মকে আজ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। ফলে, সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য গিয়েছে শুকিয়ে। ধর্মের মধ্যে যে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থাকে তা থেকে মুক্তি পাবার আশায়, মানুষের অধিকারকে সাব্যস্ত করতে ভারত গণতন্ত্রকে মূলমন্ত্র ব'লে মেনে নিয়েছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের পথে আমরা আজ কতদূর অগ্রসর হয়েছি!

অন্যান্য সমস্যা—অন্যান্য সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা পল্লীকে কেন্দ্র ক'রে। পল্লীই ভারতের সম্পদ। কিন্তু তবু আজ শহরের দিকে দৃষ্টি দিলে পল্লীর অবস্থা বুঝতে দেরী হয় না। দিন দিন পল্লীর অধিবাসীরা শহরের দিকে পতঙ্গের মতো ধেয়ে চলেছে। একদিকে শহরের জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অন্যদিকে জনহীন পল্লী। বিভিন্ন সমাজ-সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্য শিক্ষার্থীর মনকে যেন শৈশব থেকে সংকুচিত ক'রে দিতে চায়। কি গৃহে, কি বৃহত্তর পরিবেশে—সবখানেই শিক্ষার্থীর প্রতি ঔদাসীন্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি এবং তার আশা ও সহানুভূতির প্রতি লক্ষ্য দেবার অবকাশ কোথায়! কোনোখানেই তারা সহানুভূতিপূর্ণ নির্দেশ পায় না। কি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, কি অন্যান্য বিদ্যালয়-পরিবেশে—আনন্দের সামগ্রী সর্বত্র দুর্লভ। স্নেহপূর্ণ নির্দেশের অভাবে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বাস ক'রেও তাদের ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হয় না ও তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয়।

আমাদের শিক্ষা-সমস্যা

শিক্ষাক্ষেত্রে চিরদিনই সমস্যা দেখা দিয়েছে, কারণ শিক্ষা হ'ল গতিশীল। বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত সে সমস্যার নিরসন হ'ল না। মানুষ পথ চলেছে,—জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার ধারাও বয়ে চলেছে। তবুও সে তাল রাখতে পারেনি ব্যক্তির ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে, জীবনের তাগিদের সঙ্গে। তাই বোধ হয় যুগে যুগে শিক্ষাকে পরিমার্জিত করতে হয়েছে।

যুগভেদে ভারতের শিক্ষা-সমস্যা

বৈদিক যুগে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই শিক্ষালাভে ধন্য হ'ত মুষ্টিমেয় লোক। সার্বজনীন প্রয়োজন মেটাবার ভার বৈদিক শিক্ষার ধারাকে সংকীর্ণ ক'রে রেখেছিল। তাই মানুষের অধিকারকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারেনি ব'লে একলব্যের মতো বহু অব্রাহ্মণকে অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে; বাণীর দাক্ষিণ্য লাভের আশায় শিক্ষার দেউলে এসে তাদের বারে বারে মাথা খুঁড়তে হয়েছে।

যুগান্তরের সূচনা করল নতুন ভাবধারা। আধ্যাত্মিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক দিককে উপেক্ষা করবার ফলে যে শিক্ষাধারার প্রবর্তন হ'ল, বৌদ্ধ শিক্ষা কুঠারাঘাত হানল তার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যাতে শিক্ষা পেতে পারে এইরূপ উদার মনোভাব দেখা দিল। ফলে, শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আনন্দের সূচনা হ'ল। গ'ড়ে উঠল নালন্দা, তক্ষশীলা। কালক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষাকেও নতি স্বীকার করতে হ'ল রাজনীতির কাছে। মুসলমান রাজত্বে নতুন ক'রে শিক্ষার পত্তন হ'ল। বৌদ্ধ শিক্ষার যে ত্রুটি তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আয়োজন শুরু হ'ল। শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি ফিরল। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার নীতি ও শিক্ষকের প্রাধান্য শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারেনি।

তারপর সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটল; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গেল পাল্‌টে। এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যুগান্তর এল। সাগর-পার থেকে যারা বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এসেছিল, তারা ধরল রাজদণ্ড। তারা রাজ্যচালনার

জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনল। নানা অফিসে-দপ্তরে কেরানি তৈরি করবার শিক্ষা শুরু হ'ল। এতে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অপূর্ণই রয়ে গেল। তাই নানা সমস্যা এসে ভিড় করল শিক্ষাক্ষেত্রে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা

আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল টুটেছে, স্বাধীন ভারতে নতুন শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এখনও বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসেনি। আজও আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রভাব অনেকখানি। আজ যে শিক্ষা-পরিকল্পনা শুরু হয়েছে তাকে যথার্থ রূপ দিতে গেলে স্থানীয় সমস্যাগুলোর কথা ভুললে চলবে না। সেই সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা নানা পর্যায়ে সমস্যার বিশ্লেষণ করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষাধারার যে আয়োজন করা হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। এর কারণ সুস্পষ্ট। সমাজ ও অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে শিক্ষার স্বতন্ত্র গতিপথ নেই। তাই সমাজে যখন ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ভিড় ক'রে থাকে, শিক্ষাক্ষেত্রে তখন সেইসব সমস্যার প্রতিফলন হবেই। আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে মানুষের দাবি স্বীকৃত হয়েছে। সে দাবি সকলের সমান অধিকারের দাবি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই বাঁচবার, শিক্ষালাভ করবার সমান সুযোগ পাবে—এই হ'ল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে ও রাষ্ট্রে সে লক্ষ্যের দিকে কতটা অগ্রগতি ঘটেছে তা ভাববার কথা। এখনও মানুষে মানুষে বিপুল ব্যবধান রয়ে গেছে। জাতিভেদ কিছুটা দূর হলেও শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর ক্রমশ মাথা উঁচু করছে। মানুষের চরিত্র, বিদ্যা-বুদ্ধির চেয়ে কাঞ্চনের কৌলিন্য সমাজে অধিকতর প্রকটরূপে দেখা দিচ্ছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য কি—এই নিয়ে অনেক তর্কের অবসর আছে, কিন্তু কোনোরূপ উচ্চ আদর্শ বা বৃহত্তর লক্ষ্য আজ স্বপ্নের কথা। কারণ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থকরী বিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

তাছাড়া জীবনের অনুভূতি, হৃদয়ের সম্পদ, চিত্তের উৎকর্ষ—এ সব কথা এখন নিতান্ত মামুলী হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে হানাহানি, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব এত বেড়ে চলেছে যে, প্রতি মুহূর্তে মানবত্বের অবমাননা ঘটেছে। বস্তুসর্বস্ব দৃষ্টি এই অনর্থের মূলে। জীবনকে খণ্ড-ছিন্ন ক'রে দেখলে সংকীর্ণতা আসবেই।

মানবপ্রীতি ও সহযোগিতা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলেও আজ তার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিভ্রম দেখা দিয়েছে। শিক্ষকরা অনেকেই জানেন না শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা শিক্ষার্থীকে কি দিতে চান। তাই প্রথমেই শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। আর সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হ'লে যে অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে হবে। শৈশব থেকেই জীবনের শিক্ষা শুরু। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই স্তরেই শিক্ষার বীজ বুনতে হবে।

আজকের শিক্ষার দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা পরিবর্তনের ঢেউ। চারদিকে যেন একটা বিপ্লব দেখা দিয়েছে। প্রাচীন শিক্ষার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। শিক্ষাজগতে এই যে ভাঙাগড়া চলেছে তার মূলে আছে মানুষের গতিশীল মন। যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা তাই লক্ষ্য করবার মতো।

বহুদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল আজ টুটেছে। কিন্তু সমস্যার যেন শেষ নেই। যেন নতুন ক'রে আমরা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে পড়েছি। আগে যে সমস্যা ছিল না তা নয়—তবে তা মেটাবার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এটা কম আনন্দের কথা নয় যে, আজ আমাদের চেতনা এসেছে শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে। সমাধানের পক্ষে এ বোধ হয় প্রথম ধাপ।

এ কথা ঠিক যে, পরিবর্তনের প্লাবন কিছুটা বিহ্বলতা জাগাবেই। এতে হতাশ হবার কিছু নেই। আজ আমরা বুঝতে চাইছি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কি? মানুষ গড়া, না তথ্য পরিবেশন করা? মনের কোণে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করে। সত্যিই শিক্ষার উদ্দেশ্যের পথে আমরা কতখানি পা বাড়িয়েছি?

একটা কথা মানতেই হবে যে, আমরা আজও আমাদের দেশের এবং

জাতির সত্যিকারের প্রয়োজন বুঝতে শিখিনি। বিদেশী শিক্ষার যেটুকু ভালো ও ফলপ্রসূ তাকে গ্রহণ করতে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। তবে বিলিতি ছাঁচে শিক্ষাকে ঢাললেই আমাদের দায়িত্ব-মুক্তি ঘটবে না। আবার অকারণ দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস আমাদের যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য-বোধকে যেন খণ্ডিত না করে।

আজকাল একটা রেওয়াজ হয়েছে—যা কিছু হচ্ছে তাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা। সমালোচনার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, তবে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে তা যেন সৃষ্টির প্রসারকে রুদ্ধ ক'রে না দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ নানা গবেষণা চলেছে। হয়তো এগুলি যথেষ্ট নয়—আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে সেগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক ক'রে তুলতে হবে। তবেই তার সার্থকতা আসবে।

প্রাথমিক শিক্ষা—শিক্ষার স্তর-বিন্যাসের দিকে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। শৈশব থেকে শুরু ক'রে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত শিক্ষার যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বর্তমানে প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে। শৈশবই জীবনের স্বর্ণযুগ ; সারা জীবনের ভিত্তি স্থাপনের আয়োজন এই শৈশবে। দুঃখের কথা এই যে, আমাদের শৈশবের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে এখনও ঔদাসীন্য রয়ে গেছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরে যে দৈন্য ও ত্রুটি রয়ে গেছে তার পরিণতি ভয়াবহ। অঙ্কুরেই উপযুক্ত সিঞ্চন ও প্রতিপালন না হলে পরবর্তী স্তরের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা কি তা কারও অজানা নেই। শিশুদের সেই স্তরে না হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ, না হয় জ্ঞান-সঞ্চয়। যে পাথেয় পাঁচবছর ধ'রে অর্জিত হয়, তা মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছবার পক্ষে খুবই সামান্য। ফলে, গোড়াতেই গলদ থেকে যায়। তারপর ক্রমশই সেই ত্রুটি নানাভাবে ভাঙ্গন ধরাতে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর দুটির মধ্যে সংহতির অভাব প্রকট। তার কারণও যথেষ্ট। প্রথমত, প্রাথমিক শিক্ষার মান নানা কারণে এখনও অনির্দিষ্ট। এই স্তরের শেষে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার প্রশ্ন থাকলেও পারের কড়ি সংগ্রহ করতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কোনোমতে তারা যখন তীরে পৌঁছোয় তখন তাদের সামনে পড়ে বাণীর

বিরাট দেউল। প্রবেশাধিকার মিললেও সেখানে প্রসাদ পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাধ্যমিক ও উপমাধ্যমিক বাণীনিকেতনে এসে শিক্ষার্থীদের মনে সংকোচ জাগে। যে সামান্য পাথেয় তারা নিয়ে আসে তা তাদের মধ্যে প্রত্যয় আনতে পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা—এই দুই স্তরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে বিরাট সংকল্প নিয়ে। সেগুলি বুনিয়াদি বিদ্যালয়। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা অখণ্ড যোগ সাধন করাই হচ্ছে এই সব শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার আয়োজন যেন একপেশে হয়ে আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সঙ্গে এই ধারার মিলনের পথে কয়েকটি বাধা এসে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধারার মধ্যে মিলন ঘটাতে হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছু রদবদল করতে হবে। তেমনি সম্ভবস্থলে মাধ্যমিক শিক্ষাধারাকে কিছুটা ক্রিয়াকেন্দ্রিক করতে হবে।

আজ বুনিয়াদী শিক্ষার বিপক্ষে অনেক সমালোচনাই শোনা যায়। অবশ্য সমস্যা আছে ব'লেই সমালোচনা। একদিকে যান্ত্রিকতার প্রসার; অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা,—এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা সমস্যা বৈ কি ?

মাধ্যমিক শিক্ষা—এখন দেখা যাক, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আজ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে, শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে সমস্যাগুলির কথা। ভগ্ন স্বাস্থ্য, মুখে বিষাদের ছায়া, প্রাণে হতাশা নিয়ে তারা বিদ্যালয়ে আসে। কারও বা নিষ্ঠা হারিয়ে গেছে, কারও বা জীবনের সব কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা। অধ্যবসায় বা একাগ্রতার একান্ত অভাবে কোনো বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তখন দুষ্কর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া আবেগগত সমস্যাও নানা সংঘাতের সৃষ্টি করে। অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশও নানা সমস্যা ডেকে আনে। ফলে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা, মানসিক বৈকল্য ও আচরণগত বৈষম্যই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণীপাঠনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্রমশই এই ধরনের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। এতে সমস্যা আরও জটিল হয়।

বিক্ষিপ্ত মন ও আদর্শহীন জীবনযাত্রা নিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে তখন শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে তাদের অগ্রগতি আশা

করাই বৃথা। পটভূমিকা ও পাথেয় দু'দিক দিয়েই যে দৈন্য থেকে যায় তা কিছুতেই ঘোচানো যায় না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে ঠিকই, তবে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপকরণকেও সমৃদ্ধ করা দরকার।

সামগ্রিক বিদ্যালয় পরিবেশ এখনো সংকীর্ণ; শিক্ষণের উপকরণও সামান্য। তারপর, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্রাতীত। তাই শ্রেণীপাঠনকে কার্যকরী করা সাধারণ শিক্ষকের সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণীতে যারা সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না, সেসব শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাবার কোনো চেষ্টাই হয় না। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক অপচয় বেড়েই চলেছে।

শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে যেমন অগণিত সমস্যা তেমনি শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে সমস্যাও কম নয়। শিক্ষকই শিক্ষাতরণীর কর্ণধার। সেই তরণীকে নিরাপদে পার করার দায়িত্ব তাঁরই। পথে তরঙ্গ, ঝঞ্ঝা আরও কত দুর্যোগ। তাই যাঁরা শিক্ষাব্রতী তাঁদের প্রাণ-মন সবই উদ্দিষ্ট হবে সেই একই লক্ষ্যের দিকে। জনকল্যাণ ও শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ তাঁদেরই হাতে। তাই প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি। পুঁথিগত বিদ্যার উপরই শিক্ষণের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, নির্ভর করে শিক্ষকের দরদী মনোভাবের উপর। যাঁরা শিক্ষকের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করবার প্রয়াসী, তাঁদের প্রথম পাথেয় হ'ল ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠা। এগুলির অভাব ঘটলে ব্রত পালন অপূর্ণই থেকে যাবে। দুঃখের বিষয়, যাঁরা আজ এই জ্ঞানযজ্ঞের হোতা হ'তে চলেছেন তাঁদের অনেকের মধ্যে সে প্রেরণা ও আদর্শের অভাব। কর্মজগতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো-প্রাণধারণের জন্য তাঁরা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। মন ও মনন-এর কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রস্তুতি না নিয়ে এই বিরাট দায়িত্ব নিতে তাঁরা অগ্রসর হন। ফলে, শিক্ষণের আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন; জীবন নৈরাশ্যে ভ'রে ওঠে। বিড়ম্বনা ও সংঘাত শুরু হয় নানা স্তরে। কিন্তু আজও এমন সব শিক্ষকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা শিক্ষার্থীদের সজীব-প্রাণের সংস্পর্শে এসে শিক্ষকতার মধ্যে প্রচুর আনন্দ পান—আর সেই আনন্দই হয় তাঁদের জীবনের একটি বিশেষ উপজীব্য। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা সেই

আনন্দটুকু সংগ্রহ ক'রে নিতে পারেন না। কেবল কারখানার কর্মীর মতো দিন যাপনের গ্লানি তাঁরা বহন করেন। বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যশালায় তাঁদের ভূমিকা সমাজে নানা সমস্যা ডেকে আনে। হৃদয়-বিনিময়ের অভাবে শিক্ষাদানের আনন্দরস যায় শুকিয়ে।

অনেকে হয়তো এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বলবেন—"আমাদেরও ঘর সংসার আছে—শুধু আদর্শ নিয়ে ব'সে থাকলেই তো চলবে না।" তাঁদের এই অভিযোগের সদুত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন, তবে একথা বলা যায় যে, যখন শিক্ষকতা ব্রত নেওয়াই হয়েছে তখন তা থেকে যতটা আনন্দ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক'রে নিতে দোষ কি? মনকে নৈরাশ্যে ও ক্ষোভে দলিত ক'রে কি কিছু উপরি-পাওনা মিলবে? বরং নিজেদের প্রয়োজনীয়তাকে ত্যাগ ও আদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে একটা নৈতিক শক্তির উদ্ভব হবে—যা রাষ্ট্র ও সমাজকে শিক্ষকদের ন্যায্য স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করবে। শিক্ষকরাই যে সমাজের মেরুদণ্ড—একথা তখন স্বীকৃত হবে। তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে; তবে ধর্মঘট ক'রে শিক্ষকদের সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে কি না জানি না।

আজকাল অনেক জায়গায় শিক্ষার্থীরা যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে ব্যর্থ ক'রে দিতে চলেছে। লেখাপড়া শিখে যদি এত ক্ষোভ, এত সংঘাত, তাহ'লে তা শেখার কি দরকার? তার চেয়ে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকুক!—এসব অভিমানের কথা। আসল উদ্দেশ্য এতে সফল হবে না। যাঁরা জাতির কর্ণধার তাঁদের আরও স্থির ও দরদী হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে—শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেন এত অসন্তোষ, সংঘাত আর শ্রদ্ধাহীনতা? শিক্ষার্থীদের হৃদয় থেকে তবে কি সমস্ত সদ্‌বৃত্তির নির্বাসন ঘটেছে? একথা স্বীকার করতে হবে যে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের হৃদয়বৃত্তির অবমাননা ক'রে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। মানুষের সদ্‌বৃত্তির উপর আশা রাখতে হবে। হয়তো শিক্ষার্থীদের পূর্ণ জাগরণ সম্ভব হচ্ছে না, হয়তো বাইরের পরিবেশের নানা প্রভাব শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশের পথকে রুদ্ধ ক'রে দিতে চাইছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিলে চলবে না।

সমাজের মেরুদণ্ড যেমন শিক্ষক তেমনি জাতির মেরুদণ্ড হ'ল শিক্ষা, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল চরিত্র গঠন ও মানবত্বের অধিকারী হ'তে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য থেকে যদি আমরা ক্রমশ দূরে স'রে যেতে থাকি তাহ'লে পরিণতি কি ?

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "রোগ কি সেকথা না জানলে যেমন রোগের চিকিৎসা করা চলে না, তেমনি ছাত্র-বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার প্রতিকার করাও সম্ভব নয়।" তাঁর মতে, শিক্ষার্থীদের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার যত কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষকের নেতৃত্ব-লোপ সর্বপ্রধান। রাজনৈতিক আন্দোলনের চক্রাবর্তে শিক্ষকের মর্যাদা কমেছে। যে কোনো পরিস্থিতিতেই শিক্ষকের নেতৃত্ব-লোপ সংকটের সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এই দুর্দশা তা বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সমাজে সর্বত্র যে আর্থিক দুর্গতি তার ফলে সংকট আরও ভয়াবহ ও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের এক বিপুল অংশ জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত। সেই পরাজয়ের গ্লানি ও তিক্ততা তাদের সমগ্র জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলছে।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শেই শিক্ষার্থীর চেতনলোকের উন্মেষ হবে। জাগবে উদ্দীপনা, জ্বলবে জ্ঞানের দীপ। তাহলেই দেখা যায়, শিক্ষাব্রত নিতে হ'লে ব্যক্তিত্বই পরম পাথেয়। আর সে পাথেয় নিয়ে যাত্রা না করলে পদে পদে বিড়ম্বনা। শুধু তাই নয়, শিক্ষকতার প্রতি দরদ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর এর অনেকখানি নির্ভর করে। আজ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পরীক্ষামূলক মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। তাই শিক্ষা-সমস্যা মেটাবার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। কেন একটি ছেলে শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়ছে, কেন সে খাপ খাওয়াতে পারছে না—এই ধরনের নানা প্রশ্নের সমাধানের জন্য শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ শিক্ষক আজ এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত। শিক্ষণের পথে যে পরীক্ষামূলক মনোভাব আনন্দের পাথেয় এনে দেবে তা থেকে বঞ্চিত হলে শিক্ষণ গতানুগতিক হয়ে পড়ে। আজকের দিনে প্রগতিবাদী মন, সবল ও সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিকতার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে নৈরাশ্য ও গ্লানি শিক্ষাক্ষেত্রে

আরও অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। হয়তো ব্যক্তিগত নানা কারণে জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে গেছে। প্রাণধারণের তাগিদে শুধু দিনযাপনের গ্লানি বহন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে। কিন্তু এতে শিক্ষকদের নিজেদের যতখানি ক্ষতি না হচ্ছে তার চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই সব শিশু-কিশোরদের।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না ব'লে পারছি না। সম্প্রতি Bertrand Russelএর সঙ্গে এই গ্রন্থের লেখকের সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি দু'একটি কথা বললেন। তার মধ্যে প্রধান হ'ল—"Teaching is mainly an Inspiration"। সত্যই তাই। শিক্ষার পেছনে যদি প্রেরণা না থাকে তাহলে তার মূল্য কি! সোনার কাঠির মতো এই প্রেরণাই জাগরণের মন্ত্র বহন ক'রে আনে অজানা থেকে জানার দিকে, অভিযান সার্থক হয়ে ওঠে প্রেরণার ফলে। যাঁরা আজ এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিজেদের জীবনে যদি প্রেরণার অভাব ঘটে, তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে তা আমরা কি ক'রে আশা করতে পারি? এটা আজকের একটা বড় সমস্যা। এজন্য চাই নিরলস হৃদয়বান্ কর্মী যাঁদের আছে প্রচুর প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনা, যাঁরা জাগাতে পারবেন ভারতের ভাবী নাগরিকদের। জ্ঞানের বাতি জ্বালাতে হ'লে আগে মনের বাতি জ্বালতে হবে।

শিক্ষকদের বহু অধিবেশনে এই গ্রন্থের লেখকের আলোচনার সুযোগ হয়েছে। এই সব আলোচনার ভেতর দিয়ে দেখা গেছে, এখনও এমন শিক্ষক আছেন যাঁরা সত্যিই কিছু করতে চান। শুধু যথাযথ নির্দেশ ও প্রেরণার অভাবে তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদিও বা তাঁরা কিছু করবার পরিকল্পনা নিতে চান তবুও প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষকের ঔদাসীন্যে তা রূপ পায় না। এইজন্য সরকার থেকে প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ আলোচনা-চক্র ও শিক্ষা-অধিবেশনের প্রয়োজন। বাঁধা খাতে চলতে চলতে তাঁদের যে স্থবিরতা এসে গেছে, যে স্থিতিশীল অবস্থায় তাঁরা পৌঁছেছেন তা প্রগতিবাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আগে তাকে দূর করতে হবে। একটা উদার পরহিতব্রতী মন নিয়ে শিক্ষার জয়যাত্রায় এগিয়ে আসতে হবে। সমস্যাকে ভয় পেলে চলবে না, সামনে যা আসবে

সাহস ক'রে তার মুখোমুখী হতে হবে, সমবায় শক্তিতে তার সমাধান খুঁজতে হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় মনে। মনকে জাগাতে পারলে সেই ইচ্ছার বারুদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য এর জন্য নিরলস সাধনা চাই, চাই সদাজাগ্রত নির্লোভ মন ও কর্মশক্তি। প্রশ্ন ওঠে যে, এই সদ্‌বৃত্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কি শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করা উচিত নয়? এর উত্তরে বলা যায়, হৃদয়ের কিছু মূলধন থাকা চাই, একেবারেই রিক্ত হয়ে একাজে নামলে চলবে না।

শিক্ষাবিদ্‌দের অসন্তোষের আরও অনেক কারণ আছে। প্রথমত, শিক্ষার নিরানন্দ পরিবেশ, শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য ও শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষা। শিক্ষার্থী কেবল পুঁথিগত তথ্য সংগ্রহ ক'রে ক্ষান্ত হয়; বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির বদলে তথ্যের ভারে মন আচ্ছন্ন হয়। ফলে, শিক্ষার সর্বাঙ্গীন লক্ষ্য ব্যাহত হয়। Development of heart and hand—এই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের কতখানি অগ্রগতি হ'চ্ছে তা ভেবে দেখবার মতো। সত্যি কথা বলতে কি, আজকের শিক্ষা মানুষকে অহঙ্কারী ক'রে তুলেছে। হৃদয়ের প্রসার সেখানে সংকুচিত। দেহের ও মনের পুষ্টি ও শক্তি কোনোটাই এই শিক্ষার কল্যাণে সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। বোধের সমস্যা তো দূরের কথা, সাধারণ অনুশীলন-শক্তি বা বিচারবুদ্ধি বিকাশের জন্য যে শিক্ষার দরকার তাও আজকের শিক্ষায় সম্ভব হয়ে উঠছে না। এটা কম সমস্যা নয়। সমস্যাগুলো মোটামুটি অনেকেরই জানা আছে; কিন্তু তার সমাধান দিতে গিয়ে শিক্ষকদের পরাজয় মানতে হয়। সাহস ক'রে কোনো কিছু প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা বেশ কঠিন। এর জন্য চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি, জীবনদর্শিতা ও শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি।

সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে। যদি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মন সমৃদ্ধ হয়, অজানা থেকে জানার পথে যাত্রা যদি সার্থক হয়, তবে জ্ঞান ছাড়াও আর একটা সম্পদ তারা লাভ করবে। সেটা হ'ল তৃপ্তি। এই তৃপ্তির প্রাসাদে মন যখন ভ'রে উঠবে তখন সমস্যার মুখোশ খ'সে যাবে, জীবনে একটা দিগ্‌দর্শন ঘটবে। যে পথ বেয়ে প্রতিটি শিশু-কিশোর পরিণতি লাভ করতে পারে

তাকে প্রশস্ত করতে হ'লে সর্বপ্রথমে চাই সুপরিকল্পনা। পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-পরিবেশ, শিক্ষণ-পদ্ধতি—সবকিছুই উদ্দেশ্যমুখী না করতে পারলে সমস্যা থেকেই যাবে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে মূল সমস্যার কথা আলোচনা করা হ'ল। এ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা ভিড় ক'রে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, শিক্ষার যতগুলি উপাদান আছে তার মানবিক উপাদান হ'ল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। তাই তাদেরকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য সব উপাদানকে উদ্দেশ্যের অভিমুখী ক'রে তুলতে হবে। যেমন ধরা যাক, শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষা-পরিবেশ বলতে বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র থেকে শুরু ক'রে খেলাধুলোর সরঞ্জাম পর্যন্ত সব কিছুই বোঝায়। শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য কম নয়।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাঠ্যসূচী শিক্ষার একটি বিশেষ উপাদান। পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা। যেসব তথ্য বহু দিনের সাধনার ফলে লিপিবদ্ধ আছে,—যে জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ আছে তাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার মধ্যেই তার সার্থকতা। তবে দেখতে হবে যে, এই সব তথ্য থেকে রস আহরণ করবার মতো শক্তি ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা সঞ্চয় করেছে কি না। শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও পটভূমিকা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হওয়া উচিত। তা না হ'লে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। তাই মানসিক স্তর অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর প্রণয়নের উপযোগিতাকে স্বীকার করতেই হবে। আজকের দিনে পাঠ্যসূচী নিয়ে বহু মাতামাতি শুরু হয়েছে। কি ক'রে তার বিস্তার সাধন করা যায়, কি ভাবে প্রতিটি বিষয়ে গভীর দৃষ্টি জন্মানো যায়—এই হ'ল পাঠ্যসূচী প্রণেতাদের চিন্তা। দুঃখের বিষয়, পাঠ্যসূচীই তাঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য নয়। এই সব আয়োজনের সার্থকতা কতটুকু যদি শিক্ষার্থী তাকে গ্রহণ করতে না পারে, যদি তার মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করতে না পারে? অনেকে হয়তো পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীর নজীর দেবেন। কিন্তু তাঁদের ভুললে চলবে না যে, "East is East and West is West" অর্থাৎ পশ্চিমের জানলা দিয়ে পূবের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। পশ্চিমী সভ্যতায় যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, যে গৃহ-পরিবেশ, যে শিক্ষার

আয়োজন বর্তমান, আমাদের দেশে তার কতটুকু দেখতে পাই? শীর্ণ দেহ, জীর্ণ পরিবেশ, রিক্ত মন, মুখে বিষাদের ছায়া নিয়ে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী আধপেটা খেয়ে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের দিকে পা বাড়ায়। তারপর বিদ্যালয়ের অবস্থা কারও অজানা নেই। কোথাও ভগ্নদশা, কোথাও বা পর্ণকুটির, কোথাও বর্ষার দিনে দুর্দশার সীমা থাকে না। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ম্যাপ, গ্লোব হয়তো কোনোকালে কেনা হয়েছিল, এখন আর সেগুলো চেনা যায় না। এই দীনহীন পরিবেশের মধ্যে আমরা আশা করছি আমাদের দেশের শিশু-কিশোর পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলবে! এটা কতটা বাস্তব তা শিক্ষা-ক্ষেত্রের অধিনায়করাই বলতে পারেন। অবশ্য অনেকে বলবেন, আমাদের দেশে কি মনীষার অভ্যুদয় হয়নি? বলবেন, তবে কি আমরা সব আশা ছেড়ে দেব? মনীষার অভ্যুদয় হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের ক্ষেত্র ছিল আলাদা। প্রতিভার স্ফুরণ সবখানেই সম্ভব। সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে যারা জন্মেছে আজ তাদের কথাই বেশি ক'রে ভাবতে হবে। কারণ দেশ বলতে আমরা সাধারণ মানুষ বুঝি। আর আশা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে একথা বলা চলে যে, আশাকে ফলবতী করতে হলে শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে আনতে হবে সামঞ্জস্য ও সংহতি। বর্তমান পাঠ্যসূচী এই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত নয় একথা অস্বীকার করা বৃথা। পাঠ্যসূচীর তথ্যের বোঝা কিশোরদের কমনীয় বৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করছে কি না কে বলতে পারে! যদি ব্যক্তিত্বের বিকাশ, অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার সঙ্গে তথ্যকে অনুশীলনের দিকে উদ্দিষ্ট করা না যায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায় না। ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়গুলোয় আজ যে পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করা হয়েছে তার যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু সংহতি নেই। কেবল পাঠ্যসূচীর উপর দোষারোপ করলে চলবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সরঞ্জাম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, সবার উপরে শিক্ষকদের সাফল্যও অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। এই পাঠ্যসূচীকেই বিভিন্ন এককে (unit) ভাগ ক'রে কোন বিষয়কে কি ভাবে পরিবেশন করা যাবে, তার জন্য কি শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে এবং কি কি শিক্ষার উপকরণ তার জন্য অপরিহার্য ইত্যাদি বিচার ক'রে এমনি একটা পরিকল্পনা নিলে যথেষ্ট সুফলের সম্ভাবনা আছে। সেই পরি-কল্পনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সময়-সূচীর একটা সামঞ্জস্য রাখাও

দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে দুটি ঘণ্টায় না পড়িয়ে একাদিক্রমে দু'ঘণ্টা পড়ালে শ্রেণীপাঠন আরও বেশি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। অবশ্য এর জন্য চাই বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও অন্য বিষয়ের সঙ্গে তার যোজনা।

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, অনেক বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়েছে, বহু ইমারত গ'ড়ে উঠেছে, শিক্ষা-সরঞ্জামও এসেছে। কিন্তু উপযুক্ত বিষয়-শিক্ষকের অভাবে সব কিছুই অচল হয়ে পড়ছে। অব্যবহারের ফলে শিক্ষা-সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে বহুবিধ অপচয় তো হচ্ছেই, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি না ক'রে শিক্ষার এই বিরাট পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা কতখানি অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিদ্যালয়-পরিবেশের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণত সেখানে দৈন্য যেমন আছে, তেমনি আছে মানুষের হাতে গড়া সংঘাত। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে, এমন কি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অস্বাস্থ্যকর সংঘাতের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় তা খুবই নৈরাশ্যজনক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল শিক্ষার উপকরণের মধ্যেই দৈন্য লুকিয়ে নেই, দৈন্য মানুষের মনে। তা না হ'লে এত সংঘর্ষ কেন? আজ শিক্ষক-সম্প্রদায়কে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হতে হবে। তাঁদের অকলুষ নেতৃত্ব আজ একান্তভাবে কাম্য। এতে সমস্যার আংশিক সমাধান নিশ্চয়ই হবে।

আরও কয়েকটি সমস্যা এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন অনেক বিদ্যালয়েই পাঠাগার ও ল্যাবরেটরি নেই বললেই চলে। এমন কি স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য বিদ্যালয়ে মুক্ত অঙ্গনও নেই। সংকীর্ণ রুদ্ধ পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও উপকরণের দৈন্য—সব কিছু মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা আর যাই হোক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী মোটেই নয়। অথচ শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা ও ব্যক্তিত্বের নানাদিক দেখতে হলে কেবল শ্রেণীপাঠন হলেই চলবে না, পাঠ্যানুগ (Co-curricular) ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে

আত্মবিস্তারের সুযোগ দিতে হবে। আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে যদি কয়েকজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় উৎসাহী মনোভাব নিয়ে কিছু কিছু খেলাধুলো, আলোচনা-সভা, বক্তৃতা ও শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করেন।

এইভাবে পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য কার্যক্রমকে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতিকেও অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। কোনো বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি আঁকড়ে থাকলে চলবে না। শিক্ষার্থীর বয়সের স্তর, মানসিক অবস্থা, বিষয়বস্তু ও শ্রেণী-পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী তৈরি করা দরকার। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, কখনো বা আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পরিবেশন সহজ হয়ে ওঠে। শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়তার কথা আজ খুব বেশি শোনা যায়। আমাদের বিদ্যালয়-পরিবেশে তা কতখানি সম্ভব ভেবে দেখতে হবে। একথা বলা যায় যে, শিক্ষক যদি সজাগ ও সপ্রতিভ হন তবে তিনি শ্রেণী-পাঠনের সময় কিছু কিছু চার্ট, নক্সা বা ছবি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রয়োগ করতে পারেন। তবে সেগুলো পাঠনের পরিপোষক হবে কি না দেখতে হবে। অনর্থক আড়ম্বর বাড়িয়ে অনেক সময়ে বিপরীত ফলই দেখা দেয়।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা অনেকটা পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন সকলের উদ্দেশ্য কি ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শিক্ষার্থীর মন শুধু ঐ দিকেই, শিক্ষকেরও ততোধিক। কোনো বিদ্যালয়ে যদি পরীক্ষার ফল খারাপ হয় তবে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষককেই দায়ী করা হয় বেশি। বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানের দিক থেকে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি। যেখানে সত্যিকারের ধ্যান-ধারণা, যেখানে প্রজ্ঞা, সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। এর চেয়ে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আর কি হতে পারে? যতদিন পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের অভিমুখী না হচ্ছে, ততদিন এই সব সমস্যা আমাদের শিক্ষকদের কাছে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে। তাই শিক্ষকদের প্রাথমিক কাজ হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ঠিক ভাবে নিরূপণ করা ও বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা। তারপর শিক্ষার আর যা কিছু উপাদান আছে সবগুলিকে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নিয়োজিত করা। কি ভাবে তা সম্ভব হবে, তা এককথায় বলা চলে না। এর জন্য চাই চিন্তা, বিশ্লেষণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

যেসব সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রকে কণ্টকিত ক'রে রেখেছে সেগুলি সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনার অবকাশ আছে :

স্থান বা পরিসর—বিদ্যালয়ে বিস্তৃত পরিসর সুশিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হেসে-খেলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এমনি পরিসরের ব্যবস্থা না থাকলে সে অস্বস্তি অনুভব করে। আত্মপ্রসারের পথে পরিসরের দাম অনেকখানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খুব কম বিদ্যালয়ে পরিসর পর্যাপ্ত। তাই পরিবেশও অনুকূল নয়। তাছাড়া বিভিন্ন শাখাযুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে যে বিচিত্র আয়োজন করা হয়েছে বা হচ্ছে তা উপযুক্ত পরিসরের অভাবে সার্থক হয়ে উঠছে না। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে যন্ত্রপাতি ও শিক্ষার উপকরণ স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, জায়গার অভাবে তাদের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে ল্যাবরেটরী, পাঠাগার ও অনুরূপ বিষয়-কক্ষ (Subject Room) খোলা সম্ভবপর হয় না। বিশেষত, শহরের বিদ্যালয়গুলিতে স্থানাভাবের এই সমস্যা খুবই জটিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো কোনো শাখায় ভর্তি হবার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশি হয় যে, বিদ্যালয় তাদের নিতে পারে না। স্থানাভাব এর অন্যতম কারণ। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিদ্যালয়ের কেবল শোভাবর্ধনই করে না, শিক্ষার্থীদের আত্ম-উন্মোচনের পথেও সহায়তা করে। খেলাধুলোর মাঠ, ফল-ফুলের বাগিচা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় ক'রে তোলে।

বিদ্যালয়ের প্রতি আজকাল শিক্ষার্থীদের দরদ নেই বললেই চলে। বিদ্যালয় তাদের কাছে কারাগারের মতো। এর অন্যতম কারণ, বিদ্যালয়কে তাদের ভালো লাগে না। এমন কোনো সুখকর পরিবেশ বিদ্যালয়-জীবনে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে যেখানে গেলে তাদের প্রাণ আনন্দে দুলতে থাকবে। এই বিদ্যালয়কে ভালোবাসতে না পারার জন্যেই শিক্ষার্থী-জীবনে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। বিদ্যালয়-পালানো শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রেক্ষাগৃহের দ্বারে শিক্ষার্থীদের ভিড় ক্রমশই জমে উঠছে। মনে হয়, সাধ্যমতো বিদ্যালয় পরিবেশকে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর ক'রে তুলতে পারলে এই আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে।

আবার শহরে এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে স্থানের অভাব নেই, অথচ আবর্জনার স্তূপ, ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের মেলা। এই সব আবর্জনা দূর ক'রে সেখানে ছোটখাটো 'হবি ক্লাব' (Hobby Club) করা বা জায়গাটি ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখা চলে। একটু প্রেরণা পেলে এই কাজে শিক্ষার্থীরাই অগ্রগামী হ'তে পারে। এ ছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, চেয়ার-সাজানোর দোষে চলা-ফেরার স্থান থাকে না। সেখানে অবস্থা অনুযায়ী মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের পুনর্বিন্যাস করলে শ্রেণীকক্ষের রূপ পালটে যায়। স্থান বা পরিসরের অভাবই শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ-সঞ্চারের একমাত্র বাধা নয়। সজীব প্রাণের স্পর্শ পেলে সংকীর্ণ পরিসরও বৈচিত্র্যময় ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

আয়োজন—আয়োজন বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। আসবাবপত্র থেকে শুরু ক'রে যন্ত্রপাতি, গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি সবকিছু শিক্ষার উপকরণই বিদ্যালয়ের আয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়তা (Audio-Visual Aids) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ অনেক বেড়ে গেছে—যেমন প্রোজেক্টর, এপিডায়োস্কোপ ইত্যাদি। কিন্তু কটা স্কুলে এই সব উপকরণ রাখা সম্ভবপর হয়? বহু বিদ্যালয়ে ভালো ব্ল্যাকবোর্ডই নেই। কোথাও ম্যাপ জীর্ণ হয়ে পড়েছে, গ্লোব গোলাকার রূপ হারিয়ে বিচিত্র রূপ নিয়েছে, অথচ তাদের সত্তা বিদ্যালয় থেকে বিলুপ্ত হয়নি। বিদ্যালয়ের এই সব সাধারণ দুর্দশার কথা মনে করলে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের বিরাট দৈন্য প্রকাশ পায়। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, উপকরণের অভাবের চেয়ে উপকরণগুলি কাজে লাগানোর ইচ্ছার অভাবই দৈন্যের জন্য মূলত দায়ী। অনেক সময় যত্নের অভাবে বহু মূল্যবান উপকরণ অকালে নষ্ট হয়ে যায়। বিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল শাখা যে সব বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষার জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজনানুরূপ নয়। তার চেয়ে বেশি দুঃখের কথা এই যে, যেগুলি সংগৃহীত হয় তাদের কাজে লাগাবার জন্যে যে স্থান ও মানুষের প্রয়োজন, আমাদের অনেক বিদ্যালয়েই তার একান্ত অভাব। ফলে, বহু যন্ত্রপাতি ক্রমশই অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে। এমন অনেক উপকরণ বিদ্যালয়ের বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে যা এক বছরের মধ্যেও শিক্ষক দেখবার

সময় পাননি। এই সমস্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ লোককে শিক্ষার ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে, উপযুক্ত মানুষের অভাবে প্রচুর উপকরণও নিরর্থক হয়ে উঠছে। মানবিক উপকরণের কথা আমরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হই।

বাড়ি-ঘর, জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জাম থাকলেই শিক্ষা সার্থক হয় না; শিক্ষকই শিক্ষায়তনের বাণীমূর্তি। যত দিন শিক্ষার্থী শিক্ষায় আনন্দ না পাবে, শিক্ষক আত্মগ্লানি ও অতৃপ্তি থেকে মুক্তি না পাবেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হবে, তত দিন কোনো আয়োজনই সার্থকতা লাভ করবে না। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের প্রাণের কথাও শিক্ষকদের বুঝতে হবে। বুঝতে হবে তাদের দুঃখ-কষ্ট। অভাব-অনটন-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে তাদের। শৈশব থেকেই অনেক শিক্ষার্থীর মুখে বিষাদের গ্লানি, চোখে দীপ্তির অভাব, বুকে শঙ্কা ও সংশয়। কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে গৃহ-পরিবেশে তারা বাস করে তা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। কারও বা দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না, কারও বা পড়বার নির্দিষ্ট সময় বা স্থান নেই, আবার কোথাও বা অভিভাবকের নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ শিক্ষার্থীর মনকে সংকুচিত ক'রে দেয়। যতদিন না এই পরিবেশের সন্তোষজনক পরিবর্তন হয় ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার জন্য কোনো আয়োজনই সুফলপ্রদ হবে না।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকই প্রধান অঙ্গ। শিক্ষককে বাদ দিয়ে কোনো আয়োজনই সার্থক হতে পারে না। প্রাচীন তপোবনের শিক্ষায় শিক্ষার উপকরণ, বিদ্যায়তন ও আসবাবপত্রের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মুক্ত প্রকৃতির কোলে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা পেত তাই হ'ত তাদের জীবনের পরম পাথেয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হ'ত কিশোর-হৃদয়। এই সব শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে ধন্য হ'ত অগণিত শিক্ষার্থী। আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে

শিক্ষার নানা সরঞ্জামের কথা চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষক-সমস্যা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে। অথচ বর্তমান পাঠ্যসূচীকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিপুণ শিক্ষকের প্রয়োজন। অনেকেই আজ একথা ব'লে থাকেন যে, শিক্ষক তৈরি করা যায় না ; যাঁরা মনে-প্রাণে শিক্ষক তাঁদেরই কেবল এদিকে আসা উচিত। এ হ'ল আদর্শবাদীর কথা। এমন শিক্ষক আজকের দিনে নিতান্ত দুর্লভ বললে ভুল হবে না। মানুষের মন বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়তই প্রভাবিত হচ্ছে। বাইরের বস্তুজগৎ শিক্ষকের এ আদর্শকে ক্রমশ ম্লান ক'রে দিতে চাইছে। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষণ-ক্ষেত্রে আসছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই যোগ্যতার অভাব। এর কারণও সুস্পষ্ট। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকেই অনেকে বরণ করেন। ফলে,আত্মগ্লানি ও হীনতাবোধ শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত ক'রে তোলে। সুস্থ সবল দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আর যাই চলুক শিক্ষণ-কার্য চলে না। যেখানে মানুষের মন নিয়ে রাত্রিদিন নাড়াচাড়া, সেখানে প্রাণের সজীবতা হারিয়ে ফেলে শিক্ষাদান-কার্য নিতান্ত প্রাণহীন হয়। আজ শিক্ষক নিয়োগের জন্য নানা কমিটি ও কমিশন বসছে। তাঁদের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষকও নিযুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু সেই সুপারিশের মাপকাঠি কি হবে—এই নিয়ে এখনও মতবিরোধ আছে। শিক্ষক কোন পরীক্ষায় কি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন—এটুকু দেখলেই দেখা শেষ হয় না। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা ও পরীক্ষায় কৃতিত্বই শিক্ষকতায় যোগ্যতা এনে দেয় না। শিক্ষণের মধ্যে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যদি কেউ শিক্ষার্থীকে ভালোবাসতে না পারেন, যদি কারও পড়াতে ভালো না লাগে, তবে তাঁর শিক্ষকতায় যোগ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সকল বিদ্যাবত্তা সেখানে নিরর্থক। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হ'ল—সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব। শিক্ষার্থীর মনকে আন্দোলিত ও উন্মোচিত করতে পারার মতো শক্তি ক'জনের আছে ! ফলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে, মাধুর্যের বদলে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা আচরণ এই কারণেই বেড়ে চলেছে। তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকার কথা মনে রাখতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটি—আজ শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চারদিকে শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। অনেকের প্রশ্ন, স্বল্পকালীন দশমাসের শিক্ষা কি ফল প্রসব করবে? অনেকে অবশ্য স্বীকার করেন যে, ঘষা-মাজার মূল্য কিছু আছেই। শিক্ষণ অন্তত এই পরিমার্জনকে সম্ভবপর করে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, শিক্ষক-শিক্ষণের যে ব্যবস্থা আজ হয়েছে তা কি যথেষ্ট? সত্যই কি এই শিক্ষণের ফলে শিক্ষকের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়? মামুলি ধারায় দশমাস কাল কাটিয়ে দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করা ছাড়া এই শিক্ষণের মূল্য কতখানি? এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। মনে হয় পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির যে সব রীতি শিক্ষণ-ক্ষেত্রে চ'লে আসছে, তার আমূল পরিবর্তন দরকার। দেখা গিয়েছে, যেসব শিক্ষক এই সব কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর জীবন যাপন করতে আসেন তাঁদের অনেকেই প্রবীণ ও গার্হস্থ্যধর্মে অভিজ্ঞ। তাই বহুদিন শিক্ষকতার ফলে যেসব অভ্যাস তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গেছে সেগুলিকে দূর ক'রে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করা তাঁদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সাময়িকভাবে পরীক্ষা পাশের জন্য সেগুলিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেও বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁদের অবস্থা আগের মতোই হয়। অনেকে বলেন যে, এই সব শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশ ও আদর্শ পরিস্থিতির মধ্যে কার্যকরী হতে পারে। একথা আংশিকভাবে সত্য।

শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচী—কেবল শিক্ষা-পদ্ধতি নয়, পাঠ্যসূচী সম্পর্কেও নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা খুব বেশি আছে ব'লে মনে হয় না। শিশুকে বুঝতে হলে কেবল শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই চলবে না, শিশুর প্রতি পূর্ণ দরদ নিয়ে শিক্ষককে সুস্থ মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রকে এই ভার নিতে হবে। এজন্যে পর্যাপ্ত অবসর থাকার প্রয়োজন। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে জানলেই চলবে না। অবস্থাবিশেষে শিক্ষাপ্রণালীকে পরিবর্তিত করতে হবে। প্রয়োজন হলে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। হার্বার্ট সাহেব কোন কথা বলে গেছেন, কবে শিক্ষণের পাঁচটি সোপানের নির্দেশ দিয়ে গেছেন—শুধু সে কথা মনে রাখলেই শিক্ষাদান কার্য সফল

হবে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে পাঠ্যসূচী এখনও টিকে রয়েছে তার মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য, অনেক অসম্পূর্ণতা। এই পাঠ্যসূচীর সংস্কার করা তাই একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। আর একটি সমস্যা এই সব শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে দেখা দিয়েছে। যাঁরা শিক্ষণপ্রার্থী হয়ে আসেন, তাঁদের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তুর জ্ঞান অল্প। এই জন্যে শিক্ষণ-পদ্ধতি জেনে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। বিষয়বস্তুর উপর দখল না থাকলে উপস্থাপন-প্রণালী কাজেই লাগে না। এইজন্যে বিদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে দীর্ঘতর শিক্ষণকালের ব্যবস্থা আছে। দু'একটি কেন্দ্রে তিন বছর ধ'রে শিক্ষণ চলতে থাকে। প্রথম বছরে, যিনি যে বিষয়ে পড়াবেন সেই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মাবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় বছরে, বিষয়টির শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা। তৃতীয় বছরে, সেই পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যবস্থা শিক্ষণকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলে। আমাদের দেশে এক বছরের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এই পূর্ণতা আশা করা যায় না। যাই হোক, শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াতে হলে তাঁর যোগ্যতা বাড়াতে হবে। সমাজে শিক্ষকের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হ'লে আদর্শবোধের কথা অস্বীকার করলে চলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো দেশেই শিক্ষকদের আসন উচ্চে নয়। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে চিরন্তন বিরোধ শিক্ষকজীবনে সুস্পষ্ট। এদিকে রাষ্ট্রের অনুকূল দৃষ্টির প্রয়োজন।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় সময়-তালিকা

যে-কোনো পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আমাদের বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীদের যেটুকু সময় পড়াশোনার জন্যে নির্দিষ্ট, তা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে ও পাঠ্যসূচী শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, তার উপর রাজনীতি, ধর্মঘট, জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন লেগেই আছে। ফলে, বছরের মধ্যে যে সময়টুকু পড়াশোনার জন্য পাওয়া যায় তা নিতান্ত অল্প। এছাড়া, দৈনন্দিন কাজেও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, পদত্যাগজনিত অসুবিধা ইত্যাদি অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ সময়-তালিকা প্রণয়নে অসুবিধার সৃষ্টি করে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বছরের

যে ক'ঘণ্টা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হয়, তাতে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী কখনোই সমাপ্ত হতে পারে না। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে প্রতি বিষয়ের প্রতি বিচার ক'রে সময়-তালিকা প্রস্তুত এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যার সমাধান কোথায়? পল্লীগ্রামে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ঘাটতি লেগে আছে। তার উপর বিষয়বস্তুর বোঝা ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা দূরে থাক, পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতিই অনেক সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

সময়-তালিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন—এই সব সমস্যার সমাধান করতে হলে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ অবকাশগুলির আগে ও পরে বেশ কিছু সময় শিক্ষার্থীদের উত্তেজনায় কাটে। আবার, কখনও বা ছুটির আলস্য কাটাতে বেশ কিছুদিন সময় কেটে যায়। এতে ছুটির সার্থকতা যায় হারিয়ে। তারপর, যে সময়টিতে আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ও ছুটি হয় তারও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন করলে ভালো হয়। অবশ্য আবাসিক বিদ্যালয় হ'লে এই পরিবর্তন সহজ হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক শিক্ষার্থীর সময় নানাভাবে নষ্ট হয়। হাট-বাজার দোকান-পসার করতে সকলের কত মূল্যবান সময়ই না অতিক্রান্ত হয়ে যায়! আবাসিক বিদ্যালয়ে সকাল থেকেই পাঠ শুরু করা যায় ও তাতে কাজও ভালো হয় ব'লে বিশ্বাস। এখানে দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পড়াশোনা শুরু হতে পারে। এইভাবে পড়াশোনার সময় অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, সারা সময় শিক্ষার্থী পড়াশুনাই করবে। কখনও বা খেলাধুলো, কখনও দেহ-চর্চা, বা আনন্দ-উৎসবে যোগদান করবে। বিদ্যালয়ের কাজ বিদ্যালয়েই শেষ হবে। এই রীতি অনেক জায়গাতে প্রচলিত আছে, বিশেষ ক'রে বিদেশে। এতে বিদ্যালয়-জীবন শিক্ষার্থীর কাছে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, বিদ্যালয়কে তারা ভালোবাসতে শেখে। এই রীতি প্রবর্তনের পথে আমাদের দেশে অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু আধুনিকভাবে, স্থানীয় পরিবেশ ও ঋতু অনুযায়ী, এই রীতি প্রবর্তন করলে হয়তো সুফল পাওয়া যাবে। এছাড়া সব অঞ্চলে দীর্ঘ ছুটির দিন একই সময়ে নির্দিষ্ট না ক'রে, প্রাকৃতিক অবস্থা ও ঋতু অনুযায়ী ছুটি নিয়ন্ত্রিত করলেই

ভালো হয়। যেমন, সুদূর পল্লীতে অনেক স্থানেই বর্ষায় এত জল জমে যে পথঘাট প্রায় ডুবে যায়। এইসব অঞ্চলে বর্ষায় কিছুদিন অবকাশ দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার নানাস্তরেই সমস্যা রয়ে গেছে। নার্সারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক—সব পর্যায়েই সংহতি ও যোগাযোগের অভাব এই সমস্যাকে জটিল ক'রে তুলেছে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যা—শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বের স্তর হ'ল নার্সারি শিক্ষার স্তর। ভারতের ইতিহাসে নার্সারি স্কুলের উদ্ভব খুব বেশি দিনের নয়। পূর্বে শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দিত। কিন্তু এখন সমাজের কাঠামো বদলে যাচ্ছে। অনেক সংসারেই আজ শৈশবের শিক্ষা গৃহশিক্ষকের হাতে। মা-বাবা দেখবার সময় পান না। তাই নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শৈশবের স্তর বিশেষ মূল্যবান। কারণ শৈশবের শিক্ষার উপর শিশুর ভাবী জীবন অনেকখানি নির্ভর করে। দুঃখের বিষয়, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় স্তর আমাদের. দেশে এখনও উপেক্ষিত। না আছে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষা, না আছে শিক্ষার উপকরণ। তাছাড়া শহরের কয়েকটি মুষ্টিমেয় শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া এইরূপ শিক্ষা-নিকেতন নেই ব'ললেই চলে। আজ-কাল অবশ্য অনেক শহরে নার্সারি নামধারী কিছু কিছু শিশু-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠছে। কিন্তু এগুলির কোনোটিই বোধহয় শিশুর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ভার নেবার যোগ্য নয়। তাছাড়া এসব তথাকথিত নার্সারি স্কুলের কোনো একটি নির্দিষ্ট মান নেই। শিশুদের লালন-পালনের জন্যে যে পরিবেশ ও তাদের ইন্দ্রিয়-শিক্ষার জন্যে যে শিক্ষার উপকরণের দরকার তারও একান্ত অভাব। তাই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এইসব কারণে সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছে ব'লেই মনে হয়। এদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি নেই ব'ললেই চলে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যা—পরাধীন ভারতে, বৃটিশ শাসনের যুগে, প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল। বৃটিশ রাজত্বে শিক্ষার কিছুটা প্রসার হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক

চরম ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর হ'ল ভারত স্বাধীন হয়েছে, অথচ প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এখনো সুদৃঢ় হয়নি। নানা অন্তরায় ও বাধা এই ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছে। প্রতিবন্ধকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল—(ক) শিক্ষার্থীদের দুরবস্থা; (খ) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব; (গ) অনুপযোগী পাঠক্রম; (ঘ) ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন; (ঙ) অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা।

এছাড়া সামাজিক ও পরিবেশগত বহু বাধাও আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যেমন (ক) সংকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষাপরিবেশ; (খ) সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায়; (গ) প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি।

সবচেয়ে বড় অন্তরায় হ'ল, শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সংহতির অভাব, অনুন্নয়ন ও অপচয়। অনেক সময় দেখা যায়, এই সব সমস্যার মূলে কখনও সরকারী অবহেলা, কখনও জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব। এগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণের সার্থকতা আছে।

শিক্ষার্থীদের দুরবস্থা—দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। পল্লীবাসী কৃষক-মজুরের তো কথাই নেই। তাদের সন্তান-সন্ততির দেহ দৈন্য-ক্লিষ্ট, মুখে হতাশা, জীর্ণ বেশ। ঠিকমতো দুবেলা অন্ন জোটে না। তার উপর বই, খাতা ও শিক্ষার উপকরণের অভাব। সময়মতো খাওয়া হয় না। ছেলেবেলা থেকেই গৃহস্থালী কাজের চাপ। এমন অনেক সময় আসে যখন বাড়ির কাজে, ব্যবসায়ে, খেতে-খামারে অভিভাবককে সাহায্য করতে গিয়ে দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতে হয়। শহরে অনেক সময় কন্‌ট্রোলের দোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন লাগিয়েও শিক্ষার্থীদের সময় কাটে। শিক্ষার্থীদের এই দুর্গতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষক-সমস্যা—প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বড় সমস্যা হ'ল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যে বেতন নির্ধারিত হয়েছে তা এতই সামান্য যে তা কোনো শিক্ষককেই এই বৃত্তি গ্রহণ করতে উৎসাহ দেয় না। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব আয় নেই বললেই চলে। সরকারী সাহায্যের উপর এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

সরকারী নীতি আজও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের দিকে উদাসীন। অনেকক্ষেত্রেই নিতান্ত অযোগ্য লোক দিয়ে এই স্তরের শিক্ষাকার্য চালানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার মানের যে ক্রমাবনতি ঘটছে তার অন্যতম কারণ হ'ল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের তাৎপর্য অনেক বেশি। কারণ ব্যক্তিত্ব-গঠনের ভিত্তিভূমি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। শিশু-শিক্ষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব ঘটলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যালয় বলা চলে না। সেখানে আর যাই হোক, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব-গঠন—কোনো কিছুই হয় না। দিনের পর দিন কেবল শিক্ষার্থীদের আনাগোনাই সার হয়। অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায়তনের অনুপাতও শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত। এটিও একটি বিরাট সমস্যা।

একথা ঠিক যে, বুনিয়াদী শিক্ষালয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর চাহিদাকে আংশিকভাবে মেটাচ্ছে। কিন্তু সেখানে সমস্যা আরও জটিল। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা আরও কম। এই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে পটু হ'তে হ'লে শিক্ষককে আরও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সপ্রতিভ হ'তে হবে। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা এখনও অপর্যাপ্ত। এছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের শিক্ষা-পরিবেশও আরও বৈচিত্র্যময় করা দরকার।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র একজন শিক্ষক থাকেন। এই কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনুপযোগী পাঠক্রম—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠক্রমের দিকে দৃষ্টি দিলে নৈরাশ্যই জাগে। যে পাঠক্রম এই শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট হ'য়েছে তা একান্ত নীরস ও সংকীর্ণ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সংযোগ নেই। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের গৃহ ও বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করতে এই পাঠক্রম অক্ষম। তাই কেবল পুঁথিগত জ্ঞান ও গতানুগতিক তথ্য পরিবেশন করার মধ্যেই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ এই স্তরে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরভুক্ত করায়

পাঠ্যসূচী আংশিকভাবে ত্রুটিমুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি পাঠক্রম সংস্কারের দিকে সরকারী দৃষ্টিও সজাগ হয়েছে।

ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ও প্রশাসন—প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যেসব ত্রুটি আজ দেখা দিয়েছে তার অন্যতম কারণ হ'ল সুব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের অভাব। একদিকে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর, অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তর। এই দুয়ের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের সংহতি না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতা ক'মে গেছে। মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রস্তুতি তো হচ্ছেই না, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথেও শিশুদের কোনো অগ্রগতি ঘটছে না। দেখা গেছে, অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাধারণ প্রশাসনের ভার স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর। এইজন্য রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে প্রায় উদাসীন। এই সব কারণে স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার এখনো সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। বলা হয়ে থাকে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রধান বাধা অর্থাভাব। একদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের উপর উচ্চহারে আয়কর বসাতে দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাব—এই দুটি কারণ প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করেছে।

সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার চেষ্টা হচ্ছে। এজন্যে বহু কর্মচারী নিয়োগ ও যথাযথ আইন ও বিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইনগুলিতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এমন কোনো আধিকারিকের ব্যবস্থা নেই, যিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তত্ত্বাবধান করতে ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিতে পারেন।

এইসব বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিদর্শকদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয় না। কোথাও শিক্ষক অনুপস্থিত, কোথাও বা বর্ষায় উপযুক্ত স্থানের অভাব।

বৃটিশ শাসনের আমলে যে পরাধীনতার গ্লানি আমাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল আজও তা থেকে আমাদের মুক্তি হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতি বৃটিশ সরকার চালু রেখেছিলেন তা যে ভ্রান্ত ছিল একথা বলাই বাহুল্য।

নানা কারণে, বিশেষত প্রশাসনিক কারণে, বৃটিশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হননি। পরন্তু এই স্তরের শিক্ষার সংকোচই হ'য়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা পেল, তখন শতকরা ৮৫ ভাগ লোক ছিল নিরক্ষর। ভারত সরকারের আশা ছিল, দশ বছরের মধ্যে তাঁরা চোদ্দ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন করবেন। সে আশা আজও পূর্ণ হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণ সরকারী অবাস্তব নীতি ও দূরদৃষ্টির অভাব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার পেছনে কল্পনা ও দার্শনিক ভিত্তি আছে সন্দেহ নেই। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার জন্যে সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার এই অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন ও পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করেছেন।

অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা—আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে আর একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা। এখনও এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা সন্তানের সুশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন না। অনেক সময় অভিভাবকরা অজ্ঞতা ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেন। অভিভাবকদের অশিক্ষার জন্যে গৃহপরিবেশ দীন ও সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। সেই পরিবেশে শিক্ষার্থীর যথাযথ প্রতিপালন কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।

অভিভাবকদের দারিদ্র্যই শুধু নয়, তাদের মধ্যে নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস শিক্ষার আয়োজনকে ব্যাহত করে। অনেক সময় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের চেষ্টা সত্ত্বেও অভিভাবকদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এই কারণে শিক্ষার আয়োজনের এক দিকে মস্ত একটা ফাঁক থেকে যায়।

অন্যান্য যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষার সংকীর্ণ পরিবেশ অন্যতম। শিক্ষার পরিবেশ বলতে দুরকম পরিবেশ বোঝায়—একটি শ্রেণী-পরিবেশ, অন্যটি বাইরের পরিবেশ।

শ্রেণী-পরিবেশ—শ্রেণী-পরিবেশের দৈন্যের জন্যে অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা দায়ী। কিন্তু এটাই সব নয়। অনেক সময় শ্রেণীকে সুন্দর ও আনন্দময়

ক'রে তোলা যায় যদি তার পেছনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের সহযোগিতা থাকে। অবশ্য আজ কোথাও কোথাও 'School beautiful'—অর্থাৎ নিজের বিদ্যালয়কে সুন্দর ক'রে তোলার জন্যে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

বহিঃপরিবেশ—নিজের গৃহের বাইরে যে পরিবেশে শিক্ষার্থী মেলা-মেশা খেলাধুলো করে তা সব সময়ে সমগোত্রীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকদের যদি বিশেষ দৃষ্টি থাকে তবে বাইরের পরিবেশও শিক্ষার্থীদের জীবনকে ছন্দোময় ক'রে তুলতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যা

মাধ্যমিক পাঠ্যসূচার বোঝা—আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ যে পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করেছেন, তা সত্যিকারের শিক্ষানুরাগীদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কমিটিগুলি পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করবার ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছা ছিল যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর ব্যাপক জ্ঞান লাভ করুক, সুপণ্ডিত হোক। কিন্তু প্রত্যেক কমিটি খণ্ড-ছিন্নভাবে নিজ নিজ বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। একটা সামগ্রিক দৃষ্টির অভাব আজ সকলেই উপলব্ধি করছেন। একদিকে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক শক্তি ও বিদ্যালয়ের পাঠনকাল, অন্য দিকে বিচিত্র পাঠ্যবিষয়ের গুরুভার—এর মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য কোথায়? অনেকে হয়তো পশ্চিমের শিক্ষার নজির দেখাবেন। কিন্তু একথাও চিন্তা করা দরকার যে, সে দেশের পরিবেশ, জীবন, শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা কতখানি!

অনেকে বলবেন যে, শিক্ষক যদি পারদর্শী হন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু তথ্য তাঁরা পরিবেশন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকের সংখ্যা আজ কত বিরল। তাই সময়-তালিকা প্রণয়ন করা আজ এক জটিল সমস্যা। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি চল্লিশ মিনিটের ঘণ্টায় ঠিকভাবে পড়ানো যায় না। যেমন, সমাজবিদ্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন তথ্য আহরণ ক'রে এক জায়গায় উপস্থাপিত করতে করতেই ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়; সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আর হয় না। এসব ক্ষেত্রে খণ্ড-খণ্ড ভাবে কয়েকটি ঘণ্টা পড়ানোর জন্য ব্যয় না ক'রে পর

পর দুটি ঘণ্টাকে কাজে লাগালে বোধ হয় ফল ভালো হয়। আবার এরূপ দু' একটি বিষয় আছে যেখানে কার্যিক (Practical) দিকের উপর বেশি জোর দিতে হয়; এসব ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আজ যে নতুন নতুন বিষয় প্রবর্তিত হয়েছে তাতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে—যেমন, টেক্‌নিক্যাল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি। কারণ, শিক্ষকতা-কার্য এইসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ করতে পারছে না। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে সময়-তালিকার মধ্যে এসব বিষয়ের একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে মাত্র, কিন্তু শিক্ষকের সাক্ষাৎ মেলে না। মাসের পর মাস বিজ্ঞাপন দিয়েও শিক্ষক পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায়, তাঁদের আবির্ভাব বিদ্যালয়ে স্বল্পকালস্থায়ী।

নূতন পাঠ্যসূচীর ত্রুটি

যে পাঠ্যসূচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কতখানি উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কয়েকটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী ত্রুটিমুক্ত নয়—যেমন, ইংরাজীর পাঠ্য-তালিকা। এই পাঠ্যতালিকার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কথা। কিন্তু যে যে বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে তা সাহিত্য বা যে কোনো তাত্ত্বিক বিষয় শিক্ষালাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য ইংরাজী পাঠ্যবিষয়কে আরও বৈচিত্র্যময় ও পূর্ণাঙ্গ করা প্রয়োজন ব'লে মনে হয়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীও ত্রুটি-মুক্ত নয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু প্রকৃত সমাজবিদ্যা বলতে যা বোঝায়, নির্ধারিত পাঠ্যসূচী তা থেকে অনেক পৃথক। শুধু ইতিহাস, ভূগোল, পৌরশাসন-নীতিকে একত্রিত করলেই সমাজবিদ্যা হয় না। বিষয়গুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গি যোগ না থাকলে, সামগ্রিক সংহতি না থাকলে, সমাজবিদ্যার অপভ্রংশই হয়। তাছাড়া এই বিষয়বস্তুর পরিসর দেখে মনে হয় যে, এর ব্যাপক পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাষাকে নিয়ে যে সমস্যা তা আরও জটিল। একজন শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীর স্তরে ছয়টি আবশ্যিক বিষয় শিখতে হয়, এবং তারপর যে কোনও একটি বিষয়ধারা নির্বাচন করতে হয়। আবশ্যিক

বিষয়গুলির মধ্যেও দেখা যায় যে, অন্তত তিনটি ভাষা একজনকে শিখতে হচ্ছে। একজনের পক্ষে এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করা কতখানি সম্ভবপর তা বিবেচ্য। মোটকথা, শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তারপর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পাঠ্যসূচীর মধ্যে ক্রম ও সামঞ্জস্যের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান পাঠ্যতালিকার মধ্যে এই ধরনের যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তথ্য পরিবেশন করলেই ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টি হবে—একথা স্বীকার করা কঠিন। তাই অবিলম্বে এর পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক

যেসব পাঠ্যপুস্তক আজ শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। ভুল-ভ্রান্তি, মুদ্রাকর-প্রমাদ, অসঙ্গতি প্রভৃতি নানা ত্রুটি থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলি মুক্ত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, যাদের জন্য পুস্তকগুলি লেখা তাদের দিকে অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টি রাখা হয়নি। ফলে, লেখার মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ থাকলেও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সহজ ও সরস হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলিকে সহজ ও সরস করা কঠিন। সেখানে প্রচুর উদাহরণ ও প্রয়োজনস্থলে নক্সা, ছবি প্রভৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুরাগ জন্মাতে হয়। অনেক পাঠ্যপুস্তকে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনো প্রসঙ্গ এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সেই বিবরণের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আমাদের দেশে ছাপা বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক বইগুলির মধ্যে যে নক্সা বা ছবি দেখা যায়, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত নয়। নৈপুণ্যের পরিচয় সেখানে নেই ; মোটা হাতের কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভোলানোর চেষ্টা করা হয়। এছাড়া ছাপা, বাঁধাই ও সাজসজ্জার দিক থেকে এদেশের পাঠ্যপুস্তক এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। বহু পুস্তকের মধ্যে যথেষ্ট অনুশীলনী নেই। কিশোর বয়সে শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট হয় পুস্তকের গঠন-সৌন্দর্যের দিকে। অথচ সেখানেও প্রকাশকদের কার্পণ্য। তারপর মূল্য

নিয়ন্ত্রণের কথা। পুস্তকের মূল্য সংস্করণ থেকে সংস্করণে ক্রমেই বেড়ে চলে। ভুঁইফোঁড় প্রকাশকদের উপদ্রবে একখানি পুস্তকের আয়ুষ্কাল একটি বিদ্যালয়ে দীর্ঘ হয় না। ফলে, অভিভাবকদের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। বড় ছেলের জন্য যে বই কেনা হয়েছিল, মেজো ছেলের বেলায় তার আর কোনো মূল্য থাকে না। এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে, আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কোনও মান (Standard) নেই। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয় তার মধ্যে এমন অনেক পুস্তক পাওয়া যায় যেগুলির উপযোগিতা নেই বললেই চলে। অনেকক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকায় পুস্তকের স্থান পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর, পুস্তকের গুণের উপর নয়। চারদিকে যে দুর্নীতি আজ দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হতে চলেছে। শিক্ষার্থীকে তা থেকে বাঁচাতে হলে শিক্ষায়তন থেকে দুর্নীতিকে দূর করতে হবে, তবেই তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ হবে।

পরীক্ষা

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামোয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যয়ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এখন পড়াটাকে তাদের পরীক্ষায় ভালো ফল করা বা পাশ করার উপায় হিসেবে ধ'রে নেওয়া হয়। ফলে, পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য চাপা প'ড়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। External পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকেন। তাই বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি-পরীক্ষার পরের সময়টা শিক্ষার্থীদের কাটে পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেঁটে। তারা শুধু মুখস্থ করতেই শেখে। কিন্তু এর স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ নয়—কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গীরণ পর্যন্ত। এর ফলে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কাজ করার শক্তি অর্জন করতে পারে না; তাদের ভেতরে সুবিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ও উচ্চাদর্শ গ'ড়ে ওঠে না। তাই এই ধরনের পরীক্ষায় শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যারই পরীক্ষা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার দরকার, তা হয় না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং

সুন্দরের অনুভব এনে দেয়। এই বিষয়গুলির পরিমাপ বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় না। পরীক্ষার্থীদের আসল ক্ষমতার পরিমাপ পরীক্ষকরা করতে পারছেন না। তাই আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছে, আবার শীর্ষস্থানাধিকারী শিক্ষার্থী জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত ও পর্যুদস্ত। বিচার হয় জীবনের নানা বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে। সেই পরীক্ষায় বহু কারণে বহু শিক্ষার্থী ব্যর্থ হতে পারে।

প্রশ্ন রচনাতেও গোলযোগ থাকে। কারণ প্রশ্নগুলো যে ধরনের হয়, তাতে পরীক্ষার্থীদের কোনো একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না; কয়েকটি অংশের উপর ভাসা-ভাসা প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষায় জ্ঞানের দু'চারটে নমুনা সংগ্রহ না ক'রে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ করতে হয় তাহলে তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই দৈবের হাতে গিয়ে পড়ে। কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় তখন বেশির ভাগ অধ্যায়ই বাদ প'ড়ে যায়। তাই অনেকে সমস্ত বই খুব ভালো ক'রে প'ড়ে যে ফল পায়, কোনো কোনো শিক্ষার্থী আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত প্রশ্ন প'ড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্বাচন কার্যকরী হয়, তাদের আর পরীক্ষার যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয় না। কিন্তু যেক্ষেত্রে তা হয় না তার ফল সহজেই অনুমেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, যে সমস্ত বিষয় পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত তার অনেকটা বাদ প'ড়ে যায়। আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলো হয় দুর্বোধ্য, না হয় দ্ব্যর্থবোধক। ফলে, পরীক্ষক যে উত্তরটা চান, সেটা অনেক পরীক্ষার্থীই দিতে পারে না।

বর্তমানে পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় মূলত প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে। এতে অনেক ভালো শিক্ষার্থীও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভালো ক'রে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কারণ পরীক্ষাকেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জানা জিনিসও ভুল করে; উত্তর-নির্বাচন ঠিকভাবে করতে পারে না। আবার কখনও অতিসাধারণ পরীক্ষার্থীও মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভালো ফল করে। আবার অনেকে ভাষার চমক দিয়ে উত্তরকে

এমনভাবে সাজিয়ে দেয় যে, সমস্ত বিষয় না লিখেও তারা ভালো ফল করে ; তারা এই কৌশল অবলম্বন ক'রে পরীক্ষকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়।

পরীক্ষকরা নম্বর দেবার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হতে পারেনও না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন, কেউ বা কঠোরতার ধার ধারেন না। আবার এক একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষকদের প্রকৃতি পরীক্ষার্থীদের জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্য দিয়ে তাদের যুক্তি ও বিষয়কে ভালোভাবে সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষায় দখল, বানান, হাতের লেখা প্রভৃতির জ্ঞানও প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক নয় ; তাই নম্বরও সকলে এক রকম দিতে পারেন না। ফলে, একই পরীক্ষার্থী হয়তো একজনের কাছে কোনো রকমে পাশ করে, আবার অন্যজনের কাছে ভালো নম্বর পায়।

পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের উপর খুব স্পষ্ট। ফলে, পরীক্ষার উপর শিক্ষার্থীদের একটা বিরাগ জন্মায়।

বর্তমানে ভারতে কেউই পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এখানে পরীক্ষা একটা ছাড়পত্র। এটুকুর জন্যই যেন পরীক্ষার দরকার। পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা আমাদের কাজের মধ্যে আজও সুস্পষ্ট নয়।

বর্তমানে পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিবারণের জন্য নানা গবেষণা চলছে। ইংরাজী examination কথার বদলে evaluation বা মূল্যায়ন কথাটির উদ্ভব হয়েছে। (১) মূল্যায়ন বলতে কেবল বিশেষ বিষয়ের ফলাফল নিরূপণ করাই নয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপকেই বোঝায়। আজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যখন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, তখন ব্যক্তিত্বের পরিমাপও মূল্যায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। (২) কেবল তাই নয়, বিষয়বস্তুর জ্ঞান পরীক্ষার জন্য যে গতানুগতিক ধারা প্রচলিত ছিল, তাকেও পরিবর্তিত করা হয়েছে। পরীক্ষার আগে বিষয়বস্তু-শিক্ষার লক্ষ্য কি কি তা ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার। (৩) তারপর কি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা হয়, এ বিষয়েও চিন্তা করা দরকার। কারণ অনেক সময়ই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা

লক্ষ্য এতই উন্নত হয় যে, সে লক্ষ্যে পৌঁছোবার মতো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় না। (৪) তারপর শিক্ষার ফলে যে আচরণগত পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাও নির্ধারণ ক'রে নিতে হয় এবং কতদূর সেই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে তার পরিমাপের জন্য নানা অভীক্ষার প্রণয়ন করতে হয়।

মূল্যায়নের এই চারটি স্তর বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের গতানুগতিক পরীক্ষাধারায় এই স্তরগুলি সুস্পষ্ট নয়। তাই এদের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। আজ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা Objective Test-এর প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সত্যই পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে কি না এবিষয়ে সন্দেহ আছে। এই পরীক্ষার কল্যাণে হয়তো নম্বর দেবার ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট রীতির সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু প্রশ্ন-প্রণয়নের পদ্ধতিতে পরীক্ষকের রুচির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। প্রশ্নের সংখ্যা বেশি হওয়াতে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষকের খেয়ালের উপর নির্ভর করতে হয় না। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয় ও শ্রেণীর উপযোগী ক'রে প্রশ্ন প্রণয়ন করা বেশ কঠিন। বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আত্মপ্রকাশ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় নেওয়া নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত দুরূহ।

কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে আজ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর বা শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভর করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মানগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ঘটতে পারে। ফলে, শিক্ষার্থীদের উপর যথেষ্ট অবিচারও হতে পারে। অবশ্য বিদেশে কোথাও কোথাও এই প্রথা—Internal Assessment—প্রচলিত আছে। শিক্ষকদের উপর এতে যথেষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশে শিক্ষকরা সেই দায়িত্ব নিতে পারবেন কি না, সে কথা ভাববার বিষয়। এছাড়া বিভিন্ন মানের মধ্যে যাতে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে তার জন্য কেন্দ্রীয় পরিদর্শক সমিতির প্রয়োজন আছে। নানা অসুবিধা ও অসামঞ্জস্যের মধ্যেও এই ব্যবস্থা অপরিহার্য ব'লেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। আমরা আজ পরিমাপের দিকে বেশি নজর দিচ্ছি—কিন্তু কি পরিমাপ করব? শিক্ষার্থীদের আমরা

কতদূর জ্ঞান দিতে পারছি? এদিকে লক্ষ্য রাখলে পরিমাপের জন্য এত ব্যাপক চেষ্টার সার্থকতা ক'মে যায়। ফসল পরিমাপের চেয়ে ফসল জন্মাবার দিকে লক্ষ্য রাখা বেশি দরকার। যদি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের জীবন-মান উন্নত হয়, তবে একমাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র এত ঘটা ক'রে পরিমাপের প্রয়োজন কি? বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সাধারণ বুদ্ধি, বৃত্তি ও যোগ্যতা যদি নির্ভর-যোগ্য হয়, তবে Public Examination-এর প্রয়োজন অনেক ক'মে আসে। আজ শিক্ষাবিদ্‌দের একথাও চিন্তা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষা

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দেশের পথ সমস্যা-সমাকীর্ণ। যেসব সমস্যা এক্ষেত্রে দেখা দেয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে। প্রথমত, সুষ্ঠু নির্দেশের জন্য বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী পরীক্ষার আয়োজনের অভাব। কিন্তু এই আয়োজন সময়-সাপেক্ষ। তাই বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বর্তমানে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষকের নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন। অভিভাবক অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চনকৌলীন্য দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার প্রয়াস চলে। ফলে, যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখার যোগ্য নয়, তাকেও অভিভাবকের পীড়াপীড়িতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি করা হয়।

তৃতীয়ত, ভাবীজীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে অধিকাংশ অভিভাবকই বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চান। ফলে, একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হয়; অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা তাই অনুপাতে কম হয়।

চতুর্থত, শিক্ষার্থী যে বিভাগে বা শাখায় ভর্তি হয় তা তার ভালো না লাগলে বা তাতে যোগ্যতার পরিচয় না দিলে, অন্য শাখায় তার স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুত খুবই অল্প থাকে।

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেয়। কোনো বিশেষ শাখায়

শিক্ষালাভ ক'রে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ করবার সুযোগ না পায়, তাহলে এই অর্জিত জ্ঞান সার্থক হয় না। আবার প্রত্যেক বৃত্তির সমমূল্য নির্ধারিত না হ'লে যে বৃত্তিগুলির অর্থনৈতিক মান বেশি, সেগুলিকেই অবলম্বন করবার স্পৃহা সকলের মধ্যে দেখা দেবে। তার ফলে নির্দেশ কার্যকরী হবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তার বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে এই অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য। যে হয়তো অনুশীলন ও অভ্যাস করলে প্রতিভাবান শিল্পী হতে পারত, সে অভিভাবকের ইচ্ছার চাপে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার হবে। পরিণামে এতে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চলেছে তা যেমন আশাপ্রদ তেমনি ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। এরূপ পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে যে সব প্রাথমিক সমস্যা রয়েছে প্রথমে সেগুলির সমাধান করতে হবে।

প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে বিদ্যালয়ের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের দিকে। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলবার জন্য আবশ্যকীয় নির্দেশ দিতে হবে ও বিদ্যালয়ের পরিদর্শন-ব্যবস্থা অধিক কার্যকরী ও সংহত করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিকে যাতে লক্ষ্য থাকে সেজন্যে প্রত্যেক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ক'রে শিক্ষার্থীকে রাখতে পারলে ভালো হয়। তবে বিদ্যালয়কে যদি শিক্ষার্থী-সংখ্যা ও তাদের বেতনের উপর নির্ভর করতে হয় তবে শিক্ষার্থী-সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে, আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী, বৈচিত্র্যময় শিক্ষার আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতিক দায়িত্ব নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক আদর্শের উদ্বোধনই হবে প্রধান লক্ষ্য। তাই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হ'লে চাই আদর্শ শিক্ষক ও আবাসিক বিদ্যালয়। শিক্ষককে সমাজে উচ্চ আসন দিতে না পারলে সমস্ত আয়োজনই অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমাদের দেশ গণতন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। তাই শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও আলোচনা, বিতর্ক-সভার উপযোগিতা যথেষ্ট। কথায় আছে—"Experience shared is experience enriched"। কি পাঠ্যসূচী প্রণয়নে, কি পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারণে, কি শিক্ষা-সংস্কার বিধানে—সবক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মত-বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-কোনো সংস্কার বিধানের গুরুদায়িত্ব আজ দেশের সমগ্র শিক্ষানুরাগীকে গ্রহণ করতে হবে। কেবল রাষ্ট্র ও সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। বিদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষায় গবেষণা

আজ শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রশ্ন বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষায় পরিচালনা ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করতে হ'লে গবেষণার মূল্য কম নয়। আমাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অন্যদেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য দেশের পরিবেশে যে পদ্ধতি বা শিক্ষণ-প্রণালী প্রযোজ্য আমাদের দেশে তার অন্ধ অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে—আর তার জন্যে চাই অক্লান্ত গবেষণা।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষায় গবেষণা এখনও শৈশবস্তর অতিক্রম করেনি। তাই একে সমৃদ্ধ করবার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণার প্রয়োজন। তা না হ'লে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কারের আশা ফলবতী হতে পারে না। গবেষণার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি, শিক্ষার সর্বস্তরে, শিক্ষাবিদ্‌দের অক্লান্ত পরিশ্রমও প্রয়োজন। তবেই ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় দু'এর সম্মিলিত প্রচেষ্টা যুগান্তর ঘটাতে সক্ষম হবে।

নির্ঘণ্ট

হ